

# বাংলাদেশের কলিচার

আবুল মনসুর আহমদ

আহমদ পাবলিশিং হাউস

বাংলাদেশের কালচার : আবুল মনসুর আহমদ ॥ প্রকাশক : মহিউদ্দীন আহমদ ॥ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১ ॥ প্রথম মুদ্রণ : কার্তিক ১৩৭৩, অক্টোবর ১৯৬৬ ॥ তৃতীয় মুদ্রণ : আষাঢ় ১৩৯২, জুলাই ১৯৮৫ ॥ প্রচ্ছদ শিল্পী : কানাম মাহমুদ ॥ মুদ্রাকর : মেহবাহ উদ্দীন আহমদ, আহমদ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১ ॥ দাম : আটাল টাকা ॥

---

**CULTURE OF BANGLADESH : By Abul Mansur Ahmad.**  
**Published by Mohiuddin Ahmed, Ahmed Publishing House,**  
**7, Zindabahr 1st Lane, Dhaka-1 3rd Edition : July, 1985.**  
**Price : Fifty Eight only.**

## লেখকের কৈফিয়ত

‘পাক-বাংলার কালচার’ বইটির নাম বদলাইয়া ‘বাংলাদেশের কালচার’ রাখিলাম। অভাবতঃ ও স্বভাবতঃই। ‘পাক-বাংলা কথাটা’ কোনও গুণ-বাচক শব্দ না। পরিচিতি-বাচক মাত্র। আগে পাক-বাংলা বলিতে যে ভূখণ্ড বুঝাইত, সেই ভূখণ্ডেরই বর্তমান নাম বাংলা-দেশ। এ দেশ আজ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। রাষ্ট্রটিক-কৃষ্টিটিক ও আর্থিক সকল বিষয়ে তার পরিচিতি ও এলাকা স্বকীয়তায় সুনির্দিষ্ট। এদেশের কালচার সম্পর্কে লেখা বইএর নাম, সূত্রাং, দেশের নাম অনুসারেই হইবে প্রয়োজনের স্বাভাবিক কারণেই।

তেমনি আগের নামটাও ছিল স্বাভাবিক কারণেই। স্বাধীন হইবার আগে এ দেশের রাষ্ট্র নাম ছিল পূর্ব-পাকিস্তান। পাকিস্তানের একটা প্রদেশ মাত্র। আমাদের মতে তখনও এই ভূখণ্ডের নাম হওয়া উচিত ছিল বেংগল বা বাংলা। কমপক্ষে বেংগল ( পি ) বা পাক-বাংলা। কোনও এক ভূখণ্ড দুইভাগে ভাগ হইলে রহস্তর ভাগই পূর্বনামের ওয়ারিস হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ বাটোয়ারার বেলা ভারত ইউনিয়নই পূর্ব নাম ‘ইণ্ডিয়ার’ ওয়ারিস হইয়াছিল। সেই নীতি অনুসারে বেংগল বাটোয়ারার সময়ও ঐ নামের ওয়ারিস আমরাই ছিলাম। কিন্তু আমাদের তৎকালীন গার্ডিয়ানরা তা চান নাই।

দ্বিতীয়তঃ বাংলা বাটোয়ারা হওয়ার সময় পাজাবও বাটোয়ারা হইয়াছিল। কিন্তু বাটোয়ারা দলিলে আমাদের পূর্ব-বাংলার মতই ওটাকেও ‘পশ্চিম পাজাব’ লেখা হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের নেতারা ওটাকে প্রথমে পাজাব ( পি ) মানে পাক-পাজাব বলিতেন। এখন অবশ্য শুধু ‘পাজাব’ বলিয়া থাকেন। ভারতও তাদের অংশকে প্রথমে পাজাব (আই) বলিতেন। এখন শুধু ‘পাজাব’ বলেন।

এ অবস্থায় আমাদের দেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ‘পূর্ব-পাকিস্তান’ লিখিতে বাধ্য থাকা সত্ত্বেও কৃষ্টি-সাহিত্যিক ব্যাপারে আমরা ‘পাক-

বাংলা' বলিতেই মিত করিতাম। কারণ বাংলাদেশ এমন একটা নাম-গোত্র-ঐতিহ্য-ইতিহাসহীন জনপদ নয় যে অপরের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে যে-কোনও নাম গ্রহণ করিতে পারে।

নতুন নামের এই বইএ দুইটি নয়া প্রবন্ধ যোজনা করিয়াছি। দুইটিই স্বাধীনতার পরের লেখা। কাজেই তাতে বাংলাদেশ শব্দটা ব্যবহার করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে আগের প্রবন্ধগুলিতে পাক-বাংলা শব্দটাই বজায় রাখা হইয়াছে। তাতে লেখাগুলির মর্মের দিক হইতে একসঙ্গে দুইটা উদ্দেশ্য সফল হইবে। এক, প্রবন্ধগুলির শেষে উল্লিখিত রচনার সমন্বয়-কালের সাথে বক্তব্যের সংগতি থাকিবে। দুই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এর কালচারেল স্বকীয়তা ও স্বাধীনতার যে প্রাপ্ত ও রূপ দৃশ্যমান, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অংগরাজ্য হিসেবেও অবিকল তাই ছিল। কেউ দেখিয়াছেন, কেউ দেখেন নাই।

১লা ফাল্গুন

১৩৮০

আরমণগোয়ার

আবুল মনসুর আহমদ

## বিষয়-সূচী

### ১। আমাদের কালচার

১—৫৪

কালচার কি?, কালচার বনাম সিভিলিযেশন, কালচার ও সিভিলি-  
যেশনের পার্থক্য, কালচারের ধারক পাড়াগাঁ, শহর কালচারের  
শ্রুতি, কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমারেখা, ধর্ম ও কৃষ্টির  
সীমারেখা, কালচারের ব্যাপকতা, কালচারের উৎস, বৈচিত্র্য  
অপরিহার্য, বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, বৈশিষ্ট্য কি, পাক-বাংলা বনাম  
গোটা বাংলার কালচার, আমাদের সত্যতা, আমাদের কালচার,  
তিনটি মূহুর্তি কথা, আজিকার প্রগতি, ধর্মানুষ্ঠান ও আর্ট, ঈদুল-  
ফিতরের নথি, নিরানন্দের পরিণতি, মোহররমের জীবন-প্রাচুর্য,  
চিত্র-শিল্পে, সংগীত-শিল্পে, মুসলিম দুনিয়ায় সংগীত, পাঠান আমলে  
সংগীত, মোগল আমলে সংগীত, পাক-বাংলায় সংগীত চর্চা,  
পতনের যুগ, আনন্দদায়ক অপরাধ, সুবেহ সাদেক, নৃত্য-শিল্প,  
পাবলিক এন্টারটেনমেন্ট, রংগমঞ্চ, শরমের কথা, ন্যাশনাল  
স্টেজ, মোবাইল স্টেজ, ন্যাশনাল স্পোর্টস, শিল্পী-সাহিত্যিকের  
দায়িত্ব, ঘুম-ভাংগা দামামা, বিশ্ব-কবি বনাম জাতীয় কবি, রিভাই-  
ভ্যাল নয়, রেনেসাঁ।

### ২। সাহিত্যের শ্রাণ, রূপ ও আংগিক

৫৫—১০৪

সাহিত্যের সরহন্দ, পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা, সাহিত্যের প্রকাশ  
হরফে, সাহিত্যে পিকাসো-বিপ্লব অসম্ভব, স্থানও কালের প্রভাব,  
ব্যক্তির প্রভাব, সাহিত্যই ভাষার আভিজাত্য, জনগণের জীবন-  
ক্ষুধা, জনগণের জীবনালেখ্য, জনগণের মুখের ভাষা, মাকিন নথি,  
ইমার্সনের পথ নির্দেশ, মাকিন ইংরাজী বনাম বিলাতী ইংরাজী,  
জনগণের জয়, মাকিনী ও আমাদের সাদৃশ্য, আমাদের সুবিধা,  
মিনিমাম দাবি, ভাষায় আমাদের স্বকীয়তা, পরিবেশের চাপ,  
বিভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্য, আমাদের জাতীয় সাহিত্য, সাহিত্যের

বিষয়বস্তু, আর্টের রূপান্তর, সাহিত্যের আংগিক দুই বাংলার ডায়ালেক্টে পার্থক্য, আঞ্চলিক বিকৃতির পুরস্কার, অমকরণ করি কেন ?, দুইটি অসার যুক্তি, অসল কারণ কি ?, গোলামি মনোভাব, অনুকরণের কুফল, জিত ও কলমের ভিন্ন গতি, গণ-বিরোধী রাষ্ট্রভাষা, দুইটা প্রতিদ্বন্দী, আমাদের কর্তব্য ।

৩। ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা ১০৫—১৪৬

কেন মাতৃভাষা ?, জাতির ব্যক্তিত্ব, আমরা কে ?, দেশ-প্রেমের অর্থ, আমাদের বার্থতা, মুসলিম আমলের প্রাক্কালে বাংলা, বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ, সাহিত্যে সাম্প্র-দায়ীকতার প্রবেশ, বাংলার সংস্কৃতিকরণ, আধুনিক যুগ, পাকিস্তান যুগ, অসংগত ও অযৌক্তিক, পরিভাষার ছুতা, আদর্শের দিকব্রান্তি, ভাষিক বিভ্রান্তি, অন্ধ অনুকরণ, মুখ শুদ্ধিকরণ, কথ্য বনাম লেখ্য, আমাদের কথ্য অকথ্য, লজিকের সীমা, আত্ম-বিস্মৃতি, পোশাকে গোলামী, গোলামী সাহিত্য, ভাষা-আন্দোলনের মর্মবাণী ।

৪। পাক-বাংলার রেনেসাঁ ১৪৭—১৬৮

মুখবন্ধ, পাকিস্তান কি ?, কালচ্যারাম অটনমি, ইউনিফর্মিটি নয় বৈচিত্র্য, রাষ্ট্র-দর্শন নয় জীবন-দর্শন, রেনেসাঁ কি ?, রিফর্মেশন নয় কেন ?, ইউরোপের রেনেসাঁ, আমাদের অবস্থা, মুক্তির পথ, আগে চাই সাহিত্যিক বিপ্লব, শিল্প-দর্শনের ব্যবধান, সাহিত্যের বিষয়-বস্তু, ইতিহাসের নথির, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের মুখের ভাষা ।

৫। শিক্ষার ম্রিডিয়াম ১৬৯—১২০

চিনা চতুরালি, এখনই সম্ভব নয় কেন ?, পুস্তকের অভাব, শিক্ষাদান কি ?, অমূলক আশংকা, শিক্ষক মনের কমপ্লেক্স, পরি-ভাষার অজুহাত, পরিভাষার জন্ম, চাকুরির বিপদ, শিক্ষকের অভাব, শিক্ষার মান না জাতির মান ?, পরীক্ষা নয় শিক্ষা কল্টোজ, শিক্ষায় রাজনীতি ।

- ৬। আনন্দের জোয়ার ঈদুল-ফিতর ১৯১—২০২  
 রোযা ও ঈদ, নিরানন্দের জন্ম, প্রতিষেধকের আবশ্যকতা, ঈদের  
 নামায বনাম সাজাত, আমাদের আবশ্যকতা, সীমা লংঘন,  
 আনন্দোৎসবের তাৎপর্য, সাংস্কৃতিক আনন্দোৎসব।
- ৭। আমার স্বপ্নের শহীদ মিনার ২০৩—২১০  
 প্রতীকের মিনার, শহীদ মিনারের বৈশিষ্ট্য, মিনার নম্র চাতাল,  
 গোড়ায় গলদ।
- ৮। আমাদের ভাষা ২১১—২৩২  
 আমাদের বাংলা, পশ্চিম বাংলার বাংলা, বিপ্লবী পরিবর্তন,  
 পরিবর্তনের তাৎপর্য, শব্দের কৃত্তিক ইমেজ, আমাদের ভাষার  
 শ্রেষ্ঠত্ব, ভাষা সমস্যার অপর দিক, রাজধানীর পরিবর্তন, আমাদের  
 দুইটি কাজ, ঢাকাইয়া বাংলা. ফর্মেটিভ স্তর, ক্রিয়াপদে আমাদের  
 শ্রেষ্ঠত্ব, জগা বনাম জুনি খিচুড়ি, আপোস ফরমূলা, পরিভাষা-সমস্যা,  
 চলতি শব্দই বাংলা শব্দ।
- ৯। বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি ২৩৩—২৫৪
- ১০। বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা ২৫৫—২৮০  
 জাতীয় আত্মার স্বরূপ, জাতীয় আত্মা বনাম ব্যক্তি-আত্মা, বাংলা  
 ভাগ হয় নাই, পাঠান আমলের বাংলা, মোগল আমলের বাংলা,  
 বাংলার বৈশিষ্ট্য, বৈশিষ্ট্যের কারণ, ইংরাজ আমলের বাংলা,  
 হিন্দু-চিন্তায় নতুন দিগন্ত, ফজলুল হকের আবির্ভাব, কারণটা  
 অসংগত না, রবীন্দ্র-চিন্তায় বিশালতা, বিজ্ঞানচর্চের হাশিয়ায়।





# বাংলাদেশের কালচার



## কালচার কি ?

আমাদের কালচারের কথা জানিতে হইলে আগে বুঝিতে হইবে কালচারটা কি ? (কালচারের প্রতিশব্দরূপে আমরা সাধারণতঃ ‘কৃষ্টি’, ‘সংস্কৃতি’, ‘তহ্মিব’ ও ‘তমদুন’ শব্দগুলি ব্যবহার করিয়া থাকি। ধাতু-গত অর্থের দিক হইতে বিচার করিলে কিন্তু এর একটাও কালচারের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তবে ‘কৃষ্টি’ শব্দটা কর্মণ, কালটিভেশন বা চাষ অর্থে কালচারের পরিভাষারূপে ব্যবহার করা হয় বলিয়া অন্য দুইটি শব্দের চেয়ে এইটাই কালচারের বেশী কাছাকাছি— ইংরাজীতে যাকে বলা হয় রিফাইনমেন্ট, আরবীতে যাকে তাহ্মিব বলা হয়, সংস্কৃতি শব্দটা সেই অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে।) তমদুন শব্দটা নাগরিক অর্থে কালচার অপেক্ষা সিভিলিযেশনের প্রতিশব্দ-রূপেই অধিকতর উপযোগী।

কিন্তু এ সব বিতণ্ডা নিরর্থক। কারণ, খোদ কালচারের অর্থ লইয়াই ইংরাজী সাহিত্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের মধ্যে ঘোরতর মত-বিরোধ রহিয়াছে। সে মত-বিরোধ এত তীব্র যে বাংলায় আমরা ঐ তিনটি শব্দের যে-কোনও একটিকে স্বচ্ছন্দে কালচারের প্রতিশব্দরূপেই বেদেবেগ ব্যবহার করিতে পারি।

(কালচারের সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। এত কঠিন যে উনিশ শতকের মধ্যভাগ হইতে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত পুরা একশ বছরের দীর্ঘ মুদতে ইউরোপ-আমেরিকার দুইজন পণ্ডিতও এ ব্যাপারে একমত হইতে পারেন নাই।) তার উপর অনেকেই আবার কালচার ও সিভিলিযেশনকে একই অর্থে ব্যবহার করিয়া বিষয়টাকে আরও জটিল ও সমস্যাটাকে আরও ঘোরালো করিয়া ফেলিয়াছেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, কালচারকে ডিফাইন করার আর কোনও উপায় নাই; বিশ্লেষণ দ্বারাই উহাকে বুঝিতে হইবে।

(ইংরাজী সাহিত্যে কালচার শব্দটা প্রথম আমদানি করেন ফ্রান্সিস্ বেকন ষোল শতকের শেষদিকে। উহাকে ডিফাইন করার চেষ্টা করেন সর্বপ্রথম ম্যাথু আর্নল্ড ইংলণ্ডে এবং ওয়াল্ডু ইয়ার্সন আমেরিকায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি, কিন্তু কালচার শব্দের যে অর্থে তাঁরা উহার সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন শব্দটা বেশীদিন সে অর্থে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। বিশ শতকের মাঝামাঝি রবার্ট এযরা পার্ক ও টেইলার প্রভৃতি মার্কিন পণ্ডিত এবং টার্নার ও লাক্সি প্রভৃতি ইংরাজ পণ্ডিতগণের লেখায় কালচার শব্দটা অনেক ব্যাপক ও গভীর অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করে। এর ফলে শব্দটা নতুন তাৎপর্য গ্রহণ করে। কিন্তু তাতে সমস্যা মিটে নাই। বরঞ্চ শব্দটা ব্যাপকতর ও গভীর হইয়াছে। সম্প্রতি পশ্চিমা সাহিত্যে ‘কালচার’ শব্দটা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে শুরু করিয়াছে। সেখানে ‘পলিটিক্যাল কালচার’, ‘এথিক্যাল কালচার’, ‘এস্‌থেটিক কালচার’, ‘রিলিজিয়াস কালচার’ ইত্যাদি কথার প্রচলন হইয়াছে।) এ সব কথা কিন্তু ‘এগ্রিকালচার’, ‘হট্ট কালচার’ বা ‘ব্লাড কালচার’ ইত্যাদি টার্নের মত অকৃষ্টিক কোন বিশেষ বিষয় বা বস্তু-জাপক নয়। বরঞ্চ (মানুষের মন ও মস্তিষ্ক বিকাশের বিশেষ স্তর-বোধক। তার মানে, কোনও সমাজ বা জাতির মনে কোনও এক ব্যাপারে একটা স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যবহার-বিধি, মোটামুটি সার্বজনীন চরিত্র, ক্যারেক্টার, আচরণ বা আখলাকের রূপ ধারণ করিলেই সেটাকে ঐ ব্যাপারে ঐ মানবগোষ্ঠীর কালচার বলা হইয়া থাকে।) এ অবস্থায় আজিকার পরিবেশে কালচার সিভিলিযেশনের সীমা-সরহদ্দ ঠিক রাখা এখন খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবু কালচার ও সিভিলিযেশন যে এক নয়, সেটা আমাদের বুঝিতে হইবে। সত্য জগতের মনীষীরাও সে চেষ্টা করিতেছেন। কারণ এটা যুগের দাবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রসারের দ্বারা দুনিয়াটা যতই ছোট হইতেছে, কালচারের অটনমির প্রয়োজনীয়তা ততই তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। ফলে কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এ সীমা

## আমাদের কালচার

নির্ধারণ ডেফিনিশন দ্বারা সম্ভব নয়—বিবেচনা দ্বারা তা করিতে হইবে। এখানে সে চেষ্টাই আমি করিতেছি।

### কালচার বনাম সিস্তি লিবেশন

সহজ কথায় ব্যক্তি বা ইণ্ডিভিজুয়ালের যা ব্যক্তিত্ব বা পার্সন্যালিটি, সমষ্টি বা কমিউনিটির তা-ই কালচার। আমরা যখন কোন একজন লোক সম্বন্ধে বলি : ‘লোকটার পার্সন্যালিটি আছে’, তখন আমরা সেই লোকটির এমন কতকগুলি গুণ-সমষ্টির দিকে ইশারা করি, যেগুলি ঐকান্তিকভাবে তার নিজস্ব এবং যার দ্বারা সে অপর সাধারণ হইতে পৃথক। অথচ ঐ গুণ-সমষ্টি বা পার্সন্যালিটি ঐ লোকটির বিশেষত্ব নয়। কারণ পার্সন্যালিটি আরও অনেক লোকের আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, সকলের পার্সন্যালিটি রূপে-গুণে এক নয়। ব্যক্তিত্বে-ব্যক্তিত্বে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ঐ পার্থক্যের দ্বারা তাদেরে চিনা যায়। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের নিজস্বতা। নিজস্বতাই ঐ পার্থক্যের প্রাণ। ঐটুকুই ব্যক্তিত্ব।

ঠিক তেমনি, সকল লোক-সমষ্টিরই অর্থাৎ সব কমিউনিটি সমাজ বা জাতিরই একটা নিজস্ব সমবেত ব্যক্তিত্ব বা কর্পোরেট পার্সন্যালিটি আছে। তারই নাম ঐ লোক-সমষ্টি বা কমিউনিটির কালচার। এই লোক-সমষ্টি বা কমিউনিটিকে আমরা অবস্থা-ভেদে জাতি বা ন্যাশন, উপজাতি বা ন্যাশন্যালিটি, সমাজ বা পোসাইটি, এমন কি পরিবার বা ফ্যামিলি বলিতে পারি ও বলিয়া থাকি।

জাতি বা ন্যাশন শব্দটা ইদানিং বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নৃতাত্ত্বিক এথনিক্যাল বা র্যাশিয়াল অর্থে ততটা নয়। ধর্মীয় অর্থে ত নয়ই। একটি রাষ্ট্রের সব নাগরিক মিলিয়াই ন্যাশন বা রাষ্ট্রীয় জাতি, নৃতত্ত্ব, ধর্ম ও ভাষার দিক দিয়া এক না হইলেও। যেমন আমরা বাংলাদেশীরা এক রাষ্ট্রীয় জাতি বা ন্যাশন, যদিও নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হইতে আমরা এক নই। অপর দিকে,

## বাংলাদেশের কালচার

রাষ্ট্রের নাগরিক না হইলে নৃতত্ত্ব ধর্ম ও ভাষার দিক হইতে এক গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের লোক হইয়াও এক ন্যাশন হয় না। যেমন পশ্চিম বাংলার লোকেরা ভাষা ও নৃতত্ত্বের দিক হইতে আমাদের গোষ্ঠী ও সমাজের লোক হইয়াও আমাদের সাথে এক জাতি বা ন্যাশন নয় এবং ভারতীয় মুসলমানেরা ধর্ম নৃতত্ত্ব ও ভাষার দিক হইতে এক গোষ্ঠী এক সমাজের লোক হইয়াও আমাদের ন্যাশনের লোক নয়।

কিন্তু এই রাষ্ট্রীয় জাতির পার্সন্যালিটি অর্থাৎ কালচার এক নাও হইতে পারে। একই ন্যাশনের ভিতরে একাধিক ন্যাশনালিটি থাকিতে পারে। তৎকালীন যেমন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা একই রাষ্ট্রীয় ন্যাশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও পৃথক ও স্বতন্ত্র ন্যাশনালিটি এবং পৃথক ও স্বতন্ত্র কর্পোরেট পার্সন্যালিটির অধিকারী ছিল। দুই অঞ্চলের কালচারও তাই স্বতন্ত্র ছিল।

## কালচার ও সিভিলিযেশনের পার্থক্য

এইখানেই আমরা সভ্যতা বা সিভিলিযেশন হইতে কৃষ্টি বা কালচারকে আলাদা করিয়া দেখিবার মত আলোর সন্ধান পাই। আগেই বলিয়াছি, কালচার আমাদের কর্পোরেট পার্সন্যালিটি বা সমবেত ব্যক্তিত্ব। এইবার আরেকটু সহজ করিয়া বলি—কালচার আমাদের সামাজিক আমিষ। আমরা যা আছি তা-ই কালচার। পক্ষান্তরে সভ্যতাটা কি? কালচারকে মানুষের ব্যক্তিত্বের সাথে তুলনা করিলে সিভিলিযেশনকে মানুষের সম্পদের সাথে তুলনা করা যায়। অর্থাৎ আমাদের যা আছে, তাই আমাদের সিভিলিযেশন। কথাটার আরও একটু তফসির করা দরকার। ‘আমরা যা আছি’ ও ‘আমাদের যা আছে’ কথা দুইটির মধ্যে যে মৌলিক প্রভেদ আছে, সেদিকে আমাদের নয়র দেওয়া উচিত। কাজটা বেশী কঠিন নয়। আমার আমিষ ও আমার সম্পত্তির মধ্যে যে পার্থক্য সুস্পষ্ট, তা মনে রাখিলেই কালচারটা বোঝার কাজ সহজ হইবে। এই দিক হইতে একটু

## আমাদের কালচার

তলাইয়া বিচার করিলে এটাও স্পষ্ট হইয়া আসিবে যে, এই কারণেই এক জাতির একাধিক কালচার থাকিতে পারে বটে, কিন্তু একাধিক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে না। অপর দিকে তেমনি বহু জাতির এক সিভিলিযেশন থাকিতে পারে বটে, কিন্তু এক কালচার থাকিতে পারে না। কারণ কালচারের নিজস্বতা বা জাতীয় রূপ থাকিতেই হইবে; পক্ষান্তরে সিভিলিযেশনের কোন জাতীয় রূপ থাকিতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিয়া কথটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব :

আমরা যখন মিসরীয়, আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, আর্য, গ্রীক, রোমান আরব বা চীনা সভ্যতার কথা বলি, তখন কোন ভৌগোলিক দেশের বা রাষ্ট্রীয় জাতির সভ্যতার কথা বুঝাই না—বুঝাই একটা যুগের সভ্যতা। শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে, দর্শন-সাহিত্যে, শিল্প-বাগিজে, কলা-কারিগরিতে মানুষের সামগ্রিক অগ্রগতির নামই সভ্যতা। মানব-মনের ক্রমবিকাশের ইহা নিদর্শন। সে কারণে গভীরতা ও ব্যাপ্তিতে প্রসার লাভ সভ্যতার স্বভাব। বনের আশুনের মত নিজের আলোকে ও দাহিকা শক্তিতে বিশ্বার লাভই ইহার অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তি। আশুন যেমন ইন্ধন হইতে ইন্ধনান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, সভ্যতাও তেমনি জাতি হইতে জাত্যান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। জ্ঞান যেমন শিক্ষক হইতে আরও বড় হইয়া ছাত্রের মধ্যে বিকশিত হয়, সভ্যতাও তেমনি শিক্ষক-জাতি হইতে শিষ্য-জাতিতে অধিকতর উন্নত ও প্রসারিত হয়। সভ্যতা ক্রমবিকাশমান। জ্ঞানের মতই সে অক্ষয়, আশুনের মতই সে অনির্বাণ। কাজেই অতীতের ঐ সব সভ্যতার সাথে কোন একটা বিশেষ মানব-গোষ্ঠীর নাম সংযুক্ত থাকার অর্থ এই নয় যে, ঐ ঐ সভ্যতা শুধু ঐ ঐ মানব-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ ঐ সব সভ্যতার ফল ঐ ঐ মানব-গোষ্ঠীর বাহিরের লোকেরাও ভোগ করিয়াছিল। প্রদীপ যার আংগিনাতেই জ্বলুক, পথচারীও সে আলোকের সুবিধা ভোগ করিবে।

এক্বেবারে ঘরের কাছের নখির লওয়া যাক। বর্তমান যুগের সভ্যতাকে আমরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইউরোপীয় সভ্যতা বলিতাম।

ঐ সভ্যতার নেতৃত্ব এখন আমেরিকার হাতে চলিয়া যাওয়ায় উহাকে আমরা এখন ওয়েস্টার্ন সিভিলিযেশন বা পশ্চিমা সভ্যতা বলিয়া থাকি। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই সভ্যতা অচিন্তনীয় উন্নতি বিধান করিয়াছে। পাকা রাস্তা, মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী, হাওয়াই জাহাজ, পোস্ট-টেলিগ্রাম, টেলিফোন, রেডিও-টেলিভিশন ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থায়, ক্যামেরা, মুভি ক্যামেরা, টেকনিকালার, থ্রিডাইমেনশন, মঞ্চ ও পর্দা ইত্যাদি চারুশিল্পে, রোটারি মেশিন, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ ইত্যাদি জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের সাজ-সরঞ্জামের আবিষ্কারে, শিল্প-সাহিত্যের উন্নতিতে, ইঞ্জেকশন-অপারেশন, রেডিওজলি, কাউন্টারপ্লেট প্রভৃতি চিকিৎসা প্রণালীতে, স্টিলফ্রেমের শতাধিক তলার আকাশ-চুম্বী ইমারতে উঠানামার জন্য লিফট-এস্কেলেটার স্থাপনায়, বিদ্যুৎ ও এটম শক্তিকে মানবের সেবায় নিযুক্তিতে, শূন্যলোকে গ্রহ-উপগ্রহ পরিভ্রমণের বাস্তব আয়োজনের সাফল্যে মানব-মনের যে অভাববীর্ণ বিকাশ লাভ ঘটিয়াছে এবং ফলে মানুষের বৈষয়িক জীবনে যে সব সুখ-স্বাস্থ্য এবং তাদের নৈতিক জীবনে যে উন্নতি ( অথবা যদি বলিতে চান অবনতি ) হইয়াছে, তার সামগ্রিক নামই বর্তমান যুগের সভ্যতা।—পশ্চিমা জাতিসমূহ এই সভ্যতার স্রষ্টা বলিয়া এর নাম পশ্চিমা সভ্যতা। কিন্তু তাই বলিয়া এই সভ্যতার ফল কি আমরা পূরবীরাও ভোগ করিতেছি না? পশ্চিমাদের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি ও তাদের তৈরী জিনিস-পত্র ব্যবহার করিয়াই শুধু আমরা সম্ভ্রষ্ট থাকিতেছি না। নিজেরাও সে সব তৈরী করিতেছি। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, আর্ট-সাহিত্যে, শিল্প-বাণিজ্যে, আমরা পশ্চিমাদের সমান ও মতন হইবার চেষ্টা করিতেছি। স্বয়ং পশ্চিমারাও আমাদের সব শিখাইবার ও আমাদের মান উন্নত করিবার জন্য সযত্নে ও সাগ্রহে চেষ্টা করিতেছে। ফলে এই সভ্যতার সুযোগ ও সুবিধা পশ্চিমাদের মতই আমরাও ভোগ ও ব্যবহার করিতে পারিতেছি। যে যে-পরিমাণে তা পারিতেছে, তার জীবনের মান ও মনের দিগন্ত সেই পরিমাণে উন্নত ও প্রসারিত হইতেছে। সেই হেতু ও সেই পরিমাণে দেশ ও জাতি-নির্বিশেষে গোটা দুনিয়ার মানুষ বর্তমান সভ্যতার অংশীদার।



## আমাদের কালচার

কাজেই পশ্চিমা সভ্যতাটা নামে পশ্চিমা ও অবদানে ইউরোপ-মার্কিন হইলেও আসলে এটা কোন এক জাতির বা জাতি-সমষ্টির সভ্যতা নয়, বর্তমান যুগের সভ্যতা। এইভাবে সভ্যতাটা আসলে যুগেরই বৈশিষ্ট্য, কোন জাতি বা দেশের বৈশিষ্ট্য নয়। বর্তমান যুগের সভ্যতা সম্বন্ধে যা সত্য, অতীতের সভ্যতা সমূহ সম্বন্ধেও তা-ই সত্য ছিল।

### কালচারের ধারক পাড়াগাঁ

কিন্তু কৃষ্টি সম্বন্ধে এ-কথা বলা যাইতে পারে না। আগেই বলি-য়াছি, কৃষ্টি সামাজিক ব্যক্তিত্ব। সামাজিকতা পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই দিক হইতে কালচারের ধারক ও বাহক পল্লীগাম। শহরে সামাজিক জীবনের অভাব। সেখানে প্রতিবেশিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না। শহরের বাশিন্দাদের অধিকাংশই ভাসমান জনতা। আজ এ এখানে, কাল ও ওখানে। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি-বাকুরির সমাবেশ হইতেই শহরের পত্তন ও প্রসার। তাতে নিত্য-নতুন লোকের আম-দানি। পুরাতনের রফতানি। ওদের মধ্যে প্রতিবেশিত্ব গড়িয়া উঠি-বার সময়ই হয় না। শহরের বুনিয়াদী বাশিন্দাদের মধ্যে মহল্লায়-মহল্লায় যে একটা প্রতিবেশিত্ব চালু ছিল তাও ভাংগিয়া গিয়াছে বা যাইতেছে। শহরের উন্নতি শ্রীরুদ্ধি ও পুননির্মাণের বন্যায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের থ্রাস্ট বা ধাক্কায় ঐ সব যে কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। পক্ষান্তরে পাড়াগাঁয়ে এই প্রতিবেশিত্ব স্বাভাবিক। সেখানে এক বাড়িতে একজনের অসুখ হইলে সারা গ্রামে রটিয়া যায়। শহরে পাশের বাড়িতে লোক মরিয়া গেলেও কেউ খবর রাখে না। পাশের বাড়িতে কে বা কারা থাকে, তাদের পরিবারে লোক কত, কে কি করে, অনেক সময় তাও আমরা জানি না। জানিতে পারি না। জানিবার অবসর নাই। শহরের সবাই আমরা কাজের লোক। অতিমাত্রায় ব্যস্ত। পারতপক্ষে কেউ পায়ে হাঁটিয়া চলে না। রিক্শা-ট্যাক্সি-মোটরে ছুটাছুটি। দৌড় ছাড়া গতি নাই। নষ্ট করিবার

সময় নাই। এই পরিবেশে প্রতিবেশিত্ব বা আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিতে পারে না। পরিচয় যা ঘটে, তা নিতান্ত বৈষয়িক—সংক্ষিপ্ত। দুই-দশ বসিয়া আলাপ করিবার সময় নাই। যাদের আছে তারা ক্লাবে যায়। ক্লাব প্রতিবেশিত্ব নয়। কাজেই শহরবাসীর চাল-চলন, স্বভাব-চরিত্র, ভাব গতিক এক হইতে পারে না। ফলে শহরের বাশিন্দারা হয় মাল্টিকালার; শতরংগা; রং-বেরংএর লোক। পক্ষান্তরে পল্লীর লোকেরা হয় ইউনিকালার বা একরংগা। শহরের জনতার পরিবর্তন ঘটিতেছে প্রতিদিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে। পল্লীর লোক দাদা-পরদাদার আমল হইতে চৌদ্দ পুরুষ ধরিয়া একই জায়গায় এই ধরনে বসবাস করিতেছে। এই কারণেই পল্লী-গ্রামের লোকদের মধ্যে সুখে দুঃখে হাসি-কান্নায় একটা আন্তরিক সমবেদনা ও আত্মীয়তা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই আত্মীয়তা হইতে তাদের আনন্দে-উল্লাস, আমোদে-প্রমোদে, শোক-মাতমে, অভাবে-অনটনে, আচারে-ব্যবহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, চিন্তায়-ভাবনায়, প্রথায়-সংস্কারে, কাহিনী-কিংবদন্তিতে, এমন কি ভূত-প্রেত দর্শনে-শ্রবণে, একটা একাকারত্ব বা ইউনিফর্মিটি দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। পল্লী-জীবনের অচঞ্চলতার মতই এই ইউনিফর্মিটি অচঞ্চল ও স্থায়ী। উপরে বর্ণিত সামাজিক আচারের সমাবেশ ও সমষ্টিই জাতির কালচার।

পল্লী-জীবনের ঐ ইউনিফর্মিটিই কালচারের বুনিয়াদ। এই জন্যই কালচারটা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ পল্লীর সম্পদ। পল্লী-জীবনই সে সম্পদের ধারক ও রক্ষক।

### শহর কালচারের স্রষ্টা

অপর দিকে শহর শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা-সাহিত্য ও রাষ্ট্র পরিচালনার কর্ম-কেন্দ্র। ঐ সব কাজ-কর্ম উপলক্ষে দেশ-বিদেশের হরেক রকমের লোকের সেখানে সমাবেশ। তাদের ধর্ম-ঐমান, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা ভাবনা, খোরাক-পোশাক, চাল-চলন, বিদ্যা-বুদ্ধি এক নয়। এদের

আলাপ-পরিচয় মিনামিশাও স্থায়ী নয়। এমন পরিবেশ ইউনিফর্মিটি ঐক্য ও আত্মীয়তা, এক কথায় কালচার, গড়িয়া উঠার অনুকূল নয়— সে কথা একটু আগেই বলিয়াছি।

কিন্তু এর একটা ভাল দিকও আছে। নিত্য-নতুন লোকের আসা-যাওয়া, কাজে-কর্মে তাদের আলাপ-পরিচয় ও পরস্পরের ভাবের আদান-প্রদান হয় শহরে। তাতে নিত্য-নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ হয় তাদের। তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গিতেই আসে একটা উদারতা। এক জায়গায় বসিয়া বায়স্কোপে বিদেশ দেখার মতই শহরের লোকেরা ঘরে বসিয়া দুনিয়া দেখে। নিত্য-নতুন সমস্যার সৃষ্টি ও সমাধান দেখে তারা চোখের সামনে। এইভাবে আসে তাদের মধ্যে নতুন চিন্তাধারা। তাতে বিচার-বুদ্ধিতে তাদের আসে উদারতা। মনে আসে প্রসারতা। তারা লাভ করে বিদেশীর ভাল জিনিস গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, আর নিজেদের খারাপ জিনিস বর্জন করিবার সাহস। পল্লী-জীবনে যে সব বিশ্বাস থাকে তাদের ঈমানের অংশ, শহর-জীবনে বিজ্ঞান-প্রভাবিত মুক্তবুদ্ধির বিচারে সে সবই হইয়া পড়ে নির্বোধ কুসংস্কার! তাই পাড়গাঁয়ে যারা সন্ধ্যা বেলায়ই বাড়ির পাশের ছোট শেওড়া গাছটিতে ভূত-প্রেত দেখে, তারাই শহরে আসিয়া বড় বড় বটগাছে অমাবস্যার রাত্রেও ভূত-প্রেত দেখে না।

বহুদর্শনের ফলে শহরবাসীর এই যে মনের বিকাশ ও দৃষ্টির প্রসারতা, এটা তারা লাগাইতে চায় নিজের সমাজের ও দেশের কাজে। অপরের দেখাদেখি নিজের লোককে ভাল করিয়া তুলিবার প্রবল ইচ্ছা জাগে তাদের অন্তরে। তারা হইয়া উঠে রিফর্মিস্ট। তারা নিজেদের চাল-চলনে, আচার-ব্যবহারে, ঈদে-পার্বণে, এমনকি ধর্ম-বিশ্বাসে, এক কথায় নিজেদের কালচারে, সংস্কার প্রবর্তন করিয়া সেটাকে করিতে চায় অধিকতর ভবা, শালীন ও সুন্দর। শিক্ষা-কেন্দ্র, সাহিত্য-সংঘ সংবাদপত্র-পত্রিকার অফিস, রংগমঞ্চ, ক্লাব-রেষ্টুরা, মসজিদ-মন্দির, গির্জার প্রাচুর্য্য থাকে শহরেই। এই সব জায়গা হইতেই নতুন-নতুন ভাব ও চিন্তা জন্ম ও প্রসার লাভ করে। রাস্তাঘাট, ট্রেন, মোটরবাস,

ডাক-তার ইত্যাদি যানবাহনের ক্রমবর্ধমান বিস্তারে ঐ সব নতুন চিন্তাধারা ছড়াইয়া পড়ে মফস্বলে। মফস্বলের লোকেরা সকল চিন্তা ও কাজে অনুকরণ ও অনুসরণ করে শহরবাসীকে। এইভাবে শহরে কালচার সৃষ্টি হইয়া বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছুরিত হয় পল্লী-জীবনে। শহরে করে যা সৃষ্টি, পল্লী করে তা ধারণ ও পালন।

### কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমারেখা

অতএব, দেখা গেল, শহর সভ্যতা-ভিত্তিক এবং পল্লী কৃষ্টি-ভিত্তিক—এ কথাও যেমন নিরাধারা বলা যায় না, সভ্যতা শহরবাসী এবং কৃষ্টি পল্লীবাসী—একথাও তেমনি চোখ বুঁজিয়া কওয়া যায় না। এই কারণেই সিভিলিযেশন ও কালচারে এলাকার সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা এত কঠিন।

এ ছাড়াও আরেকটা অসুবিধা আছে। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার খানিকটা কালচার, আর খানিকটা সিভিলিযেশন। উদাহরণস্বরূপ বিয়ার কথাটাই ধরা যাউক। বিয়া-প্রথাটা সভ্যতা। যে দেশ ও সমাজে বিবাহ প্রথা চালু নাই, সে দেশ ও সমাজকে সভ্য বলা যায় না। সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্ররা জানেন যে, আদিকালে মানুষের মধ্যে বিবাহ-প্রথা ছিল না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে একরূপ আইনে পরিণত হইয়াছে। কাজেই বিবাহটা সভ্যতা। কিন্তু বিবাহের রসুম বা প্রণালী সভ্যতা নয়, কালচার মাত্র। বিয়ার রসুমের খুঁটিনাটি এক-এক দেশে এক-এক জাতিতে এক-এক রকম। এক দেশে দুলা-দুলহান নিজেরা দেখাশোনা ও কোর্টশিপ করিয়া বিয়া করে, আরেক দেশে দুলা-দুলহানের দেখাশোনা হয় না। তাদের বাপ-ভাই মুন্সিব্বিরাই বিয়া ঠিক করেন। এক দেশে প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে বিয়া হয়, আরেক দেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিয়া হয়। এক দেশে বা এক জাতিতে বয়স্ক দেয় কাবিন ও দেনমোহর, আরেক জাতিতে কন্যাপক্ষ দেয় পণ ও

যৌতুক। এক দেশে পুরুষ-নারীকে বিয়া করে, আরেক দেশে নারী করে পুরুষকে। এক দেশে একই সময়ে একাধিক বিয়া করা বেআইনী, আরেক দেশে এক সঙ্গে চার বা তারও বেশী বিয়া করা যায়। এক দেশে তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদের দস্তুর আছে, আরেক দেশে তা নাই। এক দেশে বিধবারা বিয়া করতে পারে, আরেক দেশে পারে না। এক দেশে আত্মীয়-অনাত্মীয় নিবিশেষে যে কেউকে বিয়া করা যায়, আরেক দেশে তা চলে না—এই সব নিয়ম-কানূনের একটা সিভিলি়েশনের প্রস্ন নয়, কালচারের প্রস্ন মাত্র। তার মানে এই সব নিয়ম কানূনের পার্থক্যের দরুন কোন জাতি সভ্য বা অসভ্য বিবেচিত হয় না, বরং এ সবই বিভিন্ন সভ্য জাতির নিজ নিজ বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় বাবস্থা; সুতরাং তাদের কালচারের অংগ।

যৌন-সমতার প্রস্নটাও তাই। নারীকে নরের অধীন দাসী-বান্দী, গৃহপালিত জীব বা পণ্য মনে করা অসভ্যতা। কি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে উভয়ের কর্তব্যের পৃথকীকরণটা অসভ্যতা নয়, কালচারের পার্থক্য মাত্র।

বিয়ার বেলা যেমন, জন্মের বেলায়ও তেমনি। সন্তান জন্মের সময় বিভিন্ন দেশে ও ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রথা চালু আছে। কোনও দেশে ও জাতিতে সন্তানের জন্মে আকিকা দেওয়া হয় এবং আকিকা দেওয়ার সময়েই নাম রাখা হয়। আরেক দেশে সন্তানকে ধর্মস্থানে ধর্মযাজকের কাছে লইয়া যাওয়া হয় এবং সেখানেই তার নামকরণ হয়। এক দেশে প্রতিবছর সন্তানের জন্মবাষিকী পালন করা হয় এবং আত্মীয়-স্বজন তাকে উপহার-উপচৌকন দেয়, আরেক দেশে সন্তানের জন্ম-তারিখটি আল্গোছে ভুলিয়া যাওয়া হয়। এক দেশে ছেলোদের খৎনা করান হয়, আর এক দেশে হয় না।—এ সবই কালচারের অংগ, সিভিলি়েশনের অংগ নয়। কিন্তু সন্তান জন্মের সময় ছেলে-সন্তান রাখিয়া মেয়ে-সন্তানকে নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইলে তাকে আর কৃষ্টি-অকৃষ্টির প্রস্ন বলা যায় না।—তা হইয়া পড়ে সভ্যতা-অসভ্যতার প্রস্ন।

জন্মের সময় যা, মৃত্যুর সময়েও তাই। এর খানিকটা সভ্যতা, খানিকটা কৃষ্টি। যেমন ধরুন, মৃত্যুর পর লাশটার গোশত খাইয়া ফেলিলে বা শিয়াল-কুত্তার ও চিল-শকুনের খাওয়ার জন্য ফেলিয়া দিলে সেটা হইবে অসভ্যতা। আর সম্বন্ধে সাড়ম্বরে সে লাশটার সৎকার করাটা হইবে সভ্যতা। এই সৎকারেরও আবার বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রণালীতে তা করা হয়। সে প্রণালীগুলি হইবে ঐ ঐ দেশ বা জাতির কালচার। এই ধরুন, কোন দেশে বা জাতিতে লাশ পুড়াইয়া ফেলা হয়; কোন দেশে বা জাতিতে তা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয়। পুড়াইয়া ফেলা ও পুঁতিয়া ফেলাও আবার ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হইতে পারে। কেউ কাঠ-লাকড়িতে পুড়ায়, কেউ বিজলির তাপে পুড়ায়। পুঁতিবার বেলাও তেমনি এক জাতি লাশ সম্বন্ধে ধুইয়া-মুছিয়া নয়া কাপড় পরাইয়া খুব লাগাইয়া দাফন করে; আরেক জাতি লাশটি কাঠের বাস্কে ভরিয়া মাটিতে চাপা দেয়। এক জাতি তাদের মৃত ব্যক্তিদেরে বিশালায়তনের ফুল-বাগিচা-ওয়াল গোরস্থানে পৃথক পৃথক সমাধি দখল করিতে দিতেছে; আর এক জাতি তাদের মৃত ব্যক্তিদেরে স্বল্পায়তনের শূশানঘাটের ছাই হইয়াই সম্ভট থাকিতে বাধ্য করিতেছে। এ সবই বিভিন্ন জাতির বা মানব-গোষ্ঠীর কালচারের অংশ। সিভিলিযেশনের সংগে এ-সবের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু এই কালচারই একদিন সিভিলিযেশনের প্রশ্ন হইয়া উঠিতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যদি ভবিষ্যতে প্রমাণিত হয় যে, এই দুই প্রকার কোনও একটি বা উভয়টি মানব-স্বাস্থ্যের পক্ষে অকল্যাণকর, তখন উহা আর কালচারের প্রশ্ন থাকিবে না; হইয়া উঠিবে উহা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সতীদাহের কথা বলা যায়। মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা পত্নীকে পুড়াইয়া ফেলা একদা কোন-কোন জাতির কালচারের অঙ্গ ছিল। কিন্তু উহা সিভিলিযেশনের পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাজেই দেখা গেল, এই সব ব্যাপারের খানিকটা কালচার আর খানিকটা সিভিলিযেশন।

## আমাদের কালচার

মানুষের ভাষা উপাসনা-প্রণালী এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিরও খানিকটা কালচার, আর খানিকটা সিভিলিযেশন। বর্ণমালাযুক্ত ভাষা মানুষের সভ্যতার নিদর্শন; কিন্তু হরফের আকৃতি ও ডাইনে-বামে উপরে-নিচে লেখার প্রণালী কালচারের নিদর্শন। গির্জা-মন্দির-মসজিদে প্রার্থনা-উপাসনা করা, রোযা-নামায পড়া, সন্ধ্যা-আফিক করা, বুক্রে ক্রস ঝুলান, ধর্মস্থানে গমন, কবর যিয়ারত, এমনকি পীরের দরগায় শিরনী ও কালীবাড়িতে কবুতর মানত করা ইত্যাদি ইত্যাদি সবই মানুষের কালচারের অংগ। সিভিলিযেশনের সংগে এর কোন সম্পর্ক নাই; অর্থাৎ এই সব ক্রিয়াকলাপ এইরূপে করিলে সভ্যতা হইবে, আর ঐ ধরনে করিলে তা অসভ্যতা হইবে, এমন কোন কথা নাই। কিন্তু এই সব কালচারের প্রতিপালনে পূজা-অর্চনা বা ইবাদত-বন্দেগি করিতে গিয়া উপাস্য দেবতার ক্ষুঞ্জিত্বের জন্য প্রাণী বলি দিলে উহা আর কালচারের প্রম্ম থাকে না, হইয়া পড়ে তা সিভিলিযেশনের প্রশ্ন।

## ধর্ম ও কৃষ্টির সীমারেখা

এইখানে ধর্ম ও কৃষ্টির সীমারেখা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা নিতান্ত প্রাসংগিক হইয়া পড়িতেছে। কারণ উপরে যে সব ক্রিয়াকলাপের দিকে ইশারা করা হইল তার অনেকগুলিই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অংগ। রিলিজিয়ান ও কালচারের বাউণ্ডারি নির্দেশ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কালচার ও সিভিলিযেশনের সীমা নির্ধারণই ইহার প্রতিপাদ্য। তবু কালচারের কথা বলিতে গেলে ধর্মের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে বলিয়া এখানে অতি সংক্ষেপে ধর্ম ও কালচারের সীমা নির্দেশের চেষ্টা করিতেছি।

ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়; কিন্তু তা হইলেও দুইটা এক বস্তু নয়। এক কথায় বলা যায় ধর্ম কালচারের নির্যাস; পোটেটটাইম্‌ড্ কালচার; দার্শনিক ম্যালিনস্কির ভাষায় 'মাস্টার ফোর্স অব হিউম্যান কালচার'। কাজেই ধর্মের সবটুকুই কালচার,

কিন্তু কালচারের সবটুকুই ধর্ম নয়। সহজে বুঝিবার জন্য কালচারকে গাছের সংগে তুলনা করিলে ধর্মকে গাছের ফলের সঙ্গে তুলনা করিতে হয়। গাছ হইতে রিজিজিয়ান ও রিজিজিয়ান হইতে কালচারের উৎপত্তি। গাছ কিন্তু ফলের মত নিটোল ও অনাবিল নয়। তেমনি ভাল-মন্দ ও ফুল-কাঁটা লইয়াই কালচার।

### কালচারের ব্যাপকতা

এমনিভাবে মানুষের গৃহনির্মাণ পোশাক-পাতি, রান্না-বান্না, খেলা-খুলা, নাচ-গান, মাগ ও ওয়ানিসী আইন-কানুন পর্যন্ত সব ব্যবস্থার মধ্যেই খানিকটা কালচার ও খানিকটা সিভিলিযেশন রহিয়াছে। মানুষ আদিকালে বনে-জংগলে-গুহায় বাস করিত। স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া তারা সভ্য হইয়াছে। স্থপতি বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়া অধিকতর সভ্য হইয়াছে। কাজেই আবাসগৃহ নির্মাণ সভ্যতা। কিন্তু স্থাপত্যের রূপ কি হইবে, দালান-ইয়ারত চূড়াওয়াল বা গম্বুজওয়াল হইবে, না চোকোণা বা চ্যাপ্টা হইবে, ইট-পাথরের হইবে, না কাঠ-বাঁশের হইবে—এ সব কালচারের ব্যাপার। কাপড় পরা-না-পরানো সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি ধরনের পোশাক পরা হইবে, প্যান্ট না পাজামা, কোট না কের্তা, শাড়ি-সেলওয়াল, না স্কর্ট-গাউন—সেটা কালচারের প্রশ্ন। মাছ-গোশত-তরকারি রাখিয়া খাইবে, না কাঁচা খাইবে—এটা হইবে সভ্যতার প্রশ্ন। কিন্তু কি প্রণালীতে রান্না করিবে, কোন্টা খাইবে, আর কোন্টা খাইবে না, কোন্টা হালান, কোন্টা হারাম, কি ধরনের পাক-প্রণালী পহন্দর, পেস্টিপ্যাটিস ভাল, না রসগোল্লা-সন্দেশ ভাল—এ সব কালচারের প্রশ্ন। খেলা-খুলাকে মানুষের কর্মজীবনের স্বাভাবিক অঙ্গ স্বীকার করা সভ্যতা। কিন্তু খেলার বিভিন্ন রূপ : ফুটবল না রাগবি, ক্রিকেট না বেসবল, পলো না ঘোড়দৌড়, হকি না ডাংগুলি—এসব সভ্যতার প্রশ্ন নয়, কালচারের প্রশ্ন মাত্র। সংগীত ও নৃত্যকে চারুশিল্পের অন্তর্গত করা সভ্যতা।



## আমাদের কালচার

কিন্তু নাচ-গানের বিষয়বস্তু, ধরন ও প্রণালীটা কালচারের ব্যাপার। সম্পত্তির মালিকানার স্বীকৃতি সভ্যতার নিদর্শন। কিন্তু সে সম্পত্তির ওয়ারিস নির্ধারণ ও বস্তু-প্রণালীটা কালচার মাত্র।

### কালচারের উৎস

উপরের আলোচনা হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, যে মন ও মস্তিষ্ক মানুষকে অন্যান্য জীব-জন্তু হইতে পৃথক করিয়াছে, সেই মনের বিকাশের নাম কালচার, মস্তিষ্কের বিকাশের নাম সিভিলিযেশন। আগের আলোচনা হইতে এটাও স্পষ্ট হইয়াছে যে, এই নির্ধারণও নিজের ওজনে নিখুঁত নয়, মাত্র মোটামুটিভাবে সত্য। সভ্যতা বুদ্ধির বস্তু বলিয়াই সে নিজের জোরে রাজ্য জয় করে। প্রসার ও বিস্তার লাভ করে। হৃদয়ের সাথে সভ্যতার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়। তাই গ্রহণ-কারীকে অন্তর দিয়া সভ্যতা গ্রহণ করিতে হয় না। তার কোনও দরকারও নাই। এ্যারোপ্লনকে শয়তানের কল বলিয়াও অনেকে হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া হজ করিতে যাইতেছেন।—অন্যান্য সব সম্পদের মতই সভ্যতার সাফল্য তার প্রয়োজনে।

আজিকার যান্ত্রিক সভ্যতাই তার প্রমাণ। প্রয়োজনের তাকিদেই সারা দুনিয়া এই পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের ব্যাপার বলিয়া ইহা গ্রহণ করিতে কারও কোন অসুবিধা হয় নাই। দুনিয়ার সব দেশেই ইহা খাপ খাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির বিধানেই ইহা ঘটিয়াছে। কথাটা সহজে বুঝিবার জন্য আমরা সভ্যতাকে ইমারতের সংগে তুলনা করিতে পারি। আর কালচারকে তুলনা করিতে পারি, এবং আগেই করিয়াছি, গাছের সংগে। ইমারত মাটি হইতে রস গ্রহণ করে না। কাজেই যে-কোন সরঞ্জামের যে-কোনও প্লানের ইমারত যে-কোনও দেশে নির্মিত হইতে পারে। কিন্তু গাছকে মাটি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বাঁচিতে হয়। সেজন্য যে-কোনও গাছ দুনিয়ায় যে কোনও দেশে লাগান যায় না। মাটি রস সংগ্রহের উপযোগী না হইলে চারা লাগাইলেও তা বাঁচে না।

## বাংলাদেশের কালচার

কালচার সম্বন্ধেও এই কথা। যে-কোন দেশের কালচার, তা যতই সুন্দর হউক না কেন, অন্য যে-কোন দেশে চান্নান যাইবে না। স্থানীয় রসের অভাবে তা মারা যাইবে। কারণ আগেই বলিয়াছি কালচারটা মনের বস্তু, মস্তিষ্কের বস্তু নয়। এই দিক হইতে বিচার করিয়া বলা যায় সিভিলিযেশন একটা র্যাশনাল কনস্ট্রাকশন; আর কালচার একটা ইমোশন্যাল গ্রোথ।

ঠিক এই কারণেই দুনিয়ার লোককে যত সহজে পশ্চিমা সভ্যতা গ্রহণ করান গিয়াছে, তত সহজে পশ্চিমা কৃষ্টি গ্রহণ করান যায় নাই। সভ্যতা প্রসার লাভ করে বিজয়ীর বেশে। পশ্চিমা জাতিসমূহ রাজ্য বিস্তারে ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে তিন শ বছর ধরিয়া সারা দুনিয়ান্ন প্রভুত্ব করিয়াছে। এই উপলক্ষে তারা জগতবাসীর কাছে নিজেদের সভ্যতা প্রচার করিয়াছে। বিশ্ববাসী তা গ্রহণও করিয়াছে।

নিজেদের সভ্যতার সাসে সাথে পশ্চিমারা নিজেদের কালচার প্রচারের চেষ্টাও কম করে নাই। কিন্তু শহরের মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া সাধারণভাবে দুনিয়ার সব দেশের জনগণ পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করে নাই। শাসক জাতির কালচারের প্রবল স্রোতের মুখেও তারা নিজেদের কালচার মজবুত হাতে ধরিয়া রাখিয়াছে। এটা মানুষের দর্প নয়, প্রকৃতির দর্প। সব দেশের মাটি পশ্চিমা কালচারের চারা গাছের রস যোগাইতে পারে নাই বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে।

### বৈচিত্র্য অপরিহার্য

এটা কি অন্যান্য হইয়াছে? পশ্চিমা কালচার গ্রহণ না করিয়া পুরবীরা কি ভুল করিয়াছে? এটা কি তাদের কুসংস্কারী মনোভাবের জন্য হইয়াছে? এটা কি তাদের সংস্কার-বিরোধী নস্টালজিয়া? তারা কি জানে না, কি জিনিস তারা হারাইতেছে? না, প্রকৃত অবস্থা তা নয়। মানব জাতির কল্যাণের খাতিরেই তা ঘটিয়াছে। যে বৈচিত্র্যে বিশ্বের সৌন্দর্য নিহিত, স্রষ্টার কারিগরির অসাধারণত্বের যা নিদর্শন, তারই খাতিরে প্রকৃতি এরূপ ঘটাইয়াছে।

## আমাদের কালচার

ধরুন, এমন যদি না হইত, দুনিয়ার সব জাতি যদি পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিত, তবে অবস্থা কি দাঁড়াইত? সত্যতার দিক হইতে দুনিয়া যেমন একাকার হইয়া গিয়াছে, কালচারের দিক হইতেও তেমনি সব জাতি একরংগা হইয়া যাইত। দেহের রং অবশ্য এক হইত না। কিন্তু মনের রং এক হইয়া যাইত। তাতেও কার কি লোকসান হইত?

মানবতার লোকসান হইত দুই দিক হইতে। প্রথমতঃ দুনিয়ার বৈচিত্র্য নষ্ট হইত। বিভিন্ন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটিত। হাজার ফুলের বাগিচা যে দুনিয়া, সেটা পরিণত হইত এক রংগা গেম্বা ফুলের ক্ষেতে। দুনিয়ার সব জাতি নকল পশ্চিমা জাতিতে পরিণত হইত।

লাখ লোকের সমাজের মধ্যে দুই-চারজন মাত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন থাকিয়া বাকী সব লোক ব্যক্তিত্বহীন হইলে সমাজের অবস্থা যা দাঁড়াইবে, দুনিয়ার সব জাতি নিজ-নিজ কালচারের স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়া পশ্চিমা কালচার গ্রহণ করিলে বিশ্ববাসীর অবস্থা দাঁড়াইবে ঠিক তাই।

দ্বিতীয়তঃ দুইচারজন লোক বা শ্রেণীবিশেষ বাদে সমাজের আর সব লোক ব্যক্তিত্বহীন হইলে সে সমাজ সচেতন সমবেত গণ-জীবন থাকিবে না, হইয়া যাইবে রাখালের পরিচালনায় একপাল গরু। স্বকীয় কালচার বা ব্যক্তিত্বহীন জাতিসমূহ ঠিক তেমনি পশ্চিমা রাখালের অধীনে গরুর পাল হইয়া যাইত। ফলে পশ্চিমা জাতিসমূহ ছাড়া আর সব জাতি হারাইত স্বাধীন চিন্তা, কর্মোদ্যম ও সৃষ্টির অভিল্লাষ। বিশ্ব-সভ্যতায় তাদের কোনও অবদান থাকিত না। কার্যতঃ তারা পরিণত হইত প্রাণহীন যন্ত্রে।

কাজেই দেখা গেল, লোক-সমাজে আদর-কদর মানে হইলে যেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হইতে হয়, তেমনি আদর-কদর ও মান-মর্যাদা পাইতে হইলে আমাদের হইবে সমবেত ব্যক্তিত্বের, মানে নিজস্ব কালচারের ও কালচারের প্রয়োজন এইখানেই।

## বৈচিত্র্য স্বাভাবিক

মনে রাখা দরকার, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্ব যেমন, জাতির ব্যক্তিত্বও তেমনি, কদাচ নিখুঁত, ত্রুটিহীন হইতে পারে না। মারিয়া-পিটিয়া যেমন ব্যক্তিত্ব হয় না, ছাঁচে ঢালিয়া তেমনি কালচার হয় না। আগেই বলিয়াছি, কালচারটা ডিফাইন-করা কনস্ট্রাকশন নয়। ওটা গাছের মতই ন্যাচারেল গ্রোথ। বলা যায় ওটা প্রকৃতির তৈরী নদী। মানুষের হাতে-কাটা খাল নয়। দুই কূল ছাপিয়া দুই পাড় ভাংগিয়া ইচ্ছামত চলাই নদীর ব্যক্তিত্ব। কৃত্রিম খালের মত তার দুই পাড় শানে-বাঁধা নয়। এই জন্যই দোষে-গুণে যেমন ব্যক্তিত্ব, ভাল-মন্দেই তেমনি কালচার। দুনিয়ার সব কালচারের শুধু গুণগুলি বাছিয়া লইয়া একটা নিখুঁত সুন্দর কালচার গড়িবার চেষ্টা করিয়া দেখুন, পারিবেন না। সেটা কালচার হইবে না, হইবে বড় জোর কালচারের ল্যাবরেটরি। মিউয়িগাম হইবার সম্ভাবনাই বেশী।

এর কারণও সুস্পষ্ট। মানুষ ফেরেশতা নয়, দোষে-গুণেই তারা মানুষ। তাদের এ দোষ-গুণের বিশেষত্ব এই যে এক দিক হইতে যেটা দোষ, আর এক দিক হইতে সেটাই সবলতা। ধরুন, মানুষের রাগের কথা। এক সময়ে এটা দোষ। কিন্তু সমস্রান্তরে এটাই গুণ। নিষ্ঠুরতারই আর এক নাম বীরত্ব। কাপুরুষতাকেই সময়বিশেষে সহিষ্ণুতা বলা হয়। আহাম্মকির সাধু নাম সরলতা।

কালচারের বেলাও তাই। একের জন্য যা দোষ, অপরের জন্য তাই গুণ। এটাই তাদের পার্থক্য। এই পার্থক্যটুকুই যার-তার বৈশিষ্ট্য। ছবছ ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মতই। একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক। হাত-পা, চোখ-মুখ নাক-কান খানা-পিনা হাগা-মুতা এবং জন্ম-মৃত্যু কোনও ব্যাপারেই জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। মন ও মস্তিষ্কের দোহাই দিয়া তাহাদের মধ্যে যে পার্থক্য করি, তাও বড় ক্ষীণ। বানরের বেলায় সে পার্থক্যের সীমা কোথায়। শুধু মন-মস্তিষ্কই নয়, তাদের অন্তরও আছে। তাহারাও হাসে-কঁাদে। ভাষাও তাদের একটা আছে।

## বৈশিষ্ট্য কি ?

তথাপি মন-মস্তিষ্ক ও অন্তরের এক স্তরে জানোয়ার ও মানুষের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য স্থূল দৃষ্টিতে যতই ক্ষীণ হউক না কেন ঐ পার্থক্যটুকুই মানুষের নিজস্বতা। ঐ টুকুই তার বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিত্ব ও কালচারের বেলাও অবিকল তাই সত্য। হাজার বিষয়ে এক ও সদৃশ হইয়াও সামান্য দুই-এক বিষয়ে তারা পৃথক স্বতন্ত্র ও অসদৃশ। দেখা যাইবে সবই ত এক। তবে আর পার্থক্যটা কি ? হাঁ, আছে। ঐ যে মানুষের ভিড়ের মধ্যে মাত্র এক ইঞ্চি বেশী লম্বা একটা লোক দেখা যাইতেছে, ঐ দৈর্ঘ্যটুকুই তার বিশেষত্ব। হাতে-পায়ে রং-চেহারায় কথাবার্তায় সব ব্যাপারেই আর সবার সাথে তার মিল আছে। কারণ সেও মানুষ। মানুষ না হইয়া সে যদি একটা খুঁটি বা উট হইত, তবে তার উচ্চতা তার বৈশিষ্ট্য হইত না।

তেমনি আগে কালচার হইতে হইবে। তারপর আসিবে কালচারের বৈশিষ্ট্য। সব কালচারের মধ্যে ঐক্য মিল ও সাদৃশ্য থাকিবে হাজার। আর পার্থক্য থাকিবে মাত্র দুই একটি। ঐ পার্থক্যটুকুই তাদের বৈশিষ্ট্য। অপরের চোখে বা বিজ্ঞানের বিচারে সে পার্থক্যটুকু তুচ্ছ হইতে পারে। কিন্তু ঐ কালচারের জন্য তুচ্ছ নয়। খুব ছোট দৃষ্টান্ত দিয়াই বিচার করা যাউক। মুসলমানের নুরের দাম হিন্দু-খৃষ্টানের কাছে যা, হিন্দুর টিকির দাম মুসলিম-খৃষ্টানের কাছে তাই। আবার খৃষ্টানের ক্রসের দামও হিন্দু-মুসলমানের কাছে তুচ্ছ। ইহুদি-মুসলমানরা তাদের ছেলদের কেন খৎনা করায় এটা হিন্দু-খৃষ্টানরা বুঝিতে না পারিলেও ইহুদি-মুসলমানরা কিন্তু কাজটাকে তাদের কালচারের ফাণ্ডামেন্টাল মনে করে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ গোস্বামিকে অত বাবু ও চেহারায় অত সুন্দর হইয়াও মোচ দিয়া তাঁর অমন সুন্দর মুখখানা ঢাকিয়া রাখিতেন। সে জন্য আমরা তাঁর মুসলমান-খৃষ্টান ভক্তদের অন্তরে দুঃখের অন্ত ছিল না। সম্রাট শাহজাহান ও সার সৈয়দ আহমদের মত না হউক, মার্কস-এংগেলসের মত মোচ তিনি রাখিলেন না কেন ? কারণ ওটা কালচার।

ঠিক তেমনি দাড়ি-গোঁফের বেলা হিন্দু-খৃষ্টানেরা এত বিলাসী ক্লিনশেডার হইয়াও বগলতলা ও নাভির নিচ সম্বন্ধে অত সঞ্চয়ী কেন, মুসলমানরা তা বুঝি না। পোশাক-পাতিতে অত টাকা-পয়সা খরচ করিয়াও পশ্চিমা মেয়েরা পিঠ ও হাঁটুর নিচ ঢাকিবার কাপড়ের পয়সা জুটাইতে পারে না কেন, আমরা পুরবীরা তার কারণ খুঁজিয়া পাই না।

পক্ষান্তরে আমরা আমাদের মেয়েদের অত-অত কাপড়ে আপাদ মস্তক ঢাকিয়া রাখি কেন, তা বুঝাও পশ্চিমাদের পক্ষে কম কঠিন নয়। পশ্চিমাদের ক্লাব-লাইফ ও তিলা-দাম্পত্য জীবন দেখিয়া তাদের মেয়েদের জন্য আমরা কত আফসোস করি। কিন্তু আমাদের এক সংগে একাধিক বিবি লইয়া ঘর করিতে দেখিয়া পশ্চিমারাও আমাদের নারীজাতির জন্য কম আফসোস করে না। আমরা মুসলমানরা আরবী-ফারসীতে সুন্দর-সুন্দর অর্থপূর্ণ নাম রাখি। হিন্দুরা সংস্কৃত-হিন্দীতে সুন্দর অর্থজাপক নাম রাখে। কিন্তু পশ্চিমা খৃষ্টানেরা জানে-বিজ্ঞানে ও সভ্যতা-ভব্যতায় অত উন্নত হইয়া যা তা অর্থহীন ও কদর্য নাম রাখিতে লজ্জা পায় না। আমরা যাকে অখাদ্য মনে করি, অনেক সভ্যজাতি তাই খায় পরম লম্বহতের সাথে।

বিজ্ঞানী দার্শনিকের কাছে এ সব ব্যাপার যতই ছোট হউক না কেন, এ সবার মধ্যেই নিহিত কালচারের পার্থক্য। আসলে এ সবার সমষ্টির নামই কালচার। এই সব ব্যাপার দিয়াই আমাদের কালচারেরও বিচার করিতে হইবে।) পাক-বাংলার কালচারেরও মাপকাঠি হইবে ইহাই। আসুন, এখন সে বিচার করা যাউক।

### পাক-বাংলা বনাম গোটা বাংলার কালচার

প্রথমেই একটা ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া লওয়া যাক। গোটা বাংলার কালচার না বলিয়া শুধু পাক-বাংলার কালচার বলিলাম কেন? কারণ এই, বাংলার কালচার বলিয়া কোনও কালচার নাই। কথাটা প্রথম দৃষ্টিতে ব্রান্ত মনে হইবে। বাংলা একটা দেশ।

## আমাদের কালচার

বাঙ্গালী একটা জাতি। এটাই স্থূল সত্য। কারণ দেশ, গোত্র, ভাষার দিক হইতে বাংলার বাশিন্দারা একটা জাতি। এই জাতির একটা জাতীয় কালচার থাকার কথা। কিন্তু সত্য কথা এই, বাংলায় কোনও জাতীয় কালচার নাই। বাংলা সেদিন বৃটিশ ভারতের এবং তারও আগে মোগল ভারতের প্রদেশ ছিল বলিয়াই বাঙ্গালীরা স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারে নাই এবং সেই কারণে বাঙ্গালীদের কোনও জাতীয় কালচার নাই, ব্যাপারটা তা নয়। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ছাড়াও মানব-গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠিতে পারে। বাংলায় জাতীয় কালচার গড়িয়া না উঠার কারণ রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নয়, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। এটা সবাই জানেন যে, সমাজই কালচারের নার্সারি জননী বা সূতিকাগার। বাংলার মানুষের সমাজ একটা নয়, দুইটা। সে দুইটা সমাজ এক্সক্লুসিভ। তাদের মধ্যে খাওয়া-পরা, বিবাহ-শাদি ইত্যাদি সামাজিক মিল নাই। তাই এগার শ বছর এক দেশে বাস করিয়া একই খাদ্য পানীয় খাওয়াও তারা দুইটা পৃথক সমাজ রহিয়া গিয়াছে। এক সমাজের লোক জন্মিয়া খৎনা করিয়া নিজস্ব সমাজে বাস করিয়া মরিয়া গোরশানে যায়, অপর সমাজের লোক অশৌচান্ত ও উপনয়ন করিয়া নিজের সমাজে বাস করিয়া মৃত্যুর পর শ্মশানে যায়। ফলে এই দুইটি সমাজে দুইটা প্যারালেল কালচার গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় কালচার গড়িয়া উঠে নাই। বাংলা ভাগের মধ্যে দুইটা কালচার নিজ-নিজ আশ্রয় স্থল খুঁজিয়া পাইয়াছে। পাক-বাংলার কালচার অর্থে বিভক্ত বাংলার পূর্বাঞ্চলের কালচার বুঝাইতেছি।

## আমাদের সত্যতা

রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন। মাত্র আঠার বৎসর আগে আমাদের পয়দায়েশ। যত বিলাসি এইখানেই। আমাদের চিন্তার যত অস্বচ্ছতা, যত অপরিচ্ছন্নতা, সব গুরু হয় এইখানে। আমরা ভুলিয়া

মাই, রাষ্ট্রীয় জাতি হিসাবে আমরা নতুন হইলেও সভ্য মানুষ ও কৃষ্টিমান জাত হিসাবে আমরা শিশু নই। আমাদের মাতৃভূমির নাম পাক বাংলা। এটা প্রাচীন সমতট দেশ। হঠাৎ জনধি হইতে ভাসিয়া-উঠা চরভূমি নয়। অন্ততঃ দুই হাজার বছরের প্রাচীন কাহিনী ইহার ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

আধুনিকতম ধর্মের উন্মত হিসাবে, তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্য জাতি হিসাবে, আমরা প্রায় সাত শ' বছর এই দেশ ও পার্শ্ববর্তী দেশ-সমূহ কৃতিত্বের সংগে শাসন করিয়াছি। সে শাসন বিদেশী বিজয়ীর বেশে উচ্চাসনে বসিয়া করি নাই। এ দেশকে মাতৃভূমি জ্ঞান করিয়া জনগণের সাথে মিশিয়া তাদের মধ্য হইতে তাদেরই নেতা হিসাবে খাদেম হিসাবে সে শাসন করিয়াছি। জীবন শেষে জনগণের সাথেই মাতৃভূমির মাটিতে মিশিয়া আছি।

এই মুহুর্তে বাংলাদেশ ছিল শিক্ষা-সভ্যতার পীঠস্থান—শিল্প-বাগিঞ্জের কেন্দ্র কৃষ্টি-স্থপতির লীলাভূমি। চীন-আরব-গ্রীক-রোমান প্রভৃতি সভ্য জাতির পণ্ডিতগণের তীর্থক্ষেত্র। অর্জ হইতে মাত্র তিন শ' বছর আগেও পাক-বাংলা তৎকালীন সভ্য জগতের দরবারে উচ্চ আসনের অধিকারী ছিল। নবাব গুজা ও শায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসী চিকিৎসক বানিয়্যার ও ব্যবসায়ী টেভানিয়্যার এবং ইংরাজ পরিব্রাজক রালফ্ ফিশ্ ব্যাপকভাবে পাক-বাংলা পরিভ্রমণ করিয়া এদেশের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। তারা দেখিয়া ছিলেন, পাক-বাংলা তৎকালে বিভিন্ন দেশে চাউল চিনি সুতি কাপড়, রেশমী কাপড়, জব্বার, আফিম ও লবণ রফতানি করিত। ঐ সব জিনিস এ দেশে এত সরস ও সম্ভা ছিল যে, বিদেশ হইতে বড়-বড় সওদাগর বিশাল-বিশাল জাহাজে করিয়া এসব জিনিস নিতে আসিতেন। ষোল শতকের মাঝামাঝি ভিনিশীয় পরিব্রাজক সিমার ফ্রেডরিক পাক-বাংলা ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিলেন : 'এখানকার সম্বীপ বন্দর জন-বহুল এক বিশাল বাগিজ্য-কেন্দ্র। এই বন্দরে প্রতিদিন গড়ে দুই শ' জাহাজ লবণ বোঝাই হইয়া বিদেশ গমন করে। এখানকার জাহাজ নির্মাণ-



## আমাদের কালচার

কৌশল এত সুন্দর ও কাঠ এত মজবুত যে, ইস্তাখুলের সুলতান আলেকযাদ্রিয়ায় বদলে এখন তাঁর রাজ্যের প্রয়োজনীয় সমস্ত জাহাজ এইখান হইতে তৈয়ার করাইয়া থাকেন।'

### আমাদের কালচার

পাক-বাংলার সভ্যতা ও শিল্প-বাণিজ্যকে আমরা মুসলমানরা এত-খানি উন্নত করিয়াছিলাম। সেই সংগে পাক-বাংলার কালচারকেও আমরা নানা ফুলে-ফলে ও রূপে-গন্ধে সুসজ্জিত ও সুরভিত করিয়া-ছিলাম। এটা আমরা একদিনে করি নাই। বাংলার মাটির সাথে আমাদের সম্পর্ক হাজার বছরেও বেশী কালের। পুরা সাড়ে ছয় শ' বছর আমরা এই দেশের শাসক ছিলাম। তার মধ্যে প্রায় তিন শ' বছর আমরা স্বাধীন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিয়াছি। এই মুদতে আমরা বাংলাকে নিজস্ব জাতি-নাম, ভাষা ও সাহিত্য দিয়া-ছিলাম। সে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া বাঙ্গালীকে নতুন মর্যাদা, তার ভাষায় নতুন সুর, তার গলায় নতুন জোর দিয়াছিলাম। কৃষ্টি-সভ্যতা শিল্প-বাণিজ্য ও শিক্ষা-সাহিত্যে সভ্য জগতের দরবারে বাংলা-দেশকে করিয়াছিলাম সুপ্রতিষ্ঠিত। পাক-বাংলার শিল্প-সাহিত্যে ও কৃষ্টি-সভ্যতার হাজার বছরের এই মুসলিম ছাপ সুস্পষ্ট দীপ্তমান।

প্রাকৃতিক আনুকূল্যও মুসলমানদের এই সাফল্যের সহায়ক ছিল। কি নৃতত্ত্বের দিক হইতে, কি ভাষা-কৃষ্টির দিক দিয়া পাক-বাংলা আর্থ-ভারত হইতে বরাবরই ছিল পৃথক। আর্থরা কোনও দিন পারে নাই বাংলা জয় করিতে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই এ দেশ দ্রাবিড়-দের দখলে ছিল। দ্রাবিড়রা বর্ণাশ্রম-ধর্মী।—আর্থ ধর্মের চেয়ে বর্ণ-বিরোধী সাম্যবাদী বৌদ্ধধর্মের দিকেই বেশী আকৃষ্ট হয়। বাংলার পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের আমলে এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম, দ্রাবিড়ী কৃষ্টি ও বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল। পাল রাজার বাংলাদেশকে শুধু আর্থ-কৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষার হাত হইতেই বাঁচার নাই, তাঁদের কেউ-কেউ মগধ পর্যন্ত দখল করিয়া আর্থ-ধর্ম ও সংস্কৃত ভাষাকে বাংলার সীমানার বাহিরে বহুদূরে ঠেলিয়া দিয়াছিলেন।

পাল রাজাদের পরে সেন রাজারা যখন বাংলার নিজস্ব ভাষা ও কৃষ্টি দমন করিয়া ইহার উপর আর্য-কৃষ্টি ও সংস্কৃত ভাষা চাপাইবার অপচেষ্টা শুরু করেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলায় মুসলিম-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রমবিরোধী বৌদ্ধধর্ম সাম্যবাদী ইসলামের সাহায্য ও সহযোগিতায় চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায়। ইসলামী ছাপ লইয়া বাংলায় নয়া কৃষ্টি-জীবন গড়িয়া উঠা শুরু হয়। মুসলিম আমলে একটানা সাড়ে ছয় শ' বছর ধরিয়া চলিতে থাকে এই নয়া কৃষ্টি-জীবন সৃষ্টির কাজ। তা এমন দানা বাঁধে যে মুসলিম শাসনের অবসানের পরেও উনিশ শতকের শেষ দিন অবধি দীর্ঘ এক শ' বছর ধরিয়া সে কৃষ্টি-সাহিত্যের প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকে।

নবাগত ইংরাজ শাসকরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক তাকিদে ও দেশ শাসনের সুবিধার খাতিরে হিন্দু-মুসলিম-বিরোধ সৃষ্টির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে প্রচলিত ভাষা-কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে হিন্দুদের উচ্চানি দেয়। বাংলা কৃষ্টি-সাহিত্যকে ইসলামী ছাপমুক্ত এবং বাংলা ভাষাকে আরবী-ফারসী শব্দ-বজিত বিগুহ্ন আর্য ভাষা করিবার পরামর্শ দেয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা সাজাইবার অলঙ্কারাদির নির্মাণ-কার্য শুরু হয় এই সময় হইতে। এ কাজ শুরু করে ইংরাজরা একাই। সরকার ও মিশনারীদের সমবেত শক্তি নিয়োজিত হয় এই শুদ্ধিকরণে।

পুরা এক শ' বছরের অবিশ্রান্ত চেষ্টায় বিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিষময় ফল ফলিতে শুরু করে। প্রচলিত বাংলা ভাষা ও হাজার বছরের কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে এ্যাংলো-হিন্দু অভিযান সফল হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পিতা, বাংগালী জাতির মেজরিটি মুসলমান এই অভিযানের মোকাবেলায় রুখিয়া দাঁড়ায়। ক্রমে মুসলিম-কৃষ্টির সাথে রিভাইভ্যালিস্ট হিন্দু-কৃষ্টির এবং প্রচলিত বাংলা যবানের সাথে সংস্কৃতীকৃত নব্য বংগ ভাষার সংঘাত বাধে। এই সংঘাতের শেষ পরিণাম পাকিস্তানের সৃষ্টি। পাক-বাংলার কৃষ্টির ইহাই পটভূমি।

তিনটি মুন্দা কথা

এই আলোচনার গোড়াতেই তিনটা মুন্দা কথা বৃত্তিতে হইবে : এক, সাড়ে ছয় শ' বছরের মুসলিম-শাসন বাংলায় কৃষ্টি-সাহিত্যের যে গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তার সবটুকুই শাহী-নবাবী কালচার ছিল না। তার বেশীর ভাগেরই একটা জাতীয় প্রাণ ও গণ-রূপ ছিল। বাদশাহি যাওয়ার পরও এক শ' বছর এইটাই বাঁচিয়া ছিল। দুই, বিদেশী শাসকরা স্বদেশী প্রতিবেশীদের সহায়তায় দেড় শ' বছর ধরিয়া যে কৃষ্টি-সাহিত্যের বিরুদ্ধে সমবেত অভিযান চালাইয়াছিল, সেটা ছিল এরই বিরুদ্ধে। তিন, এই অবলুপ্ত জাতীয় কৃষ্টির রেনেসাঁ সাধনে তাকে যুগোপযোগী করিয়া আমাদের জাতীয় ব্যক্তিত্বকে সঞ্জীবিত করার দুনিবার তাকিদেই পাকিস্তানের সৃষ্টি। আরও সংক্ষেপে তিনটি কথা এই : আমরা কি ছিলাম ? কি হইয়াছি ? কি হইব ?

আমরা নির্ভয়ে দাবি করিতে পারি, বাঙালী মুসলমানরা একটি সমৃদ্ধিশালী ঐতিহাসিক কালচারের উত্তরাধিকারী প্রাচীন সভ্য জাতি। কালচার ঐতিহ্যহীন একটা ভূ-ইফোড় জাতি আমরা--এমন কথা পরম শত্রুও বলিতে পারিবে না। নয়া রাষ্ট্রীয় জাতিত্বের দোহাই দিয়া অমন অজুহাত আমরা নিজেরাও দিতে পারি না। ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, বাংগালী মুসলমানরা ধর্ম ও সমাজ-জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাদের বিখ্যাসে-সৈমানে, আচারে-অনুষ্ঠানে, আদবে-কায়দায়, ঘোরা-কোপোশাকে, জন্মে-মৃত্যুতে, শাদি-গমিতে, পরবে-উৎসবে, আমোদে-প্রমোদে, খেলায়-ধূল্যায়, নাচে-গানে, আর্টে-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্যে, বীরত্বে-মহত্বে, যুদ্ধে-শান্তিতে, কামানে-বন্দুকে, অস্ত্রে-শস্ত্রে, দালানে-ইমারতে, ইনসাফে-আদালতে, আইনে-কানুনে একটা ব্যাপক ও সামগ্রিক, উদার ও উন্নত কালচার গড়িয়া তুলিয়াছিল।

সে কালচার শুধু মুসলমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। অমুসলমান বাংগালীর মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ফলে তা পাইয়াছিল

একটা জাতীয় সত্তা ও সার্বজনীন রূপ। যুগের দাবিতে দেশজ পরিবেশে জাগরণের প্রেরণায় সামাজিক কল্যাণ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের তাকিদে ন্যাচারেল গ্রোথের মতই সে কালচার ধীরে-সুস্থে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই তা পাইয়াছিল জাতীয় রূপ। ইতিহাস এও সাক্ষ্য দিতেছে যে বিদেশী শাসকরা তাদের রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই আর্ষ রিভাইভ্যালি-যমের উস্কানি দিয়া আমাদের হাজার বছরের প্রতিবেশীকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল এবং তাদেরই সহায়তায় রাজশক্তির দমন-নিপ্লে-ষণের দ্বারা সে কালচারের ধ্বংসাত্মিক চান্সাইয়াছিল। এমনভাবে রাজ-রোষ আমাদের কালচারের অপমৃত্যু ঘটে; বার্ষিকের দরুন তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নাই।

সে নিধন-যজ্ঞের কথা ইতিহাস-পাঠকরা জানেন। শাসকরা কেমন করিয়া কলমের এক খোঁচায় প্রচলিত রাষ্ট্র-ভাষার পরিবর্তন করিয়া যুগ যুগান্তের শাসক-বিচারকদেরে অফিস-আদালত হইতে বাহিয়্য করিয়া রাস্তার ধূলায় নামাইয়া দেয়, শিক্ষা-নীতি পাল্টাইয়া কেমন করিয়া তারা হাজার বছরের ইন্সটিটিউশিয়াকে নিরক্ষর মৃত্যুর জাতে পরিণত করে, রিমান্ডেশন পলিসির নামে কিরূপে তারা এক কালের সম্পদশালী অভিজাত সম্প্রদায়কে দীনহীন পথে পথের কাংগালে রূপান্তরিত করে, ইতিহাসের ছাত্ররা তার সব খবরই রাখেন। এটা কালচার রক্ষার পরিবেশ ছিল না। মুসলমানদের আত্মরক্ষাই যখন একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কালচার রক্ষার প্রস্নই উঠে না।

## আজিকার প্রস্ন

কিন্তু আজ? আজিকার কৈফিয়তটা কি? এত বড় সম্পদশালী ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী প্রাচীন জাতি হইয়াও যদি আমরা আজ কালচারে গরীব হই, আঠার বছরের স্বাধীনতার পরেও যদি আমরা কৃষ্টিতর স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিয়া থাকি, তবে সে দোষ

## আমাদের কালচার

দিব আমরা কাকে ? বাদশাহি যাওয়ার সাথে-সাথেই আমাদের কালচারের শাহী রূপটুকু যে গিয়াছে, সেটা বড় কথা নয়। বাদশাহি থাকিবার জিনিসও নয়। এ যুগের তন্ত্রও সেটা নয়। আমরা সবাই নবাব-বাদশাহি ছিলাম না। সবাই আমরা নবাব-বাদশাহির বংশধরও নই। আমরা মুসলিম জনসাধারণ মুসলিম শাসনামলেও আর দশজনের মতই প্রজাসাধারণই ছিলাম। কাজেই মুসলিম আমলের কালচারের শাহী রূপ নয়, গণ রূপটাই বড় কথা। ঐ রূপেই ছিল সেটা আমাদের কালচার। ওটারই আমরা উত্তরাধিকারী। তারই রক্ষণ ও বিকাশনই আমাদের দায়িত্ব। কাজেই আমাদের বুঝা দরকার, সেটার রূপ কি ছিল, কি হইয়াছে, আর কি হইতে হইবে।

আগের আলোচনা হইতে এইটুকু নিশ্চয় পরিষ্কার হইয়াছে যে, মানুষের ধর্মোৎসবে, আচারে-অনুষ্ঠানে, নামে-নিশানায়, খোরাকে-পোশাকে, আর্টে-সাহিত্যে, নাচে-গানে ও আদবে-কায়দায়ই তাদের কালচারের গণরূপ প্রতিফলিত ও বিকশিত হয়। কাজেই আমাদেরও কালচারের ঐতিহ্য ও বর্তমান এ সবার মধ্যেই সন্ধান করিতে হইবে।

প্রথমেই ধরুন ধর্মোৎসবের কথা। ধর্মোৎসবই সকল জাতির কৃষ্টিজীবনের সবচেয়ে প্রশস্ত ও উর্বর ক্ষেত্র। ধর্ম ও কৃষ্টির সম্পর্ক যে গাছ ও ফলের সম্পর্কের মতই ঘনিষ্ঠ, সে কথা আগেই বলিয়াছি। বস্তুতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্কেলিটন ঘেরিয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও আমোদ-প্রমোদের যে লহ-গোশত ও রগ-রেশা গড়িয়া উঠে, তার সমষ্টির নাম ধর্মোৎসব।

এই ধর্মোৎসবের বিকাশ ও বিস্তৃতিই কালচারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই সব উৎসবের প্রথম গুণ এই যে, এতে পূণ্যার্জন ও আনন্দ উপভোগ এক সংগে করা চলে। শেষ পর্যন্ত ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু যে উৎসবের মধ্যে তলাইয়া যায়, তাতেও মানবজাতির লোকসান হয় না। কারণ ধর্মের দিক হইতে তারা যা হারায়, কৃষ্টির দিক হইতে লাভ করে তার চেয়ে অনেক বেশী। বস্তুতঃ স্থপতি-ভাস্কর্য শিল্প-সংগীত ও কাব্য-

সাহিত্যের জন্মই এইখানে। ওদের দ্বিতীয় গুণ এই যে, ও-সবের আয়োজন করে অবশ্য মুষ্টিমেয় ধনী-লোক, কিন্তু আনন্দটা ভোগ করে ধনী-নির্ধন সকলে। তৃতীয় গুণ এই যে, এই সব উৎসব অন্য ধর্মের লোকদেরেও আকৃষ্ট করে এবং তাদের ভোগেও লাগে। ফলে তারা পরিণত হইতে পারে জাতীয় উৎসবে। মসজিদ মন্দির গির্জার বাইরে যে উৎসব যতট প্রসারিত হয়, জাতীয় রূপ পাইবার সম্ভাবনা হয় তার তত বেশী।

### ধর্মামুষ্ঠান ও আর্ট

এই সব কালচারেই অনুষ্ঠানের আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়াই জাতির সমবেত মন বিকশিত হয়। মানুষের আনন্দ-পিপাসু অতৃপ্ত মন আনন্দরসের আবেহায়াতের তাল্যশে অজানা স্বপ্নের দেশে উড়িয়া যায় কল্পনার বোররাকের ডানায় চড়িয়া। মন-পবনের নাওয়ে চড়িয়া মাশুক শাহযাদীর তাল্যশে সে পার হইয়া যায় সাত সমুদ্রের তের নদী।

এই মানসিক এ্যাডভেনচারেই মানুষ সাক্ষাৎ পায় নিত্য-নতুন সত্য-সুন্দরের। তাকেই তারা বাঁধিয়া রাখিতে চায় আর্ট-সাহিত্যে। সুরতের সংগে সিরতের, বহিরাকৃতির সাথে অন্তর-প্রকৃতির, ব্যক্তের সাথে সত্যের এপিয়ারেসের সাথে রিয়্যালিটির সার্থক সম্বন্ধ ঘটানই আর্টের কাজ। এই সম্বন্ধের সার্থকতা রসসৃষ্টিতে। তার সাফল্য সত্য ও সুন্দর লাভে। উভয়ের সম্বন্ধে যা, হয় তাই সত্য-সুন্দর। এটাই সুফী ধর্মের সাফল্য। সমস্ত কৃষ্টি-সংস্কৃতির চরম উৎকর্ষ। কারণ সত্য ছাড়া সুন্দর নাই। সুন্দর ছাড়া সত্য নাই। সত্যহীন সুন্দর নিগুস্তরের রস মাত্র। আর সুন্দরহীন সত্য অকিঞ্চিৎকর ঘটনা মাত্র।

এই সত্য সুন্দরের অস্তিত্ব গোড়াতে থাকে মানুষের কল্পনায়। আজিকার কল্পনাই আগামীকালের বাস্তব। আজ যা সত্য, গতকাল

## আমাদের কালচার

তাই ছিল অসত্য। আজিকার ধর্ম, গতকাল ছিল অধর্ম, দণ্ডনীয় পাপ। সমস্ত ধর্ম-প্রবর্তক ও সত্য-আবিষ্কারকের জীবনই এর প্রমাণ। সত্য ও সুন্দর লাভের চিরন্তন ইতিহাসই এই। বর্তমানে অতৃপ্তিই মানসিক এ্যাডভেনচারের বুনিন্দ। বাস্তবের বাইরে যাওয়ার নামই কল্পনা। এ যেন শূন্যে আসমানে স্পেসে লাফ দেওয়া। একমাত্র অতৃপ্ত ক্ষিধাই এমন সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে পারে। কাজেই যে জাতির এ ক্ষিধা নাই, সে অসুস্থ। যে জাতির কল্পনা নাই সে মৃত। দুনিয়াকে দিবার কিছু নাই তার।

এই স্বপ্ন-কল্পনাকে গণ-জীবনে প্রয়োগ সার্থক ও সফল করার প্রধান, এমন কি প্রায় একমাত্র, পথ ধর্মোৎসবের আনন্দোল্লাস। হিন্দুর দুর্গোৎসব-জন্মাষ্টমীর, বৌদ্ধের মাঘী-পূণিমার, খৃষ্টানের বড়দিনের আনন্দোৎসবের জীবন-প্রাচুর্যে তা সুস্পষ্ট। কিন্তু পাক-বাংলার গণ-জীবনে সে আনন্দোল্লাস কই? কোথায় ঈদ? কোথায় মোহররম? এ সব উৎসব-পরবে পাক-বাংলার মনের আকাশে জীবন-প্রাচুর্যের লক্ষ তারক্য জ্বলিয়া উঠে কি। আমাদের জীবন-সাগরে কর্ম-চাঞ্চল্যের ঝড় উঠে কি? আমাদের দেহের শিরায়-শিরায় নবজীবনের দ্যোতনার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটে কি? প্রাণ-রসের উচ্ছন্নতায় আমরা ফাটিয়া পড়ি কি? প্রাণের প্রাচুর্য ত কোথাও দেখি না। যা কিছু প্রাচুর্য সবই ত দেখি খানা-পিনায়। শুধু পোলাও-কোর্মা আর সিমাই-যর্দা—সিমাই-যর্দা আর পোলাও-কোর্মা। এই আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি? আমাদের কালচার কি শেষে খানা-পিনায় সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িল?

## ঈদুল-ফিতরের নথির

ঈদুল-ফিতরের কথাটাই ধরা যাক। এই ঈদ আসে ত্রিশ দিন রোযার পরে। রোযার ত্রিশ দিনকে যদি সংযম ও কৃষ্ণ সাধনার মুদ্রত ধরা যায়, তবে রোযা-শেষের ঈদের দিনে প্রাণ-প্রাচুর্যের বাঁধ-ভাংগা বন্যায় আমাদের জীবনের দুকূল ছাপাইয়া পড়া উচিত।

ঈদ অর্থ আনন্দোৎসব। কিন্তু আমাদের ঈদ আর তা নাই। ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু উৎসবের উল্লাসের নিচে চাপা পড়ার নথির আছে দুনিয়ায় অনেক। কিন্তু ধর্মের নিচে উৎসব চাপা পড়ার নথির দুনিয়াতে মাত্র একটি। তা আমাদের ঈদ। আনন্দ-উল্লাসের উন্মত্ততায় আমরা খোদাকে ভুলিয়া না যাই—এই উদ্দেশ্যেই ঈদ উৎসবের শুরুতে দুই রাকাত সুন্নত নামাযের বিধান করা হইয়াছিল।

তার কারণ ছিল। উল্লাসের উন্মত্ততায় সব উৎসবই আখেরে পাপাচারের ভৈরবীচক্রে পরিণত হয়। ইতিহাসের শিক্ষা এই। তাই ঈদে এই সাবধানতা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ঈদের সমাবেশকে ইবাদতের জমাতে পরিণত করার উদ্দেশ্য ত্রাতে ছিল না।

সেইজন্যই এতে নামাযের অনেক আহকাম ও আরকান—যথাঃ অযু, আযান একামত ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় নাই। হায়েযওয়ালী মেয়েদেরও ঈদের জমাতে शामिल হওয়ার তাকিদ এই কারণেই করা হইয়াছে। গৌরবের যুগে মুসলমানরা ঈদের উৎসবকে ঈদরূপেই পালন করিয়াছে। স্বাধীন ও প্রগতিশীল মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে আজো তাই করা হইতেছে। বাংলা ও ভারতে মুসলিম আমলে আমরাও ঈদকে জাতীয় আনন্দোৎসব হিসাবেই পালন করিতাম।

এই আনন্দোৎসবকে আমরা প্রার্থনা-সভায় পরিণত করিয়াছি আমাদের পতনের যুগে। স্বভাবতঃই এটা ঘটিয়াছে। সাময়িক বিপদেও মানুষ তার আনন্দোৎসবকে সংক্ষিপ্ত ও সঙ্কুচিত করে। স্থায়ী বিপদে ত কথাই নাই। দুদিন দীর্ঘস্থায়ী হইলে মানুষ অদৃষ্টবাদী ও অতিরিক্ত ধার্মিক হইয়া পড়ে আমরাও তাই হইলাম। প্রায় দুই-দুই শ' বছর কি বিপদটাই না গেল আমাদের উপর দিয়া! জান-মাল, মান-ইয যৎ কিছ ছিল না। সর্বাঙ্গক যুলুমে প্রাণ রাখিতেই আমাদের প্রাণান্ত! আনন্দোৎসব করিব কখন? তাই ঈদের দিনের ধর্মের যে বিধানটুকু না করিলেই নয়, সেইটুকু শুধু করিলাম, পারিলে ময়দানে গিয়া নয় ত মস্জিদেই। আর বেশীর ভাগ সময় ঘরের কোণে বসিয়া বিপদ-তারণ আল্লার দরগায় কাম্বাকাটি করিয়া কাটাইলাম দুই-দুই



শ' বছর। এই সময়েই আমাদের জীবন হইতে গেল স্বাচ্ছন্দ্য, সমাজ হইতে গেল উৎসব, ঘর হইতে গেল আনন্দ। সেই সঙ্গে গেল আর্ট ও সাহিত্য। আর্ট-সাহিত্য-সংস্কৃতি কাকে বলে, তা যেন আমরা ভুলিয়াই গেলাম। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উর্বর ক্ষেত্র ঈদ-পর্ব সৃজনশীলতার দিক দিয়া হইয়া গেল বন্ধা। আমাদের আর্টে-সাহিত্যে নামিয়া আসিল সঙ্ঘা।

### নিরানন্দের পরিণতি

ফলে, আজ আমাদের ঈদে আনন্দ নাই, আছে বেদনা। সংস্কৃতি নাই, আছে বিকৃতি। উল্লাস নাই, আছে আর্তনাদ। আনন্দের ক্ষিধা মানুষের পেটের ক্ষিধা ও যৌন-ক্ষিধার মতই তীব্র। সুস্থ ও স্বাভাবিক পথে নির্মল আনন্দ না পাইলে মানুষ পাপের পথে গিয়াই আনন্দ উপভোগ করে। তার উপর পরবাদিতে মানুষের আনন্দ-ক্ষুধার আসে জোয়ার। এই সময় সাংস্কৃতিক আনন্দ-অনুষ্ঠানে সে ক্ষুধার তৃপ্তি না ঘটাইলে মানুষ কুপথে গিয়া সে পিপাসা মিটাইবেই। আমাদের জীবনে তাই হইতেছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নির্মল আনন্দের অভাবে ঈদের দিনের প্রাণের জোয়ার খামাইতেছি আমরা সিনেমা দেখিয়া, কুস্থানে গিয়া এবং ক্লাবে 'ঈদবল' নাচিয়া। এটা বেদনার ও বিকৃতির নথির।

আর্তনাদের নথিরটা আরও প্রত্যক্ষ। মুসলমানদের মধ্যে কত যে বিকলাংগ, কুষ্ঠরোগী ও বেকার ডিম্বুক ছেলে-বুড়া নারী-পুরুষ আছে, তার প্রদর্শনী করি আমরা ঈদের দিনে, সদর দাস্তান ঈদের ময়দানে। বিকলাংগ, কুষ্ঠরোগী ডিম্বাজীবী কমবেশী অপরাপর জাতির মধ্যেও আছে। ধর্মস্থানে দান-খয়রাত উপলক্ষে তাদের ভিড়ও হয় নিশ্চয়ই। কিন্তু জাতীয় আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠানে এদের বীভৎস ভিড় হওয়ার ব্যবস্থা বোধ হয় আর কোনও জাতিতে নাই। সমাজ-দেহে ঘা-পাঁচড়া অঙ্গবিস্তার সব জাতিতেই আছে। বিশেষতঃ শোষণবাদী ধনতন্ত্রী সমাজ-

## বাংলাদেশের কালচার

দেহে তা বেশী করিয়াই থাকে। কিন্তু জাতীয় আনন্দোৎসবের দিনে ঘটা করিয়া তার প্রদর্শনী খুলে না কেউ। সত্য মানুষ শরীরের খোস-পাঁচড়া মলম-পটুটি দিয়া ঢাকিয়াই রাস্তায় বাহির হয়। দেহের ঘা বড় ও বিদকুটে করিয়া গুপ্তস্থানের ঘা কপালে ছড়াইয়া ক্ষতের ডিমেনস্ট্রেশন করে শুধু তারাই, পরের দয়ার উদ্রেক করিয়া ভিক্ষা করিয়া খাওয়া যাদের পেশা। যে জাতি ভিক্ষাকে কালচারে সম্মত করিয়াছে, তারা ছাড়া আর কেউ এটা পারে না। আমরা পারি, পারি বলিয়াই আমাদের কচি শিশু ছেলে-মেয়েরা ভিক্ষাকে পেশা করিয়াছে। ঈদের দিনে এইসব বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকের যে সমবেত আর্তনাদের জবাবে আমরা দুহাতে ফেৎরা-যাকাতের পাই-পয়সা বিলাইয়া কড়ির মূল্যে বেহেশত কিনিতেছি, সেটা আসলে ভিখারির আর্তনাত নয়, আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতিরই আর্তনাদ।

আমাদের তরুণরা এটা তীব্রভাবে অনুভব করে বলিয়াই তারা সম্প্রতি ঈদ রিইউনিয়নের আয়োজন করিতেছে।

এটা শুভ সূচনা। কিন্তু এখনও এ অনুষ্ঠান খানা-পিনাতেই সীমাবদ্ধ। একে সাংস্কৃতিক অলংকার পরাইয়া আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, মুসলমানের কালচারের চৌহদ্দি পেট নয়।

## মোহররমের জীবন-প্রাচুর্য

একমাত্র মোহররম পর্বেই মুসলমানেরা অন্যান্য কালচার গ্রুপের সাথে খানিকটা প্রতিযোগিতা করিয়াছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ঢাকার জন্মটমী ও কলিকাতার বড়দিনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত একমাত্র কলিকাতার মোহররম। দশ লক্ষ মুসলমানের এই উৎসব পঞ্চাশ লক্ষ বাশিন্দার কলিকাতা নগরীকে পায়ের বুড়া অংগুলে খাড়া রাখিত দশ-দশটা দিন।

তৎকালে বাংলার শহরে-বন্দরে পাড়াগাঁয়ে দশ দিন ধরিয়া ঢাক-চোল-সানাই ও কাড়া-নাকাড়া-দামামার গুরু-গস্তীর আওয়াজ আসমান

## আমাদের কালচার

ফাটাইয়া পাতাল কাঁপাইয়া ঘোষণা করিত : এই আসিমাছে মুসল-  
মানের উৎসব মোহররম ।

প্রতি গাঁ-মহল্লা হইতে এক বা একাধিক আখড়া বাহির হইত ।  
লাঠি-তলোয়ার, সড়কি-বল্লম ও ছুরি-রামদাও ইত্যাদি খেলার বুক-  
কাঁপানো সাংঘাতিক প্রতিযোগিতা করিত তারা । হাজার-হাজার লোক  
অবাক-বিষ্টময়ে দেখিত সে অস্ত্রের খেল ।

কাতল-মন্খিলের দিন যতই ঘনাইয়া আসিত খেলোয়াড় ও দর্শক-  
দের উত্তেজনা-উদ্দীপনা ততই বাড়িয়া যাইত । যেন 'দিকে দিকে  
চলে কুচকাওয়াজ' সত্য-সত্যই । এ যেন 'শহিদী সেনারা' সত্য-সত্যই  
সাজিয়াছে । যেন নিজ কানে শুনিতেছি : 'উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,  
নিম্নে উতলা ধরণী তল ।' কাজেই 'চল্‌রে চল্‌' না বলিয়া যেন উপায়  
নাই । খেলা-রত চলমান আখড়ার পিছনে পিছনে চলিত উদ্দীপিত  
জনতা ।

আখড়াগুলি ক্রমে জমায়েত হইত শহরে-বন্দরে । কাতলের দিনে  
সমবেত আখড়াসমূহের বাছাই-করা খেলোয়াড়দের মধ্যে হইত দ্বন্দ্ব-  
যুদ্ধ প্রতিযোগিতা । সে কি রোমাঞ্চকর লড়াই ! মুগ্ধ বিপুল জনতা  
দেখিত সে অস্ত্র চালনার উদ্ভাসাদি । দর্শকরা চাঁদা করিয়া শ্রেষ্ঠ খেলো-  
য়াড়দের দিত খেলাত-পুরস্কার ।

বড়দের এই প্রাণ-মাতানো সাহসিকতার খেলা দেখিয়া ছোট-ছোট  
ছেলেরাও কাঠের তলোয়ার, তালপাতার তাল ও টিনের ঢোল বানাইয়া  
এযিদ-ইমামের লড়াই করিত ।

আখড়ার লাঠিখেলা ছাড়াও আগের দিনে বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে  
পাড়াগাঁয়ে ঘোড়দৌড়, নৌকা-বাইচ, ডন-কুস্তি-কসরত ও হরেক রকম  
বীরত্বপূর্ণ খেলা হইত । পর্বোপলক্ষ্যেই সমবেতভাবে এইসব খেলা  
হইত বটে, কিন্তু এ সবে প্রস্তুতি চলিত প্রায় সারা বছরই ।

তাতে আমাদের মধ্যে একটা জংগী ঐতিহ্য ও সামরিক কালচারও  
গড়িয়া উঠিয়াছিল । এইসব অনুষ্ঠানে মুসলিম-বাংলার আকাশ-বাতাস

জীবন-প্রাচুর্যে মুখরিত হইয়া উঠিত। শুধু স্বদেশবাসী ভিন্ন সমাজের লোকেরাই নয়, বিদেশী আগন্তুক ও পরিব্রাজকেরাও বৃষিত মুসলিম-বাংলার গণ-জীবনে কৃষ্টিটির প্রাণ-প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং সেটা জীবন্ত। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজ আর তা নাই।

### চিত্র-শিল্পে

জাতির স্বপ্ন-কল্পনাকে যাঁরা তুলির পোঁছে মুতিমান বাস্তব করিয়া তুলেন, তাঁরা চিত্রকর। কৃষ্টিটির এই ক্ষেত্রে আমরা অতীত-ভুল। এই সেদিন যখন লুগ আবেদিনের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত পাক-বাংলার চিত্র-জগতে ছিল অমাবস্যার অন্ধকার। অসামান্য প্রতিভার অধিকারী হইয়াও যখন লুগ ও তাঁর শাগরিদরা যে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা ও উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন, চিত্র-বিদ্যা মুসলিম কালচারের বিরোধী— এই বাস্তব ধারণাই তার মূল কারণ।

চিত্র-বিদ্যার বিরুদ্ধে শরিয়তী কড়াকড়ি থাকার ফলে মুসলিম কৃষ্টিতে তা বিকশিত হইতে পারে নাই—এ ধারণা ভুল। বস্তুতঃ কোন ধর্মের সনাতনীরাই চিত্র-বিদ্যার পূর্ণ বিকাশকে সুন্দর দেখেন নাই। অন্যান্য সমাজের মতই মুসলিম সমাজেও চিত্র-শিল্পীরা সনাতনীদেলে ভক্তিভরে এড়াইয়া চলিয়াছিলেন এবং তাঁদের অমতেই নিজেদের সৃজনী-প্রতিভাকে তুলির রেখায় বাঁধিয়াছেন।

মুসলিম শাসকদের প্রায় সকলেই চিত্র-শিল্পের উৎসাহদাতা ছিলেন। তার নথির ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভর্তি। দামেশক-বাগদাদের খলিফা, স্পেনের সুলতান, পারস্যের শাহ এবং দিল্লীর সম্রাট ও বাংলার নবাবদের অনেকেই চিত্র-শিল্পের মুরব্বি ছিলেন। বাগদাদের খলিফা মতাওয়াল্লহ 'আলেফ লায়লা'কে সচিত্র করিয়াছিলেন। দিল্লীর বাদশাহ হুমায়ুন আমির হামযার বিজয় কাহিনীকে সচিত্র করিবার জন্য পঞ্চাশ জন চিত্র-শিল্পী নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁরা দুই হাজার চিত্রের এই কাহিনী সমাপ্ত করেন।

## আমাদের কালচার

বাংলার মুসলমান চিত্র-শিল্পীরা সতর-আঠার শতকেই লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, শাহনামা, আমির হামযা, জংগনামা, শহীদে-কারবালা, ইউসুফ-যোলোথা, সয়ফুল-মুলুক, সোনাতান ইত্যাদি অনেক পুঁথিকে সচিত্র করিয়াছিলেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমরা ছেলে-বেলায় এইসব পুস্তক সচিত্র দেখিয়াছি। আমাদের তৎকালীন মুরুব্বিরা সকল দিক হইতে ‘পাক্সা মুসলমান’ হইয়াও এইসব চিত্রিত কিতাব ঘরে রাখিতে ও পড়িতে আপত্তি করিতেন না। বিশ শতকের তৃতীয় দশকের ছাপাতেই এই সব ছবি প্রথম পরিত্যক্ত হয়, বোধ হয়, খেলা-ফত আন্দোলনের কালে, আলেম-ওলামাদের চাপে।

কাজেই চিত্র-শিল্পে পাক-বাংলার নিজস্ব কোনও ঐতিহ্য নাই, এ কথা বলা চলে না। যয়নুল আবেদিনের আবির্ভাব তাই যুগ-প্রবর্তন হইলেও আকস্মিক নয়। যয়নুলের প্রতিভা আমাদের ঐতিহ্যকে বিপুল সম্ভাবনার রাজপথে তুলিয়া দিয়াছে এতে কোন সন্দেহ নাই। পাকিস্তান হাসিলে শিল্প-সাহিত্যের যে একটিমাত্র ক্ষেত্র আমাদের সাং-স্কৃতিক রেনেসাঁ নিশ্চিতরূপে আশাজনক প্রমাণিত হইয়াছে, তা যয়নুলের নেতৃত্বে চিত্র-শিল্প। সাংস্কৃতিক স্রষ্টাদের মধ্যে যয়নুলই আজো এক-মাত্র শিল্পী যার দৃষ্টি আসমানে, কিন্তু পা জমিনে।

## সংগীত শিল্পে

আমাদের নিজস্ব কালচারকে যারা সংগীতে ব্যংকৃত করিতে পারিতেন, তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আজ হিন্দুস্থানে; আব্বাসুদ্দিন ও খসরু আজ পরলোকে। মোমতাজ-আলিমরা তরুণদের কাছে অবহেলিত—ঐ সংগে ভাটিয়ালি-মুর্শিদিও। তরুণরা রবীন্দ্র সংগীতের ছায়ানাটে আধুনিক গানের নিষ্কণ তুলিতেই মত্ত। এদের ধারণা পাক-বাংলার স্বকীয় কোন গীতি-ঐতিহ্য নাই।

এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত। আসলে পাক-বাংলার স্বকীয় গীতি-ঐতিহ্য গৌরবময়। পাক-ভারতের প্রায় হাজার বছরের মুসলিম গীতি-ঐতি-

হোরই এটা একটা মহিমময় অধ্যায়। পাক-ভারতের সে গীতি-ঐতিহ্য বিশ্ব-মুসলিম সভ্যতার আরব-পারস্য তুর্কী ঐতিহ্যেরই অবিচ্ছেদ্য অংগ।

### মুসলিম দুনিয়ায় সংগীত

আট শতক হইতে আঠার শতক পর্যন্ত একটানা একটি হাজার বছর আরব পারস্য ও ভারতের মুসলমানরা তদানীন্তন সভ্য-জগতে সংগীত শিল্পের নেতা, সংগীত-শাস্ত্রের শিক্ষক ও সংগীত-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা ছিলেন। এই যুগের মুসলিম মনীষীদের অনেকেই আজও সংগীতের ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন।

আরবের আল-কাতিব ও আল-কিন্দি, পারস্যের আলফারাবী ইবনেসিনা, আবুল ফয়েয ইসহাক, আবুল ফয়য ইম্পাহানী, সুফী সাধক ইমাম আল-গায্ফালী, স্পেনের আল-খজিল এবং ইবনে-কিরমান ও ভারতের আমির খসরু ও মিয়াঁ তানাসেনের নাম সংগীত-শিল্পের সাথে চিরদিন অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থাকিবে। এইসব মনীষী ও তাঁদের শাগরিদদের অনেকেই সংগীত, সুর, তাল, রাগ-রাগিনী ও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে বড়-বড় বই-পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে-সব বই আজও সংগীত-শাস্ত্রের অথরিটি বলিয়া স্বীকৃত।

### পাঠান আমলে সংগীত

বাংলায় আরবী সংগীতের চর্চা শুরু হয় সুলতান বগরা খাঁর আমল হইতে। তিনি ও তাঁর পুত্র শাহযাদা কায়কোবাদ সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কায়কোবাদ পরে দিল্লীর সম্রাট হইলে আমির খসরু তাঁর সভাকবি ও গায়ক হন। কায়কোবাদের পর সম্রাট আলাউদ্দীন খিজ্জী দিল্লীর সিংহাসন দখল করিলে আমির খসরু

## আমাদের কালচার

তঁারও সভাকবি ও গায়ক থাকেন। আমির খসরুর সংগীদের মধ্যে হাসান সনঘিরও নামযাদা উস্তাদ ছিলেন।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী, সেলিম চিশতী, নিয়ামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ সুফী-দরবেশগণও উস্তাদ সুর-শিল্পী ও সাধক গায়ক ছিলেন। নিয়ামুদ্দিন আউলিয়া ইবাদতের সময় সামা (গান) গাইতে গাইতে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তঁার সময়ে ও তঁার পরে সুফীরা সকলেই সামা (গান) গাইতেন। সেলিম চিশতী চিশতিয়া তরিকার গানের প্রবর্তক।

## মোগল আমলে সংগীত

পাঠান আমলের মতই মোগল আমলেও সংগীত-চর্চা শ্রীরুদ্দি লাভ করে। সম্রাট আকবরের দরবারে পঁয়ত্রিশ জন বিখ্যাত গায়ক ও বাদকের সমাবেশ হয়। তানসেনের নাম সবাই জানেন। তঁার যোগ্য সহযোগী আরও অনেক ছিলেন। মোগল সম্রাটদের সকলেই এমনকি সম্রাট আওরংগজেবও সংগীতের সমঝদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাঠান ও মোগল সম্রাটদের শাহী দরবারে নর্তকীদের নাচ ও গানের প্রচলন ছিল। সম্মানিত মেহমানদের অভ্যর্থনার জন্য নাচ-গানের বিশেষ ব্যবস্থা হইত।

সংগীতের হাজার হাজার রাগ-রাগিনীর ও শত শত বাদ্য-যন্ত্রের আরবী-ফারসী নামেই হাজার বছরের মুসলিম প্রভাব দেদীপ্যমান। সুস্পষ্ট আরবী-ফারসী নাম ছাড়াও আরও অনেকগুলি প্রচলিত নাম আরবী-ফারসীর অপভ্রংশ মাত্র। পাক-বাংলা ভারতের অধুনা-প্রচলিত রাগ-রাগিনীর অধিকাংশের আবিষ্কর্তা আমির খসরু। তঁার আবিষ্কৃত সুরে তঁারই রচিত গানসমূহ আজও মুখে-মুখে গীত হয়। ঐ-সব গান এখনও উর্দু-হিন্দী সংগীতের মূল্যবান সম্পদ বলিয়া সুধীসমাজে স্বীকৃত।

বাদশাহী আমলের পরেও ইংরাজ আমলের একশ' বছর ধরিয়া পাক-ভারতীয় সংগীতে মুসলিম নেতৃত্ব বজায় ছিল। হিন্দু সংগীত-

বিশারদ বিশ্ববিশ্রুত বিষ্ণুনারায়ণ ভারতখণ্ডে মুসলমানদের কাছে সংগীতের এই ঋণের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

### পাক-বাংলায় সংগীত-চর্চা

পাক-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম আমলের শেষ দিন পর্যন্ত সংগীতের কদর ও আদর ছিল অপরিমিত। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পুঁথি সাহিত্যে। অনেকগুলি পুঁথিতেই ঘটনা-বর্ণনার মধ্যে বিবরণের সাথে সংগতিপূর্ণ গান দেওয়া আছে। শিরোনামায় সুর ও তালের উল্লেখ আছে। এতে ধরিয়া লওয়া যায় শায়েররা নিজেরা গায়ক ছিলেন অথবা অন্ততঃ তাল ও রাগ-রাগিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। ষোল শতকের লেখা দৌলত উযির বাহরাম খাঁর 'লায়লি-মজনু', সতর শতকের লেখা আলাওলের 'রাগনামা' ও 'রাগ-মালা', সৈয়দ আয়েনুদ্দিনের 'তালনামা', দানেশ কাযীর 'সৃষ্টি পত্তন', আলি রাযার 'খ্যান-মালা', জীবন আলীর 'রাগ-তালের পুঁথি', ইত্যাদি পুস্তক তৎকালে বাংলায় মুসলমানদের সংগীত-চর্চার প্রমাণ। পরবর্তীকালে আলী মিল্লার 'রাগনামা' ও তাহের মোহাম্মদের 'তালনামা'য় রাগ-তালসহ অনেক শায়েরের গানের পদ দেওয়া আছে। শেখ চাঁদ, সৈয়দ আয়েন উদ্দিন, সৈয়দ মুর্তযা, নাসির উদ্দিন, ফৈয়াজ ও আলাওলের নাম তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সৈয়দ মুর্তযার 'তালনামা' নামে একটি গানের বইও আছে। এঁরা ছাড়া উনিশ শতকের প্রথম ভাগে 'চম্পা গায়ীর গানের বই' নামে একটি বই পাওয়া যায়। চম্পা গায়ী চাটগাঁর পটিয়া থানার লোক। গানের উস্তাদ ছিলেন তিনি।

### পতনের যুগ

এই আলোচনায় দেখা গেল, গান শরিয়ত-বিরোধী এই মূল্যবোধে মুসলমানদের মধ্যে সংগীত-চর্চা ছিল না, এটা ব্রাহ্ম ধারণা। বাংলাতেই



## আমাদের কালচার

ইহা সীমাবদ্ধ। আসলে মুসলিম শাসনামলে এবং তার পরেও অনেক দিন পাক-বাংলাতে সংগীত-চর্চা নবাব দরবারে সুখী-মজলিসে ও জন-সমাজে সমানভাবে কৃষ্টিতর সমাদৃত ও সম্মানিত অংগ ছিল। তবু যে পাক-বাংলায় এই ব্রাহ্ম ধারণা ও সত্য-সত্যই সংগীতের প্রতি একদা বিরূপ ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল, তার ঐতিহাসিক সংগত কারণ আছে।

ইংরাজ শাসকদের সর্বাঙ্গিক জুলুমবাধি ও বর্বর অত্যাচারের স্টিম রোলার বাংলার মুসলমানদের উপরই চলে সবচেয়ে বেশী। ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ গণ-বিপ্লবের আকার ধারণ করে পাক-বাংলাতেই। যালেম ইংরাজ শাসকদের যুলুম-নিপীড়ন যত বাড়ে, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যে অস্টারিটি ও কৃষ্ণস্বাধনার সংকল্প হয় তত দৃঢ়। ওহাবী মতবাদ একটা সংস্কারবাদ। এঁরা ছিলেন বিশুদ্ধচারী বা পিউরিট্যানিস্ট। ভোগ-বিলাসিতা এঁরা নিজেরা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছিলেন। জনগণকে দিয়াও করাইয়াছিলেন। আরাম-আয়াস ও ভোগ-বিলাসিতাই মুসলমানদের পতনের কারণ : এই সত্যকে নেতারা জেহাদী পরিবেশের দরুন মাত্রাতিরিক্তরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। এইরূপ কড়া-কড়ি ও বাড়াবাড়ির ফলে গোটা মুসলিম সমাজ হইয়া পড়ে পিউরিট্যানিস্ট। অন্যান্য আহমাদ-প্রমোদের জঞ্জালের সাথে সংগীত-শিক্ষণও বনবাস হয়।

কিন্তু মরে না। নিশ্বাস-প্রশ্বাস ও হাসি-কান্নার মত সংগীতও মানুষের স্বাভাবিক অপ্রতিরোধ্য রুত্তি। কোন কিছুতেই তা বন্ধ করা চলে না। সংগীতের বেলাও তা চলিল না। গৃহে ও উদ্র সমাজে বর্জিত হইয়া সংগীত তাই পথে-ঘাটে মাঠে-ময়দানে ও বনে-জঙ্গলে বাঁচিয়া থাকিল।

জাতীয় কৃষ্টিতর উপাচার হিসাবে সংগীতের মর্যাদার দিক দিয়া পাক-বাংলার ইতিহাসের গত এক শ' বছর একটা নিদারুণ অন্ধকার যুগ হইয়া গেল এইরূপে।

### আনন্দদায়ক অপরাধ

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ঐ অঙ্ককার যুগের আগে আমাদের গীতি-ঐতিহ্য গৌরবময় ছিল না। আর এটাও ঠিক নয় যে, ঐ অঙ্ককার যুগেও আমাদের মধ্যে সংগীতের প্রাণ ছিল না। প্রাণ ছিল নিশ্চয়ই। কারণ ওটা প্রকৃতির বিধানেই অমর। কিন্তু সে প্রাণ স্পন্দিত হইত সভ্য ও শহরিন্যা সফিস্টিকেটেড সমাজের মার্জিত পরিবেশের বাহিরে, পাড়াগাঁয়ের সরল অমার্জিত প্রাকৃতিক আবহাওয়ায়। সেখানে বাউল, ভাটিয়ালা, মারফতি, মুর্শিদি, জারিগান, সারিগান, কবিগান, বিচারগান ও ঘাটু ভাসান ইত্যাদি রুচি-কুরুচির ভালমন্দ অভিব্যঞ্জনার মধ্যে মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক ফুকার ধ্বনিত হইতে থাকে। আর এদিকে নবাব-জমিদাররা ঐ একই কারণে নটি-বাইজী লইয়া প্রমোদ-উদ্যান বা প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চের কক্ষে সংগীতের ক্ষুধা মিটাইতে থাকেন।

ফলে গত একশ' বছর আমাদের জাতীয় জীবনে সংগীত-শাস্ত্র বিন্দুমাত্র উন্নতি লাভ করে নাই—শিল্প হিসাবেও না, আমাদের কৃষ্টিতর উপাচার হিসাবেও না। সংগীতের মত একটা উচ্চশ্রেণীর মহান কৃষ্টিতক ললিতকলা আমাদের সমাজে একটা আনন্দদায়ক অপরাধরূপে বাঁচিয়া থাকে দীর্ঘ একশটা বছর।

### সুবাহ-সাদেক

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই এই অঙ্ককার যুগের অবসানের সুবাহ-সাদেক দেখা দেয়। এই সময়ে খিলাফত ও প্রজা-আন্দোলনের মাধ্যমে সংগীত এতদিনের ঘোমটা মেলিয়া মুসলিম জনসমাবেশে হাযির হয় গযল ধর্ম-সংগীত কৃষক-শ্রমিকের গান ও আযাদির গানরূপে। সেখানেও প্রথম-প্রথম হার্মোনিয়ামযোগে গযল গাওয়ায় আপত্তি উঠে।

## আমাদের কালচার

কিন্তু সব আপত্তি সূর্যোদয়ে কুয়াশা কাটার মতই দূর হইয়া যায় নযরুল ইসলাম গোলাম মোস্তফা জসিমুদ্দিন ও আব্বাসুদ্দিনের আবির্ভাবে ।

সংগীতের এই পাবলিক এগ্জিয়ারেন্স বাংলাদেশের কৃষ্টিতর ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । নবাব-জমিদারের দরবারে লাখনৌভী দিল্লীওয়ালার উস্তাদদের উচ্চাংগের সংগীতের জলসাতা বড় কথা নয় । বড় কথা সামাজিক কৃষ্টিতর অংশ হিসাবে গণ-জীবনে সংগীতের প্রতিষ্ঠা । এটাই ঘটে নযরুল-আব্বাসের আবির্ভাবে । নিতান্ত সংগীত-বিরোধী আলেমরাও এই সময়ে সংগীতের সমঝদার হইয়া উঠেন । একটা ঘটনার উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না ।

কলিকাতায় হক সাহেবের বাসায় মিল্লাদের মহফিল । আরবী-উর্দুতে মথারীতি মিল্লাদ পড়া হইয়া যাওয়ার পরে, কিন্তু মিঠাই-মতিচূর বস্টনের আগেই, হক সাহেব আব্বাসুদ্দিনকে গান গাহিতে বলিলেন । আব্বাসুদ্দিন পাশের কামরায় হার্মোনিয়াম লুকাইয়া অপেক্ষা করিতে-ছিলেন । হক সাহেবের ডাকে তিনি সেলামালেকুম বলিয়া দরবারে বসিলেন । তাঁর সংগী হার্মোনিয়ামটি আনিয়া আনগোছে তাঁর সামনে বসাইলেন । ‘তওবা-আসতাগফেয়ল্লা’ বলিতে বলিতে আলেমরা এবং তাঁদের দেখাদেখি আরও অনেকে মজলিস ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন । হক সাহেবের সানুনয় বিনীত অনুরোধে অবশেষে তাঁরা বারান্দায় বসিয়া মতিচূর-মিহিদানা গ্রহণ করিতে রাযী হইলেন । খাঞ্চা-খাঞ্চা মতিচূরের পুলিন্দা আসিতে লাগিল । আলেমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।

হঠাৎ কামরার ভিতর হইতে আব্বাসুদ্দিনের মিঠাই-দরায় গলা ভাসিয়া আসিল : ‘তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে ।’ অন্ধকণের মধ্যে আলেম সাহেবরা মিঠাই বিতরণের গণ্ডগোল বন্ধ করিতে বলিলেন । কান পাতিয়া আব্বাসুদ্দিনের গলা শুনিতে লাগিলেন । এক-এক করিয়া সবাই চুপে-চুপে কামরায় প্রবেশ করিলেন । মিঠাই বিতরণ বন্ধ থাকিল ।

গানশেষে হক সাহেব আলেম সাহেবদেরে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন : 'কেমন লাগল মৌলবী সাহেবেরা ? মিলাদ শরিফে এমন চোখের পানি ফেলিয়াছেন কোনদিন ?' হক সাহেবের গলা কাঁপিয়া উঠিল । সত্যই তাঁর চোখে পানি ছলছল করিতেছিল । আলেমদের চোখেও তাই ।

আশ্চর্য ? না, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই । আলেমরাও হাদয়বান মানুষ । আঙনের কাছে মোম যা, সংগীতের কাছে মন তাই । মহামনীষী বার্নার্ড শ' তাই বলিয়াছেন : 'গানে যাদের মন গলে না, তারা শূন্য ।' যে সমাজে গান-বাজনা নাই, সে সমাজ শুধু নিরানন্দ নয়, নিষ্ঠুরও । সে সমাজে সুকুমার-রুত্তি জাগ্রত ও বিকশিত হইতে পারে না ।

### নৃত্য-শিল্প

আমাদের কালচারকে নাচের মাধ্যমে মুঁতিমান করার অসাধারণ প্রতিভা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যে বুলবুল চৌধুরী, জাগ্রিত দুর্ভাগ্য-হেতু তাঁর অকালমৃত্যু ঘটিয়াছে । নয়রুল ইসলামের কবি জীবনের নিদারুণ অবসানে আমাদের কালচারের জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে, বুলবুলের অকাল-মৃত্যুতে আমাদের কালচারের ক্ষতির পরিমাণ তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় । পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কায়দে-মিল্লাত লিয়াকত আলী খান বুলবুলের নৃত্যানুষ্ঠান দেখিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন : 'বুলবুল, তুমি পাকিস্তানী কালচারের প্রাণ ।' কথাটার এক হরফও অতিশয়োক্তি ছিল না ।

গোটা পাকিস্তানের বিশেষতঃ পাক-বাংলার কালচারে বুলবুলের অবদানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে যে, বুলবুল নৃত্য-শিল্পকে মুসলিম সমাজে পাক্ষেয় করিয়া গিয়াছেন মুসলিম কালচারের অঙ্গ-রূপেই, শুধু পিওর আর্টরূপে নয় । ফাইন আর্ট যতই উচ্চাঙ্গের হউক, আর্ট-সাধক যতই বিশ্ববিখ্যাত হউন, জাতীয় কৃষ্টির সাথে

## আমাদের কালচার

ভাঁয় আর্টের নাড়ীর যোগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তিনি জাতীয় আর্টিস্ট হইবেন না, তাঁর আর্টও জাতীয় আর্ট হইবে না। বুলবুল তাঁর নৃত্য-শিল্প ও আমাদের জাতীয় কৃষ্টির মধ্যে অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইখানেই বুলবুলের মৌলিকতা। এখানেই তিনি যুগ-প্রবর্তক।

আমাদের জাতীয় কৃষ্টির পরিপূর্ণতার জন্য ছিল এটা অত্যাवশ্যক। গান ছাড়া যেমন মানুষের কথা বলা পূর্ণতা লাভ করে না, নাচ ছাড়া তেমনি মানুষের পথ চলা পূর্ণতা লাভ করে না। গান যেমন বলার তাল, নাচ তেমনি চলার তাল। তালই বিশ্ব-দুনিয়ার, অতএব মানুষের গোটা জীবনের, ওজন কানুন ও কাওয়ালেদ, নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংঘম, গ্রামার মেথড ও সিস্টেম। বেতাল হইলে ব্যক্তি-জীবন যেমন জাতির জীবনও তেমনি কল্পচ্যুত ও বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে।

তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষ মাটিতে পড়িয়াই, তারও আগে মায়ের পেটেই, তাল শিখিতে শুরু করে। বস্তুতঃ মানুষ হাত পা নাড়িতে শিখে কথা বলার আগে। অতএব আগে নাচ, পরে গান।

এই তালের সাধনা চলে মানুষের জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অবিস্রান্তভাবে। মানুষ তার সুখে-দুঃখে হাসিকান্নায় ক্রোধ-শান্তিতে প্রেম-ঘৃণায় খানা-পিনায় সর্ব অবস্থায় গান্নও যেমন নাচেও তেমনি।

কাজেই গানের মতই নাচও আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের, অতএব জাতীয় কৃষ্টির, অবিচ্ছেদ্য অংগ। এ দুই-এর সমশুল্য ঘটিয়াছিল আমাদের পল্লী-জীবনে জারিগানে ও সারিগানে।

## পাবলিক এন্টারটেনমেন্ট্,

জাতীয় কৃষ্টির অন্যতম প্রধান ও জনপ্রিয় বিকাশ পাবলিক এন্টারটেনমেন্ট বা আমোদ-প্রমোদ। নাটক সিনেমা ম্যাজিক সার্কাস গীতিনাট্য ইত্যাদি হরেক রকমে জাতির সৃষ্টিধর্মী প্রতিভা বিকশিত ও গণ-চিত্তের আনন্দ-ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। এ সবে এখন

আমাদের আছে কি? রোজ দুই-তিন বেলা লক্ষ-লক্ষ লোক যে সিনেমা দেখে তাতে আমাদের নিজস্ব কালচারের স্থান কতটুকু? ভাগ্যিস সরকার সম্প্রতি বিদেশী ছবির উপর নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ জারি করিয়াছেন।

এই নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের আগের অবস্থা কি ছিল, একবার চিন্তা করিয়া দেখুন ত। প্রতি ছবিঘরে হয় ইংরেজী নয় ত পশ্চিম বাংলার ছবি। ও সবেল স্রষ্টাও আমরা নই; অভিনেতা-অভিনেত্রীও আমরা না। আমাদের জীবনের আলেখ্য ও আদর্শের রূপায়ণও তাতে নাই। তবুও লক্ষ লক্ষ দর্শক ও-সব দেখিবার জন্যই হুড়াহুড়ি করে। কেন করে?

জনতার দোষ কি? তারা আনন্দের পিণ্ডাসী। তাদের এই আনন্দের সাধ মিটাইতে হইবেই। সে দায়িত্ব শিল্পীদের। শিল্পীরা তা করিবেন আমাদের নিজস্ব ভাষায় স্বকীয় কালচারের রূপায়ণে।

### রংগমঞ্চ

সিনেমা-জগতে বরঞ্চ সম্প্রতি কিছুটা উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু রংগমঞ্চে আমরা একদম অনুপস্থিত। খোদ রাজধানীর বুকেই একটিও রংগমঞ্চ নাই, অন্যান্য শহর ত দুইয়ের কথা। ভাল নাটকের বইও একরূপ নাই বলিলেই চলে। ফলে এখানে-ওখানে কালেভদ্রে আমাদের উৎসাহী তরুণরা যে দুই একখানা বই মঞ্চস্থ করে তাও পশ্চিম বাংলার নাট্যকারদের লেখা। আমাদের জীবন-আলেখ্য তাতে নাই। অনেকগুলিই আমাদের কালচার বিরোধী।

রংগমঞ্চেই জাতির কৃষ্টি-জীবন দানা বাঁধিয়া ধরা দেয়। জীবন্ত হয়। কাজেই মঞ্চের অভাব ঐ দানা বাঁধার কাজটাই পিছাইয়া দেয়। জীবন্ত হওয়া ত পরের কথা। হেলা-অবহেলায় জাতীয় জীবনের রসের উৎসই শুকাইয়া যায়।

## আমাদের কালচার

নিষ্ঠুর সত্য কথা এই যে, কাগমে-কলমে আমরা যতই বড়াই করি না কেন, জারিগান সারিগান ভাটিয়ালি ভাওলাইয়া বহু দিন আগে হইতেই আমাদের জাতীয় কৃষ্টির অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আব্বাসুদ্দিনের ও তাঁর শাগরিদদের গলায় শুধু রেকর্ডে বাঁচিয়া আছে মাত্র। তাও ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে, আমাদের কৃষ্টিচক্রে চেষ্টায় নয়। নাচ ত আর রেকর্ডে দেখান যায় না, তাই তা মৃত।

### শরমের কথা

কিসের জন্য জানি না, কার দোষে জানি না আমাদের সমাজ-জীবন হইতে নিঃশেষে বিসর্জন দেওয়া হইয়াছিল কালচারের সবচেয়ে সুকুমার সবচেয়ে মধুর সবচেয়ে স্নিগ্ধ সবচেয়ে সজীব সবচেয়ে প্রাণবন্ত প্রকাশ যে নাচ-গান তাকেই। আব্বাসুদ্দিন ও বুলবুলের অসামান্য প্রতিভাও তার সম্যক পুনরুদ্ধার ঘটাইতে পারে নাই। কে কবে পাক-বাংলার মুসলিম কৃষ্টি-জীবনে এই ভেঙালিষম চালাইয়াছিল, সে বিতর্কে সমস্ত নষ্ট না করিয়া অবিলম্বে তার পুনরুদ্ধারের কাজে লাগিয়া যাইতে হইবে। তা না করিলে বেশীদিন আমরা কৃষ্টিহীনতার লজ্জা চাকিয়া রাখিতে পারিব না। বাংলায় হিন্দু সাহিত্যিকদের কেউ কেউ ইতিমধ্যেই রসিকতা করিয়া বলিতে শুরু করিয়াছেন যে, বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে যে একটিমাত্র কালচার আছে, তার নাম এগ্রিকালচার।

একটি মাত্র সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমার কথাটা প্রমাণ করিব। সেদিন রুশ দেশের এবং কয়েক বছর আগে চীন দেশের কালচারেল মিশন পাকিস্তানে আসিয়াছিলেন। শিল্পীদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান। তাঁরা নিজেদের দেশের নিজস্ব কালচারের নাচ দেখাইয়াছেন। ঐ সংগে আমাদের কালচারের নাচ বলিয়া পাক-বাংলার ঝুমুর ও পশ্চিম পাকিস্তানের ষটক ও পাজাবী নাচ দেখাইয়া-ছিলেন। নিশ্চয়ই আমাদের আর্ট কাউন্সিলের পরামর্শেই তাঁরা তা

করিয়াছিলেন। খটক নাচ ও পাঞ্জাবী নাচ সত্য-সত্যই পাকিস্তানী কালচারের অবিচ্ছেদ্য অংগ। পাঠান ও পাঞ্জাবী মুসলমানরা তাদের বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে দল বাঁধিয়া ঐ সব নাচ নাচিয়া থাকে।

কিন্তু ঝুমুর নাচ? এটা কি পাক-বাংলার মুসলিম কালচারের অংগ? পাক-বাংলার সীমান্তের অবহেলিত অমুসলমানদের কালচারের ধ্বংসাবশেষকে আমাদের কালচার বলিয়া চালাইয়া বিদেশীদের ফাঁকি দিতে পারি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ফাঁকিতে কি আমরা নিজেরাই পড়িব না?

### ন্যাশনাল স্টেজ

সৌভাগ্যের বিষয়, গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঢাকার রেডিও কর্তৃপক্ষ পাক-বাংলার কৃষ্টি-উৎসবের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। তাতে তাঁরা আমাদের পল্লী-জীবনের নিজস্ব কালচারের হারান মানিক পুনরুদ্ধারের সাধু প্রচেষ্টা চালাইতেছেন।

তাঁদেরে ধন্যবাদ। এটা শুভ সূচনা। কিন্তু উৎসবটা বাষিক। স্বভাবতঃই এর ফল সাময়িক ও ক্ষণিক। সতত ক্রিয়াশীল নয়। সম্প্রতি টেলিভিশনও এ কাজ শুরু করিয়াছেন। কিন্তু তার ফলও সংকীর্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ।

অতএব, এ সাধু চেষ্টাকে সতত ক্রিয়াশীল রাখিয়া ও এর এলাকা প্রসারিত করিয়া এই উদ্যমকে জনপ্রিয় করিতে হইলে অবিলম্বে আমাদের ন্যাশনাল স্টেজ নির্মাণ করিতে হইবে।

কয়েক বছর আগে সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তৎকালীন গভর্ণর শেরে-বাংলা ফয়লুল হক একটি স্টেজ উদ্বোধন করিয়াছিলেন। আর কালবিলম্ব না করিয়া সেটা সমাপ্ত করা দরকার। এদিকে সরকার চিন্তানায়ক ও লেখক-সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে উদ্যোগী হইতে হইবে।



## মোবাইল স্টেজ

স্থায়ী স্টেজ ছাড়াও আমাদের কালচারের মিশনারিরাপে মোবাইল ও ওপেন-এয়ার স্টেজের প্রবর্তন করিতে হইবে। হিন্দুদের যাত্রা পার্টি শেষমন। এদের কৃষ্টিক মূল্য অপূরণীয়। মুসলমান বীর-বীরাংগনা, পীর-মুর্শিদ ও রাজা-বাদশাদের জীবনের শিক্ষামূলক ঘটনা অবলম্বনে সোজা ভাষায় সহজ আর্টের সবল চরিত্রের নাটক অভিনয় করিয়া বেড়ানোই হইবে এদের ব্যবসা। আনন্দ ও সংস্কৃতির তালাশে পয়সা খরচ করিয়া গ্রামবাসীর শহরে আসার বদলে আনন্দ ও সংস্কৃতি নিজে-রাই জনগণের দুয়ারে যাইবে এদের মাধ্যমে।

## গ্যাশনাল স্পোর্টস

কালচারের সবচেয়ে চঞ্চল ও জনপ্রিয় অংশ জাতির জীবনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস যে খেলা-ধুলা, তাতেও আমরা পরাজিত। আমাদের নিজস্ব খেলা-ধুলাকে আধুনিক করিবার চেষ্টা করি নাই বলিয়াই আমাদের এই দুর্দশা। বিদেশী ফুটবল, ক্রিকেট টেনিস, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলা আমাদের জাতীয় ক্রীড়ার স্থান দখল করিয়াছে।

বিদেশী বলিয়াই আমি এ সবার নিন্দা করিতেছি না। বর্জন করিবার পরামর্শও দিতেছি না। আমার আপত্তি অন্য কারণে ও অন্য দিকে। আমার বক্তব্য এই যে, ঐ-সব খেলা-ধুলা আমরা পরাধীনতার আমলে বিনা-বিচারে চোখ বুজিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের জন্য উপযোগী ও গ্রহণযোগ্য কি না তার বিচার করি নাই। কিন্তু এখন করা উচিত।

হকির বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলিবার নাই। কারণ এটা আমাদের ডাংগুলি খেলার উন্নত সংস্করণ। বিদেশী নয়। বিদেশী খেলাকে জাতীয় খেলা-ধুলার আকারে গ্রহণ করিবার সময় জনসাধারণের কথা ভাবিতে হইবে। খেলার খরচ ও মাঠের আয়তনের কথা অবশ্যই

বিবেচনা করিতে হইবে। এই বিচারে হকির সাথে ফুটবলও আমাদের জাতীয় খেলা হইতে পারে; হইয়াছেও তাই। কিন্তু ক্রিকেটের মত ব্যয়সাধ্য অভিজাত খেলা আমাদের দেশে চলিতে দিতেছি কেন? রাজভাণ্ডার-উজাড় করা খরচ ছাড়াও এই খেলা লক্ষ লক্ষ লোককে এক নাগাড়ে কয়েকদিন ধরিয়া সারাদিন নিষ্ক্রম্য করিয়া রাখে। এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছাড়া দুনিয়ার আর কোনও দেশ ও জাতি এটা গ্রহণ করে নাই। শুধু আমরাই পাক-ভারতের গতকালের গোলামরা এই ব্যয়বহুল ও সময়ের অপচয়কারী নকল ভদ্রতা বজায় রাখিতেছি। ইনডোর ও মেয়েদের খেলার জন্য ভলিবল, টেনিসকট, ব্যাডমিন্টন গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ সবে খরচ অল্প। ব্যায়ামও হয় খুব।

সর্বোপরি, আমাদের নিজস্ব খেলা-ধুলাকে আধুনিক রূপ দিয়া পুনর্জীবিত করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্পোর্টস ফেডারেশনের দায়িত্ব অসীম ও গুরুতর। তাঁরা ইতিমধ্যে হাডুডু-কবাডি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এটা আশার কথা। তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। এটাকে আধুনিক করিয়া প্রতি জেলায় এ খেলার ব্যাপক ও বিপুল জনপ্রিয়তা হাসিলের সংঘবদ্ধ চেষ্টা তাঁদেরই করিতে হইবে।

### শিল্পী-সাহিত্যিকের দায়িত্ব

কিন্তু গোটা জাতীয় কালচারের ইমারত সাহিত্য। অতএব সাহিত্যিকরা সে কালচারের আর্কিটেক্ট। উপরে বর্ণিত জাতীয় কৃষ্টির বিভিন্ন রূপকে যুগোপযোগী করিয়া পুনর্জীবিত করিতে হইলে সাধক চিন্তা-নায়ক সাহিত্যিকদেরই তা করিতে হইবে।

এই আসল কাজেই কিন্তু আমরা আজও আত্ম-অচেতন ও পরানুকায়ী রহিয়া গিয়াছি। চরম দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা যে পরানুকায়ী তা বুঝিতে পারিতেছি না। মনের এই গোলামিকে আমরা উদার প্রগতিশীলতা ও বিশ্বজনীনতা ধরিয়া নিয়া গর্ববোধ করিতেছি। এই মানসিক

দাসত্বের মোহ আমাদেরকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে। স্বকীয়তা ও গুণগ্রাহিতার, আত্ম-সম্মান ও গুণীর সম্মানের, উদারতা ও হীনমন্যতার পার্থক্য বুঝিতে ও তাদের সীমারেখা চিহ্নিত হইবে।

মানুষের আত্মমর্যাদাবোধই তার কালচারের প্রাণ। তার আত্ম-বিশ্বাসই ওর শক্তি। এই দুইটা যাদের নাই, কালচারের ব্যাপারে তারা পরগাছা মাত্র। কালচার-প্ৰীতি দেশাত্মবোধ ও বাপ-মা ভক্তির মতই ইমোশনের বস্তু, যুক্তিবাদ ও দর্শন বিজ্ঞানের ব্যাপার নয়। কিন্তু কালচার-প্ৰীতির এ ইমোশন সহজাত নয়, অর্জিত। বেহালার তারে আঘাত করিয়া যেমন সুর আনিতে হয়, তেমনি হৃদয়ের তারে আঘাত করিয়া এই ইমোশন আনিতে হয় কবি-সাহিত্যিকরাই সে সুর-শিল্পী।

নিজের মর্যাদা মানে যে পরের অমর্যাদা নয়, অপরের অমর্যাদা করিয়া কেউ যে মর্যাদাবান হয় না, পরকে অভদ্র বলা যে উদ্রলোকের স্বাসিয়ত নয়, পরকে তাচ্ছিল্য করার মানে যে আত্মবিশ্বাস নয়, জাতির অন্তরে এই সূক্ষ্ম শালীনতাবোধ সৃষ্টির দায়িত্বও কবি-সাহিত্যিকের। এটা তারাই পারে। আর কেউ না।

এই সুর-শিল্পীরা যদি নেশা খাইয়া আত্মভোলা হয়, তবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ চাবুক মারিয়া তাদের আত্মস্থ করে। সম্প্রতি পাক-ভারত যুদ্ধ আমাদের কৃষ্টি-জীবনে তাই করিয়াছে। আমরা শুধু নিজের কালচারই ভুলিয়া থাকি নাই, নিজের দেশকে পর্যন্ত ভুলিয়া ছিলাম। দেশের মাটি ও তার নদ-নদী, তার সবুজ মাঠ, পাখীর গান, মাতৃভূমির সন্তান ও তাদের মুখের বুলি, তাদের সুখ-দুঃখ ও আশা-আকাংখা আমাদের কবি-প্রাণে স্পন্দন জাগাইতে এবং লেখকের কলমে গতি যোগাইতে পারে নাই।

আমরা কলিকাতার কৃষ্টি পশ্চিম-বাংলার পরিবেশ ও শান্তি-নিকেতনের রচনাভঙ্গি নকল করিয়া সুখী ও বিদগ্ধ হইতেছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের জাতীয় কবি আখ্যা দিয়া রবীন্দ্র-সংগীতের সাগরে ডুব পাড়িতেছিলাম।

কাজেই আমাদের প্রকাশকরা পশ্চিম-বাংলার পুস্তক রিপ্রিন্ট করিমা, বিক্রেতারা তা বেচিমা এবং পাঠকরা তা গো-গ্রাসে গিলিমা পাক-বাংলাকে পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টিক উপনিবেশ, ভাষিক সীমান্ত প্রদেশ ও সাহিত্যিক বাজার করিমা রাখিমাছিলেন। আর আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা রাস্তার পাশে দাঁড়াইমা অসহায় দর্শকের মতই এই বেচা-কেনা দেখিতেছিলেন।

### যুগ-ভাংগা দামামা

এমন সময় যুদ্ধের দামামা বাজিমা উঠিল। আমাদের তম্মা-টুটিল। সরকার কয়েক শ্রেণীর রবিম্ভ-সংগীত বন্ধ ও পশ্চিম-বাংলার বই-পুস্তক ও ছায়াছবি নিষিদ্ধ করিলেন। তবেই আমাদের জ্ঞান হইল। আমাদের রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে গানে-কবিতায় ছায়াছবিতে দেশাত্ম-বোধ ও কৃষ্টিক স্বকীয়তা ঝংকৃত হইতে লাগিল।

দেশের জাগরণের পক্ষে এটা নবযুগ, কালচারের দিক হতে এটা সুবেহসাদেক, কিন্তু কবি-সাহিত্যিকদের জন্য এটা গৌরবের কথা নয়। এই গুণে আমরা সরকারী হস্তক্ষেপকে সাহিত্যিক রেজিমেন্টেশন বলিতে পারি না। যুদ্ধ-বিগ্রহের মত বিপর্যয় দরকার হয় জনগণের সমবেত চেতনা উদ্ধৃদ্ধ করিবার জন্য। কবি-সাহিত্যিকদের জন্য তার দরকার হইবে কেন? তাঁরা যে চিন্তা-নায়ক। দুরে দেখা যে তাঁদের পবিত্র দায়িত্ব। পশ্চিম-বাংলা যে আমাদের দেশ নয়, কলিকাতার কৃষ্টির সাহিত্য যে আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্য নয়, শান্তিনিকেতনী ভাষা যে আমার ভাষা নয়, এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে জনগণের সময় লাগিতে পারে, কিন্তু চিন্তানায়কদের লাগিবে কেন?

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি হইমাও পাক-বাংলার জাতীয় কবি নন? বাংলাদেশ ভাগ হওয়ার পর এটা রাষ্ট্রীয় সত্য হইমাছে নিশ্চয়ই। কিন্তু বিভাগ-পূর্ব বাংলাতেও এটা সাহিত্যিক সত্য ছিল। পাকিস্তান হওয়ার

তিন বছর আগে ১৯৪৪ সালে কলিকাতার বুকো দাঁড়াইয়া এক সভা-পতির ভাষণে আমি বলিয়াছিলাম : “বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয়া পূজায় ‘আনন্দময়ী মা’ এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ মোহররমের চাঁদ উঠেনি।”

### বিশ্ব-কবি বনাম জাতীয় কবি

এটা বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি অশ্রদ্ধা-অসম্মানের কথা নয়। সত্য কথা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও বাংলার জাতীয় কবি নন। বাংলার জাতীয় কবি নন তিনি এই সহজ কারণে যে বাংলায় কোনও ‘জাতি’ নাই। আছে শুধু হিন্দু-মুসলমান দুইটা সম্প্রদায়। তিনি বাংলার জাতীয় কৃষ্টির প্রতীক নন এই সহজ কারণে, যে এখানে কোনও জাতীয় কৃষ্টিই নাই। এখানে আছে দুইটা কৃষ্টি : একটা বাঙ্গালী হিন্দু-কৃষ্টি, অপরটি বাঙ্গালী মুসলিম-কৃষ্টি। সমগ্র বাংলায় মেজরিটি ছিল মুসলমান। মেজরিটি দেশবাসীর সাথে নাড়ীর যোগ না থাকিলে কেউ জাতীয় কবি হইতে পারেন না। বিশ্বের কাছে তিনি যত বড়ই হউন। এটা পশ্চিম-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞাও নয়। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-কবি হিসাবে আমাদের নমস্য। সর্ব অবস্থায় তা থাকিবেন। যুদ্ধেও থাকিবেন, শান্তিতেও থাকিবেন। এই খানেই সীমা-রেখার সূক্ষ্ম জ্ঞানের প্রয়োজন। ভারতের সংগে যুদ্ধ বাধিলেই রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতা নিষিদ্ধ হইবে এটাও যেমন দৃশ্যণীয় ; শান্তি হইলেই রবীন্দ্র-পূজা শুরু হইবে এটাও তেমনি দৃশ্যণীয়।

পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য উন্নত সাহিত্য হিসাবে নিশ্চই আমাদের অনুরণীয় ; কিন্তু তা আমাদের নিজের সাহিত্য নয়। অমন মোহ যদি থাকে তবে তা ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে আমাদিগকে অবিলম্বে আমাদের নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রিডিস্কভারি করিতে হইবে আমাদের নিজের দেশে। পাক-বাংলার গত সাত শ’বছরের

ইতিহাস আবার পড়িতে হইবে নতুন জাতির মন লইয়া। সে রিডিসকভারির রূপায়ণেই আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচিত হইবে নয়া যিদিগির বাণী বহন করিয়া। বাংগালী হিন্দুর রেনেসাঁ যুগের মত আমাদের মধ্যেও বাংগালী মুসলিম রেনেসাঁর বংকিম-রবীন্দ্র ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জন্ম হইতে হইবে।

রিভাইভ্যাল নয়, রেনেসাঁ।

তরুণরা ভুল বুঝিবেন না। এটা পিছন ডাক নয়। এটা সামনে চলার আহ্বান। রিভাইভ্যাল নয়, রেনেসাঁ। —এটা বাদশাহি আমলে বা খিলাফত যুগে ফিরিয়া যাওয়ার পরামর্শ নয়। ওটা হইবে অবাস্তব। লাশ্ত মরীচিকা। দুনিয়া আজ প্রগতি ও সাধনার পথে অনেক—অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছে। আমাদেরও সে প্রগতির নাগাল ধরিতে হইবে। তার শরিক হইতে হইবে। কাজেই গতি হইবে আমাদের অতিক্রমত। আমাদের কালচারকেও আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক হইতে হইবে। এটা ফিউডাল যুগ নয়, গণতন্ত্রের যুগ। আমাদের কালচারকেও তাই গণ-ভিত্তিক হইতে হইবে। এটা কৃষি-যুগ নয়, এটা শিল্প-যুগ। কাজেই জনগণও আজ আর শুধু কৃষক নয়, তারা মিল-মজুরও বটে। শিল্পও আর শুধু আর্বাঁন ইণ্ডাস্ট্রী নয়, রুরাল ইণ্ডাস্ট্রীও তার শক্তিশালী শরিক। কালচারের খারক যে পল্লীগ্রাম, তাও আর আগের পল্লী নাই। শহর ও পল্লীর ব্যবধান দ্রুত সংকীর্ণ হইতেছে। কালচার ও সিভিলিযেশনের মধ্যে তাই নতুন করিয়া সমঝোতা হইতেছে।

পাক-বাংলার কৃষ্টিক রেনেসাঁ হইবে এই পরিবেশে। সে কৃষ্টি-সাহিত্যের ইমারত গড়িয়া উঠিবে আধুনিক মাল-মসলাতেই। তার বুনিন্যাদ হইবে পাক-বাংলার মাটিতে। রূপ-রস-গন্ধে হইবে তা অপূর্ব। সে কৃষ্টি-সাহিত্য রূপে হইবে বাংগালী, রসে হইবে তা মুসলিম, আর গন্ধে হইবে তা বিশ্বজনীন।

২৪ শে মাঘ, ১৩৭২ সন

# সাহিত্যের প্রাণ, রূপ ও আংগিক





## সাহিত্যের সরহৃদ

সাহিত্যের দুই রূপ : বড় ও ছোট—বিশাল ও সংকীর্ণ । বিশাল রূপে ভাষায় প্রকাশিত মানব-মনের গোটাটাই সাহিত্য । এই হিসাবে বাজার-দরের রিপোর্ট, ওষুধের বিজ্ঞাপন, স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক, ভূগোল-ইতিহাস, বীজগণিত, পাটিগণিত, বিজ্ঞান-দর্শন, সংবাদপত্র, গল্প-কবিতা, নাটক, সংগীত, নভেল সবই সাহিত্য ।

আর, সংকীর্ণরূপে সাহিত্য একটি আর্ট । আর্টের মধ্যেও এটি সবচেয়ে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ আর্ট । অন্যান্য আর্ট সাহিত্যের মত বাঁধা-ধরা গণ্ডি ও নিয়ম-কানূনের অধীন নয় । চিত্র-ভাস্কর্য, গান-বাজনাও আর্ট । গল্প-কবিতা, নাটক-উপন্যাসও আর্ট । কিন্তু চিত্রাদি শ্রেণীর আর্ট গল্পাদি শ্রেণীর আর্টের মত আক্ষরিক ভাষায় প্রকাশ হয় না । তাদের নিজস্ব ভাষা আছে । ফলে চিত্র-ভাস্কর্য ও গান-বাজনার যে স্বাধীনতা আছে, গল্প-কবিতা ও নাটক উপন্যাসের সে স্বাধীনতা নাই ।

ধরুন, মাইকেল, এঞ্জেলোর সময়ে ও মোগল আমলে চিত্রের যে রূপ ও আংগিক ছিল, পিকাসো ও হফম্যানের আমলে তা থাকে নাই । ভারতবর্ষেই অল্পদিন আগেও চুগতাই ভবানী লাহার আমলে চিত্রকলার যে রূপ ও আংগিক ছিল, অবনীন্দ্র নাথ, যামিনী রায় ও যয়নুল আবে-দিনের আমলে তার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে । ভাস্কর্যেও তেমনি । গ্রীক-ইটালিতে ও অজস্তা-ইলোরার আমলের ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের যে রূপ ও আংগিক ছিল, বর্তমান যুগে তা নাই । ক্লাসিক্যাল মিউজিক আধুনিক সংগীতের বেলায়ও এমনি বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে ।

## পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতা

পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে । কালিদাস, বিদ্যাপতি, সাদী, ফেরদৌসী, হোমার,

ভার্জিল, মিলটন, শেক্সপিয়ারের আমলের সাহিত্য হইতে রবীন্দ্র, নজরুল, জয়েস, ইলিয়টের সাহিত্যের মধ্যে আমরা যে পরিবর্তন দেখি, সেটা চিত্র-ভাস্কর্যের মত অতটা বিপ্লবাত্মক নয়। তার মানে, সাহিত্যিকরা সাহিত্যের প্রাণে রূপ ও আংগিকে বিপ্লব আনিবার চেষ্টাই করেন নাই তা নয়। চেষ্টা তাঁরা করিয়াছেন খুবই।

আধুনিক কাব্য-বাদীরা বিশেষতঃ তাঁদের সিম্বলিস্ট্ ও ইমেজিস্ট্রা অতীতের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। এতটা করিয়াছেন যে, আমরা প্রবীণরা আধুনিকদের কবিতা বুঝি না। আমরা বুঝি না বলিয়াই ওদের কবিতা কাব্য হয় না, তা নয়। কাব্যের রূপ ও আংগিক সম্বন্ধে তরুণদের মত আমাদের মত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়াই তাঁদের কবিতা আমাদের কাছে অর্থহীন।

কাব্য অর্থে আমরা বুঝি বিবরণ, আর নবীনরা বুঝেন মূর্তি বা প্রতীক। তাঁদের মতে কাব্যের উদ্দেশ্য প্রতীক গড়া, বিবরণ দেওয়া নয়। গদ্য ও পদ্যের যে পার্থক্য আমরা করি, নবীনরা তা করেন না। তরুণরা বলেন ও পার্থক্য অর্থহীন ও অনাবশ্যক।

কাজেই সাহিত্যিকরা সাহিত্যকে অতীতের বাঁধন-মুক্ত করিবার চেষ্টা কম করেন নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত করিতে পারেন নাই। পারেন নাই এই জন্য যে, এটা সম্ভব নয়। চিত্রকর ও ভাস্করের অগ্র-গতি হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াই সম্ভবতঃ কবিরা এ কাজে হাত দেন। কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করের সাফল্যই কবিদের সাফল্যের গ্যারান্টি নয়।

### সাহিত্যের প্রকাশ হরকে

কারণ চিত্র-কলায় ও ভাস্কর্যে যা সম্ভব, কাব্যে-সাহিত্যে তা সম্ভব নয়। এমন কি, সংগীতে যা সম্ভব, সাহিত্যে তাও সম্ভব নয়। সাহিত্যের প্রকাশ-বিকাশ হরফের ভাষায়। চিত্র-ভাস্কর্য-সংগীতের

## সাহিত্যের প্রাণ

প্রকাশ হরফের ভাষায় নয়। হরফের ভাষা মানে ভাষার হরফ। আপনি আধুনিক কবিতাই লেখেন, আর প্রাচীন মহাকাব্যই লেখেন, অমিত্রাক্ষরই লেখেন আর পয়ার সনেটই লেখেন, লিখিতে হইবে আপনাকে হরফের মাধ্যমেই এবং হরফে-গঠিত শব্দের মিছিলেই। অ আ ক খ-র উচ্চারণ, তাদের সমন্বয়ে গঠিত শব্দ : মানুষ-গরু নদী-পর্বত ও চন্দ্র-সূর্যের অর্থ, চণ্ডীদাস-রবীন্দ্রনাথ, কায়কোবাদ, নয়রুল ইসলামের আমলে যা ছিল, আধুনিক সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, আহসান হাবিব ও ফররুখ আহমদের আমলেও তিক তাই আছে। এটাই কাব্য-লেখকদের স্বাধীনতার সীমারেখা। যা কিছু করা, এর মধ্যেই করিতে হইবে। চিত্র-ভাস্কর্যের স্বাধীনতা কিন্তু সীমাহীন।

সংগীতেরও তাই। লেখায় আপনি পাখের কলম ফেলিয়া ফাউন্টেন পেন ধরিতে পারেন, কিন্তু কলম ফেলিয়া কোদাল ধরিতে পারেন না। চিত্রকর কিন্তু সূচ্যগ্র তুলি ফেলিয়া ব্রাশ ধরিতে পারেন। সে ব্রাশ রাজ-যোগালিয়ার ব্রাশের মত মোটা হইতেও পারে। ভাস্করও তেমনি নরুন ফেলিয়া কুড়াল ধরিতে পারেন। গায়কও তেমনি লাঠি দিয়া শরোদ বাজাইতে পারেন।

## সাহিত্যে পিকাসো-বিপ্লব অসম্ভব

কাজেই চিত্রকর-ভাস্করের অনুকরণে যিনি কাব্যেও পিকাসো-বিপ্লব আনিতে চাহিবেন, তিনি ব্যর্থ হইতে বাধ্য। যদি কেউ সফল হনও এবং কিছু-একটা সৃষ্টি করেনও, তবে সেটা অন্য কোনও ভাল জিনিস হইবে, কিন্তু কাব্য হইবে না।

তাই বলিয়া আমি এ কথা বলিতেছি না যে, আর্ট রূপী সাহিত্যের গল্প-কবিতা-নাটক-নভেল ছাড়া অন্য কোনও রূপ হইতে পারে না। বরঞ্চ আমি মনে করি, সাহিত্যের আরও অনেক রূপ হইতে পারে এবং হওয়া উচিতও। আমার বক্তব্য শুধু এই যে, কবিরা চান আর না চান, তাঁদের পায়ে ভাষার অর্থাৎ হরফ ও শব্দের বেড়ি থাকিবেই।

হরফ ও শব্দ বেড়ি এই জন্য যে, কবি-গল্পীদের ব্যবহৃত শব্দগুলি রাস্তার লোকেও ব্যবহার করে এবং একই অর্থে ব্যবহার করে। রাস্তার লোক আর্টের বিশ্লেষণ জানে না। কিন্তু আর্টের তারা সমঝদার। শুধু সমঝদার নয়, তারা ভাষার ব্রহ্মাণ্ড। মাঠে-ঘাটে হাটে-বাজারে নদী-বন্দরে প্রতিদিন তারা নিত্য নতুন শব্দ তৈয়ার করিতেছে। সাহিত্য সেইসব শব্দ গ্রহণ করিয়া নিজের অংগের শোভা বাড়াইতেছে।

সাহিত্যের পরে আসে অভিধান। অভিধানও সে-সব শব্দকে নিজের কোলে স্থান দেয়। প্রাচীন প্রকৃতিবাদ অভিধান ও আধুনিক চলন্তিকাই তার প্রমাণ। চলন্তিকাও যে সর্বাধুনিক নয়, তার প্রমাণ আমাদের বাংলা একাডেমী একটি সর্বাধুনিক অভিধান রচনায় হাত দেওয়া আবশ্যিক বোধ করিয়াছেন। এটাই স্বাভাবিক। জীবন্ত ভাষার গ্রোথ আছে, ওটা স্থানু জিনিস নয়। ওর শব্দ-সম্পদও প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শোনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী ভাষায় পঁচিশ হাজার নতুন শব্দ ঢুকিয়াছে। ঢুকিবেই ত। এটাই ত ইংরাজী ভাষার জীবনের লক্ষণ।

এর দ্বারা আমি এটাই দেখাইতে চাই যে, ভাষা জনগণের দ্বারা প্রভাবিত, সাহিত্য ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। এর ফলে চিত্র-ভাস্কর্য যে শরাফতি দাবি করিতে পারে, সাহিত্য তা পারে না। মানে, চিত্র ও ভাস্কর্য আইভরি টাওয়ানে বাস করিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তা পারে না। এটাই সাহিত্যের এলাকার চৌহদ্দি।

### স্থান ও কালের প্রভাব

এই চৌহদ্দি স্থান ও কালের দ্বারা নির্ধারিত প্রসারিত ও সংকুচিত হয়। স্থান ও কালের একটাও বাদ দেওয়া চলে না। দিলে সাহিত্য ব্যর্থ হয়। আমি যে স্থানে বাস করি, আমার পরদাদাও সেই স্থানেই বাস করিতেন। শুধু এই কারণে তাঁর সাহিত্য আমার সাহিত্য হইতে

## সাহিত্যের প্রাণ

পারে না। কারণ পরদাদা যে যুগে বাস করিতেন, আমি সে যুগে বাস করি না।

ঠিক তেমনি, আমি যে যুগে বাস করি, ইংলণ্ড, আমেরিকা, রুশ জাপানের লোকেরাও সেই যুগে বাস করে। শুধু এই কারণে তাদের সাহিত্য আমার সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ তারা যে স্থানে বাস করে, আমি সে স্থানে বাস করি না। যাদের সাথে আমার স্থান ও কাল দুইটাতেই মিল আছে, শুধু তাদের সাহিত্যই আমার সাহিত্য হইতে পারে।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, সাহিত্যের এই স্থানিক ও কালিক রূপ বিশ্ব-সাহিত্যের ফাণ্ডামেন্টালের বিরোধী নয়। ব্যক্তিত্ব বা পার্সনালিটি যেমন সার্বজনীনতা বা ইউনিভার্সেলিটির বিরোধী নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। বরঞ্চ ব্যক্তিত্ববিহীন মানুষের যেমন সার্বজনীনতা থাকিতে পারে না, স্বকীয়তাবিহীন সাহিত্যেরও তেমনি কোনও বিশ্বরূপ থাকা সম্ভব নয়।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আর্ট ক্রিয়েটিভ আর্ট হইতে পারে, তবেই যদি তা বাস্তব হয়। বাস্তব মানে ফটোগ্রাফ না। ফটোগ্রাফ না হইয়াও আর্ট বাস্তব হইতে পারে, যদি তার কন্টেন্ট ও ফর্ম একাঙ্ক হয়। একদিকে যেমন কুরাপা নীতি-বাক্যের দলা আর্ট নয়, অপরদিকে তেমন সারহীন রূপসী মাকালও আর্ট নয়। বাহির ও অন্তরের রসোত্তীর্ণ সমন্বয়ের নামই আর্ট। তাই ক্রিয়েটিভ আর্টের ফর্ম ও কন্টেন্ট অবিভাজ্য। এই কারণেই জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠতাই আর্টের প্রাণ। প্রাণবন্ত হইবার জন্য এই কারণেই সাহিত্যের স্থানকে ঘনিষ্ঠ আরও ঘনিষ্ঠ হইতে হয়। দেশ ও সমাজ হইয়া তাকে ব্যক্তিতে আশ্রয় নিতে হয়। সত্যিকার সাহিত্যের বিচারে ব্যক্তি ছাড়া সমাজ ও দেশ নাই। ঠিক তেমনি, সেই কারণে সাহিত্যের কাল যুগ-বছর মাস হইয়া এখনে 'নাউনেসে' রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরে সাহিত্য তার বিশ্বজনীনতা হারায় না।

পঞ্চাশতের সাহিত্যের এই ঘনিষ্ঠ রূপান্তর না ঘটিলে গণ-জীবনে সে পুরাপুরি ঘনিষ্ঠ হয় না। তাতে আর্টরূপী সাহিত্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। গণ-জীবন-নিরপেক্ষ পিওর আর্ট আইভরি টাওয়ারে বাস করিতে পারে। মিউসিয়ামের আর্ট ও আর্ট, বর্তমানের আর্ট ও আর্ট। বেশ-কম শুধু এই যে, একটা মৃত, আরেকটা জীবন্ত।

### ব্যক্তির প্রভাব

সাহিত্যকে কাল ও স্থানের প্রভাবে আসিতে হয় আরেক কারণে। সাহিত্য আসলে ফিলিং ( অনুভূতি ), ইমোশন ( ভাবাবেগ ) ও ইমাজিনেশনের ( কল্পনার ) রূপায়ণ। এই ফিলিং ইমোশন ও ইমাজিনেশন গোড়াতে নিশ্চয়ই ব্যক্তির। ব্যক্তি স্থান ও কালের একটি ইউনিট।

সত্য বটে, সাহিত্যে রূপায়িত এইসব বৃত্তি যত বেশী লোকের বৃত্তি হইবে, সাহিত্য হইবে তত বেশী জাতীয় এবং তত বেশী হইবে তার সার্বজনীন হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু গোড়াতে এ-সব বৃত্তিকে ব্যক্তির বৃত্তি হইতেই হইবে। যত বড় বিশ্ববাণীই প্রচারিত হউক না কেন, সেটা হইবে ব্যক্তির মুখ দিয়া এবং সে ব্যক্তি কথা বলিবে একটি জায়গায় দাঁড়াইয়া একটি সময়ে।

এই ব্যক্তিটি লেখক, জায়গাটি তার দেশ, সময়টি তার বর্তমান। ব্যক্তি স্থান ও কালের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রূপায়িত হয় ভাষায়। লেখক যে বাণীটি প্রচার করিবে সেটি হওয়া চাই তার অন্তরের কথা। শ্রোতাদের সেটি বুঝা চাই। তাদেরও হওয়া চাই সেটি অন্তরের কথা। কাজেই লেখক যে ভাষায় লিখিবে সেটি হওয়া চাই তার দেশের ভাষা।

বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক সমারসেট মম কিছুদিন আগে এশিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন। ভ্রমণ শেষ করিয়া ইংলণ্ডে ফিরার পথে এক বিরতিতে তিনি বলিয়াছেন : ‘পরম পরিতাপের বিষয়, এশিয়ার সাহিত্যিকরা তাঁদের মাতৃভাষায় সাহিত্য সাধনা না করিয়া বিদেশী

## সাহিত্যের প্রাণ

ইরেজী ভাষায় করিতেছেন। এতে তাঁদের মনীষা সম্যক পরিস্ফুট হওয়ার সুযোগ পাইতেছে না।’ মিঃ মম এই কথাটা বলিয়াছেন কতিপয় এশীয় সাহিত্যিকের মনোভাবের প্রতিবাদে। এঁরা মিঃ মমকে বলিয়াছিলেন, তাঁদের মাতৃভাষা উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির যোগ্য নয়। মিঃ মমের মতে তাঁদের ধারণা ভ্রান্ত। সাহিত্যের উন্নতিতেই ভাষার উন্নতি, ভাষার উন্নতিতে সাহিত্যের উন্নতি নয়।

### সাহিত্যই ভাষার আভিজাত্য

কথাটা অতীব সত্য। ভাষা সাহিত্যকে আভিজাত্য দেয়। বাংলা-ভাষা আভিজাত ছিল বলিয়া রবীন্দ্রনাথ এ ভাষায় লেখেন নাই, রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন বলিয়া বাংলা আভিজাত ভাষা হইয়াছে।

ভাষা সম্বন্ধে যা সত্য, শব্দ সম্বন্ধেও সেই কথা। কারণ ভাষা মানাই শব্দ। ভদ্র সাহিত্যে স্থান পাওয়ার আগে ভাষা থাকে অভদ্র ভাষা। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর তার চামড় ঘুচে, সে হয় ভদ্র। ঠিক তেমনি, শব্দের বেলায়ও তাই ঘটে। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার আগে পর্যন্ত শব্দ থাকে অভদ্র অশালীন ভালগার স্ল্যাং। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার পর হয় ওটা ভদ্র শালীন ইডিয়ম।

সাহিত্যের পক্ষে এটা বড়লোকী কৃপা-করণা নয়। এটা পারস্প-রিক। জনগণের মুখের ভাষাকে স্থান দেওয়ার আগে পর্যন্ত সাহিত্য থাকে আইভরি টাওয়ারের সাহিত্য। সে ভাষাকে নিজের বুক স্থান দিয়া সাহিত্য জাতির বুকে নামিয়া আসে। তখন হয় সে জনগণের সাহিত্য। আভিজাত্য ও কৃষ্টি-সভ্যতার অজুহাতে জনগণের জীবন বাদ দিয়া সাহিত্য হইতে পারে না যে কারণে, অশালীনতা ও ভালগারি-টির অভিযোগে জনগণের মুখের ভাষাকে সাহিত্য হইতে বাদ দেওয়া যায় না ঠিক সেই কারণে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখিলাম, সাহিত্যের প্রাণ তার রূপ তার আংগিক সব কয়টি নিহিত আছে জনগণের জীবনে। জনগণের

জীবন-ক্ষুধা সাহিত্যের প্রাণ, জনগণের জীবন-চিত্র সাহিত্যের রূপ, জনগণের ভাষা সাহিত্যের আংগিক। এই তিনটি পাল্লার ওজনে যে সাহিত্য টিকিল না, সে সাহিত্য গণ-সাহিত্য বা জাতীয় সাহিত্য হইতে পারিল না।

এইবার আসুন, আমাদের সাহিত্যকে এই তিনটি দাড়িপাল্লায় ওজন করি। আমাদের দেশ বাংলা দেশ একথা আজ যথেষ্ট নয়। বাংলার গণ-জীবনই আমাদের গণ-জীবন, একথাও যথেষ্ট নয়। এর পরেও বলিবার কথা বাকী থাকিয়া যায়। সে কথাটা এই যে, বাংলা ভাগ হইয়া আজ দুইটা স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইয়াছে। দেখা যাক, তাতে কি হইয়াছে।

### জনগণের জীবন-ক্ষুধা

দুনিয়ার জনগণের জীবন-ক্ষুধার একটা আন্তর্জাতিক রূপ আছে। কারণ 'দুনিয়ার সব মানুষ এক উশ্মতের অন্তর্ভুক্ত'। এই আন্তর্জাতিক রূপ একদিকে যেমন ইউটোপিয়া নয়, অপরদিকে সেটা আশু বাস্তব-ধর্মীও নয়। তাই সেটা আজো স্বাপ্নিক সাহিত্যিকের ইমাজিনেশনের বস্তু।

জনগণের ঐ জীবন-ক্ষুধার আন্তর্জাতিক হরাইযানের মধ্যে যে ক্ষুধার রূপটি বর্তমানে সুস্পষ্ট, সেটি তার আঞ্চলিক রূপ। এই আঞ্চলিক জীবন-ক্ষুধার সাধনা ও সিদ্ধি আঞ্চলিক সমাজ-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রিক কাঠামোর সাথে অংগাংগীভাবে জড়িত।

বাংলা ভাগ হইয়া আজ দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র ও পরস্পর-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। ফলে পূর্ব-ও পশ্চিম-বাংলার জনগণের জীবনে আগে যে ঐক্য ছিল সেটা আজ আর জাতীয় ঐক্য নাই, সেটা রূপান্তরিত হইয়াছে আন্তর্জাতিক ঐক্যে।

দুই বাংলার গণ-জীবন আজ দুইটি ভিন্ন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উভয়ের জীবন-ধারা তাতে দুইটি ভিন্ন নদীর



খাতে প্রবাহিত হইতেছে। সাধনা ও সিদ্ধির পথও পৃথক হইয়া গিয়াছে।

এই ভাবে আমাদের সাহিত্যের বিবেচ্য জাতীয় ও গণ-জীবনের দিক হইতে বাংলা আজ একটি দেশ নয়, দুইটা পৃথক দেশ। বাশিন্দা-রাও দুইটা জাতি।

### জনগণের জীবনালেখ্য

জনগণের জীবন-ক্ষুধা সম্বন্ধে যা সত্য, তাদের জীবন-চিত্র সম্বন্ধে সেটা আরও বেশী সত্য। জীবন-চিত্রে পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলা পৃথক ও ভিন্ন ছিল আগে হইতেই। কিন্তু তখন সেটা ছিল রাষ্ট্রের অস্বীকৃত আঞ্চলিক পার্থক্য। দেশ ভাগ হওয়ার পর সে পার্থক্য স্পষ্টতর তীব্র-তর ও স্টিমলাইনড হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দুই দেশের জনগণের জীবন-চিত্রকে আজ আন্তর্জাতিক পার্থক্যের রূপে দেদীপ্যমান করিয়া তুলিয়াছে।

সুতরাং আমাদের সাহিত্যিকগণকে জনগণের জীবন-ক্ষুধা ও জীবনালেখ্যের তালাশে অবিভক্ত বাংলার পতিত ময়দানে হাতড়াইয়া বেড়াইলে চলিবে না। পূর্ব-বাংলার সীমাবদ্ধ পরিবেশের চৌহদ্দির মধ্যেই এই বাণী ও রূপের সন্ধান করিতে হইবে।

এই সিদ্ধিতে সময় লাগিবে। সাহিত্যের বাণী ও রূপ গ্রোথের ব্যাপার, কনস্ট্রাকশনের ব্যাপার নয়। ওটা একদিনেও হইবে না। সে গ্রোথের স্পিড হইবে আমাদের চিন্তা-নায়ক সাহিত্যিকদের মনের বিস্তার ও দৃষ্টির প্রসারের স্পিডের অনুপাতে।

সময় লাগিবে বলিয়া এ কাজ শুরুই করিব না, সেটা ঠিক নয়। বরঞ্চ ঐ কারণেই তাড়াতাড়ি এখনই শুরু করা দরকার। সময় লাগা সম্বন্ধে সচেতন থাকিল লাভ এই যে তাতে আশু সাফল্যের জন্য ব্যস্তও হইব না, অসাফল্যের দরুন নিরাশ ক্লান্তও হইব না।

### জনগণের মুখের ভাষা

সাহিত্যের প্রাণ ও রূপের ব্যাপারটা যত জটিল, আংগিকের ব্যাপারটা তত জটিল নয়। এর গুরুত্ব উপলব্ধি মূল্য নির্ধারণ ও আকৃতি নিরূপণ কোনটাই কঠিন নয়। সমাধানও দুরূহ নয়।

এ কাজে আমাদের সামনে ইতিহাসের নথির আছে। সে নথির আধুনিক। সাফল্যে উজ্জ্বল। তার সাধনা ও সাফল্য আমাদের প্রেরণা যোগাইবার যোগ্য। এই নথির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কথাটাই এখন বিচার করিব।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে শেষদিন পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পণ্ডিতী বাংলা, সংস্কৃত বাংলা, বিদ্যাসাগরী বাংলা। বিশ শতকের গোড়া হইতেই এতে একটা বাংলাত্ব, একটা নিজস্বতা, একটা গণমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। এর কারণও ছিল। এই সময় ইউরোপ ও আমেরিকায় এই প্রবণতা শুরু হয়। আমেরিকা ফ্রান্স ও রুশিয়ায় এই গণমুখিতা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়। টেকচাঁদ ঠাকুর বংকিমচন্দ্র দ্বিজেন ঠাকুর রবি ঠাকুর ও বীরবল সবাই আন্তর্জাতিক বিপ্লবে প্রভাবিত হন। রবীন্দ্রনাথের শক্তিশালী কলমের মুখে বাংলার জনগণের মুখের 'অসাধু' ভাষা সাধুতার সম্মান অর্জন করে। এই বিবর্তনের কথা আমি একটু পরে বলিতেছি। এখানে আমি এই আন্তর্জাতিক বিপ্লবে আমেরিকার ভূমিকার কথাটাই শুধু আলোচনা করিব। তার কারণ আছে।

### মার্কিন নথির

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই সাহিত্যিক বিপ্লবের নেতৃত্ব পায় ঘটনাচক্রে। মার্কিনীদের জন্য এটা শুধু সাহিত্যিক বিবর্তনের প্রস্ন ছিল না। এটা ছিল তাদের জাতীয় জীবন-মরণের প্রস্ন।

আঠার শতকের শেষদিকে মার্কিনীরা মাতৃভূমি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া নিজেদের স্বাধীনতা হাসিল করিয়াছিল। তাদের এই

স্বাধীনতার একশ' বছর চলিয়া গিয়াছে তখন। 'রাজার স্বর্গীয় অধিকারের' বন্ধন-মুক্ত হইয়া কাগজে-কলমে তারা প্রজাতন্ত্র কাম্যে ম করিয়াছে। ইংরাজের শ্রেণী-প্রথাকে ঘৃণ্য বর্ণাশ্রম বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে তারা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার আশায়। ওয়াশিংটন-লিংকনের মত গণতন্ত্রের সমর্থক বড় বড় মনীষী তাদের রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং করিতেছেন।

তবু তারা সুখ-শান্তির মুখ দেখিতেছে না। গৃহযুদ্ধে ও নিগ্রোযুদ্ধে মার্কিন মুস্লুক ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত। ইংরাজরা তাদের দুর্দশা দেখিয়া বিজের মত মাথা ঝুঁকাইতেছে। বলিতেছে : বুঝ স্বাধীনতার ঠেলা এইবার। ডাঃ জনসন মার্কিনীদের 'কয়েদীর জাত' বলিয়া গাল দিতেছেন। লর্ড মেকলে মার্কিনীদের নিশ্চিত ব্যর্থতার ভবিষ্যৎ বাণী করিতেছেন। শক্ররা হাসিতেছে। বন্ধুরা আফসোস করিতেছে।

### ইমার্সনের পথনির্দেশ

কেন এমন হইতেছে? কেউ বলিতে পারে না কেউ বুঝিতে পারে না। উনিশ শতকের মাঝামাঝি পথের সন্ধান দিলেন ইমার্সন। তিনি রোগের নিদান বাহির করিলেন।

রাজার বন্ধন হইতে মুক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিসর্জন বড় কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু নিগেতিভ বড় কথা। পযিটিভ কিছু নয়। পযিটিভ কি? স্বকীয়তা। পঞ্চাশ বছরেও মার্কিনীরা স্বকীয়তার ও জাতীয় সত্তার সন্ধান পায় নাই। ইমার্সন এটা বুঝিলেন। তিনি জাতীয় সত্তা ও স্বকীয়তার দিকে মার্কিনীদের উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। তিনি অবিশ্রান্ত কলম চালাইয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বক্তৃতা করিয়া মার্কিনবাসীকে যা শুনাইলেন তার মূলকথা একটি : 'স্বকীয়তা ধর। অনুকরণ ছাড়। অনুকরণ আত্মহত্যার শামিল। স্বকীয়তাতেই মুক্তি'।

ইমার্সনের এই সাবধান-বাণীর গুরুত্ব বুঝিতে মাকিনবাসীর পঞ্চাশ বছর লাগিয়াছে। বিশ শতকের গোড়াতেই তারা সর্বপ্রথম বুঝিতে পারে ইংরাজের কবল হইতে তারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হাসিল করিয়াছে সত্য, কিন্তু কৃষ্টি-সাহিত্যে তারা আজো ইংলণ্ডের অনুকারী-অনুসারী ছায়া মাত্র।

মাকিনীদের ধর্ম ইংলণ্ডের খৃষ্টান ধর্ম। তাদের কৃষ্টি-ঐতিহ্যও ইংরেজী। কাজেই কি ভাষায় কি ধর্মে কি কৃষ্টিতে কি ঐতিহ্যে কোনও দিক দিয়াই মাকিনীদের ইংরাজ হইতে স্বতন্ত্র সত্তার কোনও যুক্তি ছিল না। দৃশ্যতঃ কোন আবশ্যকতাও ছিল না।

মাকিন মুন্সুক ছাড়াও আরও অনেক দূর দেশে ইংরাজ জাতি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। বাড়ির পাশে ঐ কানাডীরাও ত তাই। তারা কিন্তু ইংলণ্ডের রাজার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে নাই। মাকিনীরা করিল কেন? নাহক করিয়াছে। নাহক বলিয়াই তাদের এই স্বাধীনতা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।

ইমার্সন দেখাইলেন, মাকিনীদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র সত্তার রক্ষা তার বিকাশ ও তার প্রসারের জন্যই তাদের কৃষ্টিক স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। ইংরাজের অনুকরণ বর্জন করিতে হইবে। ইমার্সনের ভাষায় : 'মাথায় না দাঁড়াইয়া পায়ে দাঁড়াইতে হইবে'।

এটাই আরম্ভ হয় বিশ শতকের গোড়ায়। জারট্রুড স্টেইন এম্বরা পাউণ্ড টি. এস. ইলিয়ট মাকিনীদের এই কৃষ্টিক স্বকীয়তায় উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁরা বলেন, ইংরাজের কৃষ্টির বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতে হইলে মাকিনবাসীকে আগে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কবল হইতে মুক্ত হইতে হইবে। মাকিনবাসী এঁদের নেতৃত্বে এ কাজে হাত দেয়।

মাকিন ইংরাজী বনাম বিলাতী ইংরাজী

কল্পনা করুন কি কতিন কাজ! ইংরাজী শুধু অধিকাংশ মাকিনীদের ভাষা নয়। দুনিয়া-জোড়া সমস্ত ব্রিটিশ উপনিবেশের

## সাহিত্যের প্রাণ

সাধারণ ভাষা ইংরেজী ভাষা একটা যে-সে ভাষা নয়। বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী প্রদারণশীল ভাষা।

ইংরাজী সাহিত্য দুনিয়ার ইংরাজীভাষী ভূখণ্ডেরই শুধু নয়, সারা দুনিয়ারই প্রেরণাদাতা আদর্শ সাহিত্য। ইংলণ্ডের ধর্ম খৃষ্টানিটির ও ইংলণ্ডের ঐতিহ্যের উত্তরাধীকারী হইয়া সেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের কবল হইতে মুক্তির আশা দশাতঃই অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু মার্কিনবাসী অতি অল্পদিনেই এই অবাস্তব কল্পনাকে বাস্তবের সত্যে পরিণত করিয়াছিল।

করিতে পারিয়াছিল এই জন্য যে তাদের দাবী ছিল শুবই সীমাবদ্ধ। কৃষ্টিগত স্বতন্ত্র সত্তার জন্য যা না হইলেই নয়, মাত্র সেইটুকুই তাদের দাবী ছিল। ইমার্সন বলিয়াছিলেন : ইংলণ্ডের ইংরাজীর হাত হইতে আমরা মুক্তি চাই। এ কথাই মানে এই নয় যে, আমরা আমাদের পৈত্রিক সাহিত্য ও ঐতিহ্যের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইতেছি। এটা আমাদের কৃষ্টিক সাহিত্যিক স্বকীয়তার দাবী। এটা আমাদের বাঁচিয়া থাকার তাগিদ।

ইমার্সনের বাণীর ব্যাখ্যা করিয়া বিশ শতকের গোড়ায় মিস জারট্রুড স্টেইন বলেন : আমরা মার্কিনীরা ইংরাজীর বদলে অন্য ভাষা গ্রহণ করিতে চাই না। আমরা চাই ইংরাজী ভাষা সাহিত্যের মধ্যে মার্কিনী প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে। আমরা চাই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে মার্কিনী অনুভূতি বংকৃত করিতে। ইংরাজীকে আমরা করিতে চাই মার্কিনী জনগণের মুখের ভাষা।

কেমন করিয়া? মিস স্টেইন নিজের কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন : “আমরা ইংরাজী হরফ ও ইংরাজী শব্দই ব্যবহার করিব। কিন্তু আমাদের ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ আমাদের ইংরাজী শব্দের মানে হইবে মার্কিনী। ইংরাজী ভাষায় অগণিত শব্দ সম্পদ আছে সত্য, কিন্তু তারা ইংলণ্ডেই বিচরণ করে। আমরা সে-সব শব্দকে মার্কিন মুন্সুকের কর্কশ কঠোর মাটিতে নামাইব। এই মাটির মাঠে-

ঘাটে আমরা তাদেরে লইয়া খেলা করিব। তাদেরে ঘনিষ্ঠভাবে আপন করিয়া লইব। যে আমার সে আমার সাথে খেলা করিবেই। যার সাথে আমার খেলার অধিকার আছে, সেই কেবল আমার। ঐ সব ইংরাজী শব্দ আমাদের নয়া মাতৃভূমিতে আমাদের সংগ্রামী জীবনের সাথে হইবে। আমাদের হাসি-কান্না আমাদের আশা-নিরাশা নিত্য-নতুন শব্দ তৈয়ার করিতেছে। এইসব শব্দ ইংরাজী শব্দের শামিল হইবে।”

কিন্তু মাকিনীরা একদিনে তা পারে নাই। সহজেও পারে নাই। আমরা বর্তমানে যে হীনমন্যতায় ভুগিতেছি, মাকিনীরাও এককালে সেই রোগে ভুগিয়াছিল। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা আজ যেমন আমাদের নিজের ভাষার খনে পশ্চিম-বাংলার ভাষাকেই অধিকতর সভ্য, ভদ্র, শালীন ও সাহিত্যের উপযোগী ভাষা মনে করেন, এককালে মাকিন লেখক-সাহিত্যিকরাও ইংলণ্ডের ইংরাজীকে তাই মনে করিতেন। পুরা উনিশ শতক ধরিয়া, এমন কি বিশ শতকের প্রথম ভাগেও, মাকিন লেখক-সাহিত্যিকদের এই মনোভাব বিদ্যমান ছিল। এটা অভ্যাসের দোষ। পরাধীনতার রেশ। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের লোকেরা যেমন নিজের দেশের শিক্ষপ্ৰজাত দ্রব্যের চেয়ে বিদেশী জিনিসকে অধিকতর সরস ও সুন্দর মনে করে, নিজের মাতৃভাষার খনে পরের ভাষাকেও তাই মনে করে। বিখ্যাত ফরাসী রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী সাহিত্যিক এলেক্সি টকভিল ১৮৩৯ সালে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া মাকিন লেখক-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : ‘মাকিন লেখকরা আমেরিকায় বাস করেন না, তাঁরা বাস করেন ইংলণ্ডে। তাঁরা ইংরাজ লেখকদের ভাষাকেই মডেল মনে করেন।’ খোদ মাকিন পণ্ডিত হেনরি ক্যাবট লজ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘স্ট্যাডিম-ইন-হিস্ট্রি’তে লিখিয়াছেন : ‘যে-সব আমেরিকান সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে চান, নিজেদের মাকিনী পরিচয় গোপন করিয়া ইংরাজ বনিয়ার ভান করাই তাঁদের প্রথম পদক্ষেপ। এটা তাঁদের করিতে হয় ইংলণ্ডের সাহিত্যিকদের প্রশংসা পাইবার জন্য নয়, নিজের দেশবাসীর স্বীকৃতি

## সাহিত্যের প্রাণ

পাইবার জন্যই।' এই দুই পণ্ডিত ব্যক্তি উনিশ শতকের মার্কিন লেখক-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে যা বলিয়াছেন, আমাদের দেশের বর্তমান লেখক সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে তা হবহ সত্য। এঁদেরও মডেল পশ্চিম-বংগের কথ্য ভাষা। এঁরাও মনের দিক হইতে বাস করেন পশ্চিম-বংগে, পূর্ব-বাংলায় নয়। এঁরা যেন সত্য-সত্যই বিশ্বাস করেন পশ্চিম-বংগের কথ্য ভাষায় না লিখিয়া পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায়, এমন কি শুদ্ধ বা কেতাবী ভাষায়, বই লিখিলে পূর্ব-বাংলার পাঠকরা তা কিনিবেন না, পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-সমাজে তা স্বীকৃতি পাইবে না। ধারণাটা একবারে ভিত্তিহীন নয়। আমাদের নাট্যকারদের কারো-কারো মুখে শুনিয়াছি, তাঁরা তাঁদের নাটকের চরিত্রগুলোর মুখে পূর্ব-বাংলার ডায়ালেক্টের বদলে পশ্চিম-বাংলার ডায়ালেক্ট দেন এই কারণে যে নামযাদা অভিনেতারা পূর্ব-বাংলার ডায়ালেক্টে অভিনয় করিতে অনিচ্ছুক। অভিনেতাদের জবাব এই যে, পশ্চিম-বাংলার ডায়ালেক্টে অভিনয় করিতে-করিতে ওটাই তাঁদের মুখে সহজে আসে। তাঁদের কথাও ফেলিয়া দেওয়া যায় না। আমাদের অধ্যাপক শিক্ষক, অফিসার-কেরানী, ব্যবসায়ী-নাগরিকদেরও অনেকের কলমে বাংলার চেয়ে ইংরাজিই সহজে বাহির হয়। এটা অভ্যাসের ফল।

এটাই চলিয়াছিল আমেরিকায় পূরা দেড়শ' বছর। আমাদের আজকার মঞ্চ-সিনেমা, রেডিও-টেলিভিশনের মতই মার্কিন মুগ্ধকেরও ঐসব ক্ষেত্রে মার্কিন ইংরাজীর বদলে বিলাতী ইংরাজী চলিয়াছিল বিশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষ পর্যন্ত। বিখ্যাত ভাষা-বিজ্ঞানী ডাঃ হেনরি এল, ম্যানকন তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আমেরিকান ল্যাংগুয়েজে, লিখিয়াছেন : 'এমন এক সময় ছিল যখন সমস্ত মার্কিন অভিনেতারা লণ্ডনের ওয়েস্টএণ্ডের ডায়ালেক্টে অভিনয় করিতেন। কঠোর অধ্যবসায়ে তাঁরা ও রেডিও-টেলিভিশনের সংবাদ-পাঠকরা ঐ ভাষা ও উচ্চারণ শিখিতেন। সে উদ্দেশ্যে বহু স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। হলিউডের চলচ্চিত্র-শিল্প ও বিভিন্ন ব্রডকাস্টিং স্টেশনের সাহসিকতায় ১৯৩১ হইতে ১৯৬৯ সালের মধ্যে ঐ প্রথার অবসান হয়।'

জনগণের জন্ম

ইংরাজী সাহিত্য যতই সমৃদ্ধ হউক, ইংরাজী ভাষা যতই বিপুল বিশাল হউক, তার প্রভাব যতই শক্তিশালী হউক, ইংরাজের কৃষ্টি যতই সর্বগ্রাসী হউক, তাদের সাম্রাজ্য যতই বিস্তৃত হউক, স্থান ও কালের এই দুর্বীর দাবির নিকট সকলের নত হইতে হইল। ইংলণ্ডের শান্ত-শীতল আবহাওয়া হইতে, বিশ্ব-শাসক ইংরাজের আভিজাত্যের প্রাসাদ হইতে, ইংরাজী ভাষাকে নামিয়া আসিতে হইল মার্কিন মুল্লুকের রুদ্ধ শক্ত মাটিতে। আভিজাত্যের গুণ পরিছন্নতা শালীনতা অস্বনিয়মান সাধুতা আর তার থাকিল না। তার গায় মার্কিন মুল্লুকের কাদা-মাটির ময়লা লাগিল। 'কয়েদীর জাত' মার্কিন চাষা ও কুলির মুখের 'অভদ্র' ভাষা ইংরাজী ভাষা হইল। তাকে আর সাহিত্যে আপাংস্তেয় রাখা গেল না।

এটা অভিজাত ইংরাজী ভাষার মার্কিনী রূপান্তরের দিক। এই সংগে ইংরাজী সাহিত্যকে গণমুখী করিবার সংগ্রামও শুরু করেন মার্কিন নেতারা। মার্কিন সাহিত্যিক বিবর্তনের অন্যতম প্রধান নেতা এঘরা পাউণ্ড এ সম্পর্কে যে সব কথা বলিয়াছেন তার মর্ম এই : ইংরাজীকে আইডরি টাওয়ারে থাকা চলিবে না। মাটিতে নামিয়া আসিতে হইবে। তা যদি সে না নামে, তবে তাকে টাওয়ারের ভাষা হইয়াই থাকিতে হইবে। মার্কিন জনগণ তার সাথে সম্পর্ক রাখিবে না। ইংরাজী সাহিত্যিকও তেমনি যদি প্রাসাদ হইতে নামিয়া না আসেন, তবে মার্কিন জনগণ হইতে তিনি সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইবেন। যে ভাষা ও সাহিত্য জনগণ হইতে বিযুক্ত হইল, সত্য হইতেই সে বিচ্যুত হইল।

এঘরা পাউণ্ড এ ব্যাপারে চীনের ধর্মীয় নেতা কনফিউসিয়াসের নথির দেন। কনফিউসিয়াসের মতে আদর্শ দেশশাসক সেই ব্যক্তি যিনি দেশের প্রত্যেক নাগরিককে নামে চিনেন। চীনা ধর্ম-নেতার এই মহাকাব্যকে এঘরা পাউণ্ড সাহিত্যে প্রয়োগ করেন। তিনি



## সাহিত্যের প্রাণ

বলেন : আদর্শ সাহিত্য সেই সাহিত্য যে-সাহিত্য দেশের জনগণকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারে। নাম ধরিয়া ডাকা ঘনিষ্ঠতার লক্ষণ। এমরা পাউণ্ড দেশের সাহিত্যকে দেশের জনগণের সহিত এমনি ঘনিষ্ঠ হইতে বলেন।

ইহার ফল কি হইয়াছে দুনিয়াবাসীর তা জানা আছে। মিস স্টেইন এমরা পাউণ্ড ও টি. এস. ইলিয়ট মার্কিনবাসীকে কৃষ্টি-সাহিত্যে যে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত করেন, তার ফলেই আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানে রাষ্ট্রনীতিতে 'কয়েদীর জাত' মার্কিনীরা বিশ্বনেতৃত্ব হাসিল করিতে পারিয়াছে। ফ্রস্ট হেমিংওয়ে ও ফকনারের মত বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের জন্ম সম্ভব হইয়াছে। কৃষ্টি-সাহিত্যে স্বকীয়তা লাভ না করিলে মার্কিনবাসীর পক্ষে এটা সম্ভব হইত না।

## মার্কিনী ও আমাদের সাদৃশ্য

এইবার আসুন, মার্কিন জাতির সাথে আমাদের অবস্থার তুলনা করি।

আমরা পূর্ব-বাংলাবাসীরা পশ্চিম-বাংলাবাসী হইতে পৃথক হইয়া একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়াছি এখানে মার্কিনবাসীর সাথে আমাদের পুরাপুরি মিল আছে।

পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলাবাসীদের ভাষা এক, হরফ এক। আমাদের উভয়ের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এক। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নবরত্ন ইসলাম সত্যেন দত্ত উভয় বাংলার গৌরবের ও প্রেরণার বস্তু। ইংরাজ ও মার্কিন জাতিরও এক ভাষা এক হরফ। একই ইংরাজী সাহিত্য একই মিলটন শেক্সপিয়ার উভয় জাতির গৌরব ও প্রেরণার বস্তু। এখানেও আমাদের সাথে মার্কিনীদের অবস্থার পুরা মিল আছে।

দেশ বিভাগের আগেই বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান পাইয়াছে। গল্পে কবিতায় বিজ্ঞানে দর্শনে সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। বাংলাবাসী কবি বাংলা কবিতার জন্য নোভেল প্রাইজ পাইয়াছেন।

মার্কিনী স্বাধীনতার আগেই তেমনি ইংরাজী সাহিত্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে উন্নীত হইয়াছে। ইংরাজী সাহিত্য বিশ্বের কৃষ্টি-শিল্পের বাহন ও বিশ্ববাসীর প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব-বাংলার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া যেমন কঠিন, মার্কিন জাতির পক্ষেও শেক্সপিয়ারের ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব হইতে মুক্ত হওয়া ছিল তেমনি কঠিন। সুতরাং এ ব্যাপারেও মার্কিন জাতির সমস্যার সাথে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক সমস্যার হুবহু মিল আছে।

মার্কিন জাতি ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব-মুক্ত হইয়া জাতীয় স্বকীয়তা-ভিত্তিক নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করিয়াছিল যে কারণে, সেটা ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক তাগিদ ছিল না। পুরাপুরি কৃষ্টির তাগিদও ছিল না। কারণ ইংরাজ জাতির মত মার্কিন জাতির ধর্ম ছিল খুঁটানি এবং চার্চও ছিল বিনাশী! ধর্ম-ভিত্তিক কৃষ্টিও ছিল তেমনি তাদের অবিভাজ্য।

সুতরাং স্বকীয়তা ও নিজস্বতার তাগিদ ছিল তাদের নিছক রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র সত্তার তাগিদ। ধর্মে ঐতিহ্যে ও কৃষ্টিতে মূলতঃ মার্কিন ও ইংরাজ এক গোত্রীয় হইলেও রাষ্ট্রীয় ও ভৌগোলিক সত্তায় মার্কিনীরা ছিল ইংরাজ হইতে সম্পূর্ণ আলাদা। একমাত্র এই রাষ্ট্রীয় সত্তার তাগিদেই তারা ভাষা ও সাহিত্যের স্বকীয়তা আবশ্যিক মনে করিয়াছিল। তারা উপলব্ধি করিয়াছিল, কৃষ্টিক ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বকীয়তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষা বিকাশ ও প্রসার অসম্ভব।

এ ব্যাপারেও মার্কিন জাতীর সাথে পূর্ব-বাংলার মিল ত আছেই, বরঞ্চ বেশী তাগিদ আছে। অধিকার ও আবশ্যিকতাও আছে বেশী।

### আমাদের সুবিধা

ইংরাজ ও মার্কিন জাতীর ধর্মীয় কৃষ্টিক ঐতিহাসিক অবিভাজ্যতা ছিল মার্কিনী স্বকীয়তার পথে বাধা। আমাদের পথে তেমন কোন বাধা

## সাহিত্যের প্রাণ

নাই। পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে ধর্ম কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে কোনও অবিভাজ্যতা নাই। এইখানে মার্কিনীদের সাথে পূর্ব-বাংলার কোনও মিল নাই। এ অমিল আমাদের সমাধান সহজতর করি়াচ্ছে।

মার্কিন জাতি যখন স্বাধীন হয় এবং তারা যখন কৃষ্টিতে ভাষায় ও সাহিত্যে তাদের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার উদ্যম শুরু করে, তখন তাদের নিজস্ব কৃষ্টি ভাষা ও সাহিত্য বলিয়া কিছু মিল ছিল না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীন সত্তার প্রয়োজনে পৃথক জাতীয়তার তাগিদে তারা সৃষ্টি ও নির্মাণ শুরু করে একেবারে 'কিছু না' হইতে। 'কিছু না' হইতেই আজ তারা একটা আত্মমর্যাদাবান জাতি, একটা বিপুল কৃষ্টি, একটা সমৃদ্ধিশালী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে।

এইখানে মার্কিন জাতির সমস্যার সাথে আমাদের মিল নাই। দেশ বিভাগের সময় আমাদের নিজস্ব ভাষা, ইতিহাস, নিজস্ব ঐতিহ্য ও নিজস্ব কৃষ্টি ছিল এবং আছে। কাজেই আমাদেরকে 'কিছু না' হইতে শুরু করিতে হইবে না। আমাদের সমস্যা মার্কিন জাতির সমস্যার মত কঠিন নয়। আমাদের অবস্থা তাদের মত নৈরাশ্যজনকও নয়।

আমাদের বর্তমান কৃষ্টি ঐতিহ্য ইতিহাসকে বুনিয়া দ করিয়া অনেক সহজে আমরা নিজস্ব জাতীয়তা ও স্বকীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারি। স্বকীয়তায় মর্যাদাবান পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে ভাষায় ব্যাকরণে অভিধানে আমরা এমন উন্নতি সাধন করিতে পারি, যা পশ্চিম-বাংলার অনুকরণ অনুসরণের যোগ্য হইতে পারে।

ইংরাজী ভাষার সংস্কারে মার্কিনী প্রচেষ্টাকে ইংরাজেরা গোড়ায় যতই কুনযরে দেখিয়া থাকুক না কেন, এখন সে সংস্কারের অনেকগুলি ইংরাজদের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতেছে।

### মিনিমাম দাবি

ইংরাজী ভাষার সংস্কারে মার্কিনী দাবি কোনও অসম্ভব বিপ্লবাত্মক দাবি ছিল না। হরফ বানান ব্যাকরণ অভিধান আমূল পরিবর্তনের

কোনও সংকল্প বা চেষ্টা ছিল না। তাদের দাবি ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। ইংরাজী ভাষাতে তারা মার্কিনী প্রাণ দিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যকে দিয়া মার্কিনী জনগণের অন্তরের কথা কওয়াইতে চাহিয়াছিল! মার্কিন জাতির মুখের ভাষাকে তারা ইংরাজী সাহিত্যের ভাষা করিতে চাহিয়াছিল। ইংরাজী হরফ হরফই থাকিবে, ইংরাজী শব্দও শব্দই থাকিবে। শুধু ঐ-সব হরফ ঐ সব শব্দ ইংলণ্ডের বদলে মার্কিনী বুলি বলিবে এই মাত্র।

মার্কিন জাতির মতই পূর্ব-বাংলার দাবিও সীমাবদ্ধ মডেস্ট দাবি। আমরা বাংলা হরফ বদলাইয়া উর্দু বা ইংরাজী হরফ গ্রহণ করিতে চাই না। আমরা বাংলা শব্দাবলীর মানে বদলাইতে চাই না। আমরা শুধু এইসব হরফ ও শব্দ দিয়া পূর্ব-বাংলার বুলি বদলাইতে চাই। বাংলা ভাষায় আমরা পূর্ব-বাংলার রূহ প্রবেশ করাইতে চাই।

তাতে গোটা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবনতি হইবে না, বরঞ্চ উন্নতিই হইবে। সংকুচিত হইবে না, বরঞ্চ প্রসারিত হইবে। তাতে বাংলার শব্দ-সম্পদ যদি বাড়ে, তবে সে-সব নয়া শব্দ পূর্ব-বাংলার অন্তর হইতে পূর্ব-বাংলার মুখ হইতেই আসিবে, বাহির হইতে নয়।

তাতে বাংলা হরফে রূপান্তর হইবে না। হরফের সংখ্যায় যদি যোগ-বিয়োগ হয়, তবে সেটা হইবে সাহিত্যের তাগিদে পলিটিক্যাল কারণে। সে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন সে যুগের তাগিদে পশ্চিম-বাংলায়ও অনুভূত হইবে। তাতে আমাদের সংস্কার পশ্চিম-বাংলার গ্রহণযোগ্য হইতে পারে।

কৃষ্টি ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পার্থক্য পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। তাতে মতভেদও নাই। কাজেই আমাদের এই আলোচনা ভাষার স্বকীয়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

### ভাষায় আমাদের স্বকীয়তা

শব্দ ও শব্দের মিছিলই ভাষার বুনিয়ে। এই বুনিয়েদের উপর প্রতিষ্ঠিত মাত্রা ধ্বনি উচ্চারণ স্বরভঙ্গি ফনিটিকস (মুখেরেজ) যতি (তালাফফুয) সিনট্যাকস (নহ বা বাক্য গঠন-প্রণালী) ইটিমলজি (সরফ বা শব্দগঠন-পদ্ধতি) প্রেসোডি (উরুধ বা ছন্দ প্রকরণ) এইগুলিই ভাষার স্বকীয়তা-বোধক এবং এক ভাষা হইতে অন্য ভাষার স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপক। পূর্ব-বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিতেই স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

এই বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্যের সংগত কারণ আছে। ভাষাটী আগে মুখের। পরে লেখার। কাজেই ভাষার স্রষ্টা জনগণ, পণ্ডিতেরা নন। ধর্ম সৃষ্টি আবহাওয়ার পরিবেশ ভূগোল ঋতু ও জীবন যাপন প্রণালীর প্রভাব পণ্ডিতদের খনে জনগণের উপর অনেক বেশী। এসব ব্যাপারেই পূর্ব-বাংলার ও পশ্চিম-বাংলার মধ্যে পার্থক্য বিপুল। পূর্ব-বাংলা মুসলিম-প্রধান কৃষি-ভিত্তিক, গ্রাম-কেন্দ্রীক। পশ্চিম-বাংলা হিন্দু-প্রধান, শিল্প-ভিত্তিক, নগর-কেন্দ্রীক। পূর্ব-বাংলা নদী-মাতৃক, পশ্চিম-বাংলা নদী-পিতৃক। তার মানে পশ্চিম-বাংলার বেশী নদী ধমনী মাত্র। পূর্ব-বাংলার বেশী নদী ধমনী, শিরা-উপশিরা, স্নায়ু ও তন্তু সবই। এইসব প্রাকৃতিক কারণেই দুই বাংলার জনগণের মুখের ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, অনেক ক্ষেত্রে বিপরীত ধরনের, প্রসেস ও পদ্ধতিতে শব্দ প্রতীক ও বাক্য গঠিত ও উচ্চারিত হইয়াছে। এই কারণে দুনিয়ার অন্যত্রও একই হরফের ভাষাতেও বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছে।

এইসব বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের একটাও দোষের নয়। একটাও লজ্জা বা অগৌরবের বিষয় নয়। কোনটাই অশালীন বা ভালগার নয়। স্রুতিকটুও নয় যার-তার কানে। পশ্চিম-বাংলার স্বকীয়তাও যেমন শালীন ও মধুর; আমাদের স্বকীয়তাও তেমনি শালীন ও মধুর। পার্থক্য

শুধু এই যে, একটা সাহিত্যে স্বীকৃত, অপরটা স্বীকৃত নয়। এই স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির কারণ আছে। সেটা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় কারণ।

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার দরুন প্রায় দুই শ' বছর কলিকাতা গোটা বাংলার কৃষ্টি-কেন্দ্র ও সাহিত্য কেন্দ্র ছিল। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠন রূপায়ণ বিকাশ ও প্রসার হইয়াছে কলিকাতা হইতেই। কলিকাতার প্রত্যক্ষ পরিপার্শ্ব ও ঘনিষ্ঠ পরিবেশ পশ্চিম-বাংলা। এই কারণে কলিকাতার ভাষার গঠনে রূপায়ণে পশ্চিম-বাংলার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়িয়াছে। তাতেই পশ্চিম-বাংলার স্বকীয়তা কলিকাতার, সুতরাং গোটা বাংলার, সাহিত্যিক স্বকীয়তায় মর্যাদা লাভ করিয়াছে।

ঠিক এই কারণেই পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা কলিকাতার স্বকীয়তা হয় নাই। সাহিত্যেও স্থান পায় নাই। যে ভাষা বা ভাষার যেটুকু স্বকীয়তা সাহিত্যে স্থান পাইল না, তা আর ভাষা থাকিল না। হইয়া গেল তা স্থানীয় আঞ্চলিক ডায়ালেক্ট। সাহিত্যের বিচারে তা হইল অভদ্র অশালীন ভালগারিটি। অভদ্র অশালীন ভালগারিটি হওয়ার পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। সাহিত্যে স্থান না পাওয়ায় তা আশালীন ভালগার থাকিয়া গিয়াছে। শতাধিক বছর ধরিয়া চলে এই আক্রমণের বা ভিশাস্ সার্কেলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, পশ্চিম-বাংলার বাংলা সাহিত্যের বাংলা হইয়াছে। সাহিত্যের বিচারে পূর্ব-বাংলার বাংলা হইয়াছে অপাৎস্তম্ব। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের বিচারে পশ্চিম-বাংলার স্বকীয়তা তার বিকৃতি তার শ্রুতিকটুতা তার অপভ্রংশ সবই হইয়াছে বাংলা ভাষার সৌন্দর্য অলংকার ও শালীনতা। আর পূর্ব-বাংলার অধিকতর সাধু মধুর স্বকীয়তা হইয়াছে অভদ্র অশালীন ভালগারিটি। সুতরাং ভদ্র লোকের পাতে দিবার, সাহিত্যে স্থান পাইবার, অযোগ্য।

এইভাবে একশ' বছর পশ্চিম বাংলার দোষ হইল গুণ, আর পূর্ব-বাংলার গুণ হইল দোষ। অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াইল যে, শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়, শুধু কলিকাতাবাসীর নয়, শুধু

পশ্চিম-বাংগালীর বা পশ্চিম-বাংলার হিন্দুর বিচারে নয়, স্বয়ং পূর্ব-বাংগালীর বিচারেও পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা তার মুখের ভাষা ঘৃণ্য জঘন্য অভদ্র ছিঃ ছিঃ ওয়াক-থু ব্যাপার হইয়া গেল। কলিকাতা-প্রবাসী পূর্ব-বাংলার উদ্রলোক তার কথাবার্তায়, পূর্ব-বাংগালী সাহিত্যিক তার লেখায়, নিজের পূর্ব-বাংগালীত্ব সম্বন্ধে গোপন করিয়া চলিলেন।

### পরিবেশের চাপ

এই পরিস্থিতির জন্য বাংলা সাহিত্যকে পশ্চিম-বাংগালীকে, পশ্চিম-বাংলার হিন্দুকে দোষ দেওয়া যায় না। দোষ এদের কারণে নয়। সমস্ত দোষ পরিবেশের। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সৃষ্ট পরিবেশের চাপে স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটিয়াছে। অমন পরিবেশে ঐ অবস্থায় ওরূপ হইয়াই থাকে। হওয়াই স্বাভাবিক।

শুধু ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপারেই নয়, কৃষ্টি-সভ্যতার অন্যান্য শাখায়ও তাই ঘটিয়া থাকে। ঘটিয়াছেও। রাষ্ট্রীয় প্রভাবের তারতম্যও এই উচ্চতানীচতার জন্ম দিয়া থাকে। এই কারণে হিন্দুদের হাতে আমাদের যেমন দুর্দশা পোহাইতে হইত, হিন্দুদেরও তেমনি ইংরাজের হাতে দুর্দশা পোহাইতে হইত। হিন্দু সাহিত্যিকরা যেমন মুসলমান সাহিত্য-সেবীদের 'লাল বালতি মাখায় লইয়া' (তুকী টুপি পরিয়া) সাহিত্য সম্মিলনীতে যোগ দিতে বারণ করিতেন, হিন্দুদের তেমনি ধুতি-চাদর লইয়া রাজ-দরবারে যাইতে নিষেধ করা হইত।

এ বিষয়ে আমরা উভয়েই সমান নিগৃহীত। আমরা পাক-ভারতী-য়েন্না বিদেশে আজও এই অসুবিধা পোহাইতেছি।

বেশী দিনের কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রীয় পার্টিতে পাকিস্তানের মুসলমান প্রতিনিধি শেরওয়ানী-চুশত পাজামা পরিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। ভারতের প্রতিনিধি মাদ্রাজী হিন্দু উদ্রলোক যোগ দিয়া-ছিলেন ধুতির উপর লম্বা কোট পরিয়া। পরদিন খবরের কাগজে

এইরূপ রিপোর্ট বাহির হয় : নিশ্চয়ই অনবধানবশতঃ পাকিস্তানী প্রতিনিধি প্যান্ট পরিতে ভুলিয়া গিয়া শুধু আঙুরওয়ার পরিয়াই পার্টিতে আসিয়াছিলেন। আর ভারতীয় প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন কোমরে বেড শীট জড়াইয়া খুব সম্ভব ব্যস্ততা হেতু।’

এই মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে রাষ্ট্রীয় প্রভাবের তারতম্যে। হিন্দুদের যে ধুতি-চাদর পনর বছর আগে ভারতেরই রাজ-দরবারের জন্য অসভ্য পোশাক ছিল, আজ সেই ধুতি-চাদর পরিয়াই ভারতীয়েরা রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাজ-ভবনের শোভা বর্ধন করিতেছেন। আমরা বাঙ্গালীরা যে আজো জাতীয় পোশাকের বদলে কোট-টাই পরিতে গৌরব বোধ করি, সে দোষ ইংরাজের নয়। দোষ রাষ্ট্রীয় পরিবেশের এবং শেষ পর্যন্ত আমাদের গোলামি মনোভাবের।

### বিভাগ-পূর্ব বাংলা সাহিত্য

ঐ পরিবেশে উক্ত অবস্থায় বাংলাদেশ যখন ভাগ হয়, তখন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যিকদের এবং পশ্চিম-বাংলার ভাষায় একক প্রাধান্য ছিল। স্বাভাবিক কারণেই ছিল। সে প্রাধান্যের অধিকারও ছিল তাদের।

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন তাঁরাই। বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁরাই। সংস্কৃতের কবল-মুক্ত করিয়া বাংলা ভাষাকে বাংগালীত্ব দিয়াছিলেন তাঁরাই। নানা কারণে বাংলার মুসলমানরা সে সাধনায় শামিল হইয়াছিল সামান্যই। ফলে তার প্রাণ তার আংগিকের সকল ক্ষেত্রেই বাংলা সাহিত্য ছিল কার্যতঃ হিন্দু সাহিত্য। উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়ায় যে কল্পজন মুসলমান নবা বাংলা সাহিত্য সেবায় নামেন, মীর মুশারফ হোসেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে প্রধান। তিনি তাঁর ‘বিস্বাদ-সিদ্ধু’তে ‘আল্লা-খোদার’ জায়গায় ‘ঈশ্বর-ভগবান’ লিখিয়াছেন।



কারণ বাংলার মুসলমানের দৈনন্দিন মুখের ভাষা হইয়াও যেসব শব্দ হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত হইত না, তৎকালের সাহিত্যিক বিচারে সেগুলি বাংলা শব্দ ছিল না। বাংলা ভাষায় ঐ সব শব্দ ব্যবহার করিলে ভাষা গুরু-চণ্ডালী ভাঙ্গগারিটি-দোষে দুষ্ট হইত। শুধু ধর্ম-সম্পর্কিত আরবী-ফারসী শব্দ সম্পর্কেই যে এই বিধি-নিষেধ ছিল তা নয়। মামুলি বৈষয়িক ব্যাপারে মুসলমানদের নিত্য-ব্যবহৃত শব্দের উপরও এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। 'পানি' 'লহ' 'গোশত' 'আপ্তা' প্রভৃতি শব্দও বাংলা সাহিত্যে অক্ষুণ্ণ ছিল।

অবশেষে সত্যেন দত্ত ও নয়রুন্ন ইসলামের আবির্ভাবে কিছু-কিছু মুসলমানী বাংলা শব্দ যে বাংলা-সাহিত্যের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিল, সেটাও ছিল প্রতিভার স্বীকৃতি। মুসলমানদের জাতীয় অধিকারের স্বীকৃতি নয়।

তবু সেটা ছিল সাম্প্রদায়িক বিরোধ। কোন্টা 'খাঁটি' বাংলা শব্দ আর কোন্টা নয়, এই বিচারেই ছিল সমস্যা সীমাবদ্ধ। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে যে গণমুখিতার প্রবণতা দেখা দেয়, সেটা ছিল গোড়ার দিকে সংস্কৃত-প্রভাবমুক্ত সহজ ও প্রচলিত বাংলা শব্দ প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তখনও সাহিত্যের ভাষা ছিল সাধু বাংলা বা লেখ্য বাংলা। কথ্য বাংলা তখনও সাহিত্যে প্রবেশ করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ খুবই সহজ ও প্রচলিত বাংলায় লিখিতেন বটে কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত তিনি উপন্যাসের গল্পকারের ভাষাতে ত লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিতেনই পাত্র-পাত্রীর ডায়লগের ভাষাতেও লেখ্য বাংলা ব্যবহার করিতেন। কথ্য ভাষা ব্যবহার করিতেন না। তারপর গণমুখী প্রবণতার বন্যায় রবীন্দ্রনাথও ভাসিয়া গেলেন, বরঞ্চ উদ্যমী হইলেন। তখন মাত্র গল্পকারের ভাষাটি থাকিল লেখ্য বাংলা। পাত্র-পাত্রীর ডায়লগের ভাষা হইল কথ্য বাংলা। এটা ছিল স্বাভাবিক। সাহিত্যকে গণমুখী করিতে হইলে সব ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর কথাবার্তায় ও চাল-চলনে লোকাল কালার আঞ্চলিক রং ও চং দিতেই হইবে। না দিলে গণ-সাহিত্য হইবে না।

পাত্র-পাত্রীর এই ডায়ালগের ভাষা ও আঞ্চলিক রং স্বভাবতঃই হইল পশ্চিম-বাংলার। পূর্ব-বাংলা সাহিত্যিক-কবিরা এ বন্য়ার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। ফলে সাহিত্যিক দৌড়ে তাঁরা পিছাইয়া পড়িলেন। যতদিন বাংলা সাহিত্যে কথ্য বাংলা প্রবেশ করে নাই, ততদিন তা সাধু বা লেখ্য বাংলায় সীমাবদ্ধ ছিল ততদিন পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক-প্রতিভা বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় নাই। ঐ যুগে পূর্ব-বাংলা কালী প্রসন্ন ঘোষ মীর মুশারফ হোসেন নবীন সেন দীনেশ সেন গোবিন্দ দাস রজনী সেন কায়কোবাদ জলধর সেন মনোমোহন সেন দক্ষিণারঞ্জন উপেন্দ্রকিশোর প্রভৃতি বাংলা-সাহিত্যের তৎকালীন দিক-পালদের জন্ম দিয়াছিল। বাংলা-সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রবেশ করায় এবং স্বাভাবিক কারণেই সে কথ্য ভাষা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা হওয়ায় পূর্ব-বাংলার সাহিত্য-প্রতিভার কঠরোধ হইয়া গেল।

তারপর এই প্রগতির গতি আরও অনেক দূর অগ্রসর হইল। গল্প-উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর মধ্যেই কথ্য ভাষা সীমাবদ্ধ থাকিল না। স্বল্পং গল্পকারের ভাষাও কথ্য ভাষা হইয়া গেল।

শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, গুরুগম্ভীর সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ নিবন্ধও লেখা হইতে লাগিল কথ্য ভাষায়। পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা, এমনকি পূর্ব-বাংলায় মুসলমান সাহিত্যিকরাও, এই বিপুল মিছিলের চাপ ঠেকাইতে পারিলেন না। তাঁরাও 'হিন্দাবাদ' বলিয়া এই মিছিলে शामिल হইয়া গেলেন। আমি নিজেও।

ঠিক এই সময়ে, বাংলা সাহিত্যের এই স্তরে, দেশ ভাগ হয়। পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলা দুইটি স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তাও আজ পনর বছরের কথা। এই পনর বছরে আমরা ধর্ম ও কৃষ্টির নামে অনেক কথা বলিয়াছি। গণতন্ত্রের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্টি-সভ্যতার বাহন যে সাহিত্য, পূর্ব-বাংলার সেই সাহিত্যকেই কোনও স্বকীয়তা দিতে পারি নাই।

অথচ পূর্ব-বাংলার ছাত্র-তরুণরা বাংলা ভাষার জন্য জান কৌরবানি করিয়াছে। তাদের আত্ম-ত্যাগের ফলে বাংলা ভাষা পাকি-

## সাহিত্যের প্রাণ

স্তানের রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে। তাদেরই দাবির উপর বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার জন্য পূর্ব-বাংলায় এত করিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যিকরা বাংলা-সাহিত্যকে আজও জাতীয় সাহিত্য করিতে পারেন নাই। সরকারও বাংলাকে সরকারী ভাষা করেন নাই।

অথচ সীমান্তের ওপারে এই পনর বছরে পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য লম্বা-লম্বা লাফে উন্নতির পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। গল্প-কবিতায় নাটক-নভেলে বিজ্ঞান-দর্শনে শিশু-সাহিত্যে অনুবাদ-সাহিত্যে এমনকি ধর্মীয় সাহিত্যেও তারা বিপুল সম্পদ সৃষ্টি করিয়াছে। আজ পশ্চিম-বাংলার সাহিত্য অফুরন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত হইয়াছে। আর এদিকে পূর্ব-বাংলা দেশ বিভাগের সময় যেখানে ছিল, আজও ঠায় সেখানেই আছে।

এর কারণ কি? উত্তর, পূর্ব-বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করে নাই। স্বকীয়তা লাভ করে নাই কেন? উত্তর, সাহিত্যিকরা এই নয়া রাষ্ট্রীয় পরিবেশের সহিত নিজেদেরে এডজাস্ট করিতে পারেন নাই। উনিশ শ সাতচল্লিশ সালে তাঁরা যে পথে যেদিকে চলিতে ছিলেন, আজো সেই পথে সেই দিকে চলিয়াছেন। যেন ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটে নাই, নয়া দেশ নয়া জাতি সৃষ্টি হয় নাই, ভাবটা যেন এই। নয়া যিম্পেগির বাণীর ছোঁয়াচও কাজেই তাঁদের মনে লাগে নাই।

ফলে এই পনর বছরেও পূর্ব-বাংলার সাহিত্য স্বকীয়তা লাভ করে নাই : না প্রাণে, না রূপে, না তার আংগিকে। পূর্ব-বাংলার এ স্বকীয়তাকে কেউ ইসলামী রেনেসাঁর সাথে গোল পাকাইবেন না। ও দুইটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ইসলামী রেনেসাঁর কাজ যোগ্যতর হাতেই আছে। আমি এখানে সে কথা বলিতেছি না। পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক স্বকীয়তার কথাই আমি বলিতেছি।

এ স্বকীয়তায় পূর্ব-বাংলার হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খৃষ্টান সকলেই সমভাবে शामिल ও শরিক। তাদের সকলের সাম্মিলিত রূপ

প্রতিফলিত হইবে এই স্বকীয়তায়। অবিভক্ত বাংলায় কলিকাতার সাহিত্যিকরা পূর্ব-বাংলার এই স্বকীয়তাকেই আপাতশ্বেদ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাংলা ভাগ হইয়া ঢাকায় রাজধানী আসার পরেও এখানকার সাহিত্যিকরা সেই স্বকীয়তাকেই আজো আপাতশ্বেদ্য করিয়া চলিয়াছেন।

আগেই বলিয়াছি সাহিত্যের স্বকীয়তার মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তা আছে। সাহিত্যের আন্তর্জাতিক রূপটা তার প্রাণে বা বাণীতেই সীমাবদ্ধ। রস-সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য আসলে বিশ্ব-মানবতা বিকাশেরই বাণী বহন করে। সেজন্য সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠায়, তার রুহ পয়দায়, সময় লাগে। একদিনে তা হয় না। ফরমায়েশ-মাফিকও হয় না। কাজেই পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে পনর বছরেও স্বকীয় রুহ প্রতিষ্ঠা পূর্ণ হয় নাই, এটা আমার অভিযোগ নয়।

তা ছাড়া সাহিত্যে গণ-জীবনের বাণী ও গণ-জীবনের চিত্র রূপায়িত হওয়ার আগে সাহিত্যকে আরেকটি স্তর পার হইতে হয়। সেটা জাতীয় জীবনের বাণী ও রূপ। সব সাহিত্যেই এই মৃগ-বিবর্তন হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যেও তা হইবে।

এটা বিজ্ঞানের কথা। জাতীয় বিপ্লবের প্রবেশ-পথ দিয়াই সমাজ-বিপ্লব বা গণ-বিপ্লবে যাইতে হয়। পূর্ব-বাংলার জাতীয় জীবন তার ইতিহাস তার ঐতিহ্য তার পুরা কাহিনী তার ঐতিহাসিক হিরো-হিরোয়িন্ন কিম্বদন্তির রবিনহুড্ গণ, এক কথায়, পূর্ব-বাংলার অতীত রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় সত্তার ইতিবৃত্ত কথামালা কিসসা-কাহিনীকে আর্টের রূপে নাটক-নভেলের আকারে রূপায়িত ও জীবন্ত করিতে হইবে।

সেই রূপায়িত অতীত হইতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রেরণা ইশারা ইংগিত আসিবে। ফরাসী রুশিয়া ইংলণ্ড আয়র্ল্যান্ড ইটালি ও আমেরিকা সব দেশের সাহিত্যেই এই বিবর্তন ঘটিয়াছে। বিভাগ-পূর্ব বাংলায়ও তাই হইয়াছে। পশ্চিম-বাংলার, মানে বিভাগ-পূর্ব গোটা বাংলার, সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত মাইকেল রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়াই পরবর্তীকালে নবরঙ্গ

ইসলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারশঙ্কর মনোজ বসুরা গণ-সাহিত্য সৃষ্টির সুরে পৌঁছিতে পারিয়াছেন ।

### আমাদের জাতীয় সাহিত্য

আমাদেরও তাই করিতে হইবে । আমাদের জাতীয় সাহিত্যের যুগ স্বভাবতঃই খাট হইবে । অন্যান্য দেশের মত লম্বা হইবে না । কারণ অন্যান্য দেশের এই যুগ বিবর্তন হইতে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা আমাদের আছে । কিন্তু যতই সংক্ষেপ হউক, এই জাতীয় যুগ আমাদের সাহিত্যে আসিতেই হইবে । জাতীয় জীবন রূপায়ণের মধ্য দিয়া গণ-জীবন রূপায়ণের এই অমোঘ ঐতিহাসিক প্রসেস আমাদের মানিয়া লইতেই হইবে ।

পূর্ব-বাংলা, মানে দ্রাবিড়ী বাংলা, প্রাগৈতিহাসিক কালেও স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল । ঐতিহাসিক যুগে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম আমলেও সে স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তা বজায় ছিল । উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের আক্রমণে সে রাষ্ট্রীয় সত্তা ও স্বাধীনতা মাঝে-মাঝে ব্যাহত হইলেও জাতীয় সত্তা অব্যাহত ছিল ।

এই মুহুর্তের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন বাংলা বীর জাতীয় নেতাক্রমে উত্তর ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বীরত্বের সংগে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন । কখনও সে আক্রমণ বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করিয়াছেন । কখনও কখনও আবার সে আক্রমণ রুখিতে না পারিয়া অধিকতর বীরত্বের সঙ্গে জান কোরবানি করিয়াছেন ।

জানা-অজানা ইতিহাসের পাতা ঘাঁটিয়া এঁদের কথা জানিতে হইবে । কাব্য-নাটক ও গল্প-উপন্যাসের আখ্যান-বস্তু করিতে হইবে । পূর্ব-বাংলার সে বীরত্বের ও গৌরবের জাতীয় অধ্যায়কে জীবন্ত অধিকার করিয়া পূর্ব-বাংলাজীর চোখ ও মনের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে । তবেই পূর্ব-বাংলা স্বকীয়তা-বোধে ও জাতীয়তার উন্মাদনায় সজীবিত হইয়া উঠিবে । স্টেটের আইডানহো ট্যালিসম্যান, বঙ্কিমচন্দ্রের

আনন্দ মঠ-রাজসিংহ-প্রতাপাদিত্য (চন্দ্রশেখর) এমন কি, দেবী চৌধুরানী হইতে এ ব্যাপারে প্রেরণা লাভ করা যাইবে।

আমাদের ঐতিহাসিক বীরদের সংখ্যাও বেশী, বীরত্বের কাহিনীও অতুলনীয়। শামসুদ্দিন ইলিয়াস হুসেন শাহ ঈসা খাঁ মুসা খাঁ ওসমান আফগান কেদার রায় মজলিস-কুতুব বাহাদুর গাযী সোনাগাযী মধুরায় প্রভৃতি শাসক ও হাজী শামসুদ্দিন বাগদাদী মাসুম খাঁ আদিল খাঁ প্রভৃতি সেনাপতির রোমাঞ্চকর বীরত্ব স্কট-বঙ্কিমচন্দ্রের বীরদের তুলনায় হীন ত নয়ই, বরঞ্চ সর্বাংশেই শ্রেষ্ঠ।

### সাহিত্যের বিষয়-বস্তু

এঁদের জীবন-কথা লইয়া জাতীয়তা-দ্যাতক নাটক-উপন্যাস লিখিয়া সাহিত্য-শিল্পীরা পূর্ব-বাংলার জনসাধারণকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে পারেন।

পরবর্তী কালের ওহাবী আন্দোলন মোমিনশাহীর ফকির আন্দোলন তিতুমীর মাওলানা শরিয়তুল্লাহ ও দু দু মিয়া'র কাহিনী আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেরণা যোগাইতে পারে।

বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটক-নভেল চলিবে না যারা মনে করেন, তাঁদের ধারণা ভুল। বর্তমান যুগেও কিরূপ প্রাণ-স্পর্শী ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর রোমান্টিক নভেল লেখা যায়, রাইডার হ্যাগার্ড তার স্বাক্ষর।

কোনও যুগের জন্যই সাহিত্যের কোনও রূপই বাসী হয় না। আসলে চাই রস-সৃষ্টির প্রতিভা। সুতরাং পূর্ব-বাংলার সাহিত্যকেও এই জাতীয় স্তর পার হইতেই হইবে। অন্য কথায়, আমাদের মধ্যেও স্কট হ্যাগার্ড হিউগো বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত মাইকেল রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র ক্ষীরোদ প্রাসাদ গিরিশচন্দ্র ডি, এল, রায়ের জন্ম হইতে হইবে। নম্বরের সুবিধা আছে বলিয়া আমাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকরা যুগপৎভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র ও তারশঙ্কর হইতে পারেন।

## সাহিত্যের প্রাণ

অতীতের বীরদের বীরত্ব কাহিনী হইতে বর্তমানের মধ্যবিত্তশ্রেণীর জীবনালেখ্যের পথ দিয়াই আমাদের গণ-জীবনে প্রবেশ করিতে হইবে। গবর্নর মিনিস্টার হাকিম জজ উকিল ব্যারিস্টার ডাক্তার বিজ্ঞানী টিচার প্রফেসর সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রভৃতি শহরিনা সুখীদের, মাস্টার শিক্ষক মোল্লা মৌলবী তালুকদার জোতদার জমিদার প্রভৃতি গ্রামীণ ইন্টেলি-জেনশিয়র, পীর-দরবেশ সাধু-সন্ন্যাসী প্রভৃতি ধর্ম-নেতার জীবনালেখ্যে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন-চিত্র প্রাণবন্ত বাস্তবরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

এই যুগ উত্তীর্ণ হইবার পর আসিবে আমাদের গণ-জীবনের সাহিত্যের যুগ। এই যুগে আমাদের কৃষক শ্রমিক কৃষি-মজুর কলের মজুর কুলি রিকশাওয়ালার প্রভৃতি সমাজ-ইয়ারতের নিচের তলার শোষিত জনগণের জীবনালেখ্যে আমাদের সাহিত্যের মখমুন ও বিষয়-বস্তু হইবে। তখনই হইবে আমাদের সাহিত্য গণ-সাহিত্যরূপে সমৃদ্ধিশালী। এটাই হইবে পূর্ব-বাংলার মানিক বানার্জি তারশঙ্করের যুগ।

## আর্টের রূপান্তর

আগেই বলিয়াছি, আমাদের সাহিত্যের এই যুগ-বিবর্তনের দীর্ঘ সময় লাগিবে না। বরঞ্চ যুগপৎভাবেই এ বিবর্তন ঘটিতে পারে। বিশ্বজগৎ আর আগের বিশ্ব-জগৎ নাই। বিজ্ঞান আজ দুনিয়ার চেহারা হই বদলাইয়া দিয়াছে। সর্বত্র আজ জনগণের রাজ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

জনগণের জীবনরূপই আজ জাতীয় জীবনরূপে স্বীকৃত। আর্ট শিল্প সাহিত্য আজ আর মুষ্টিমেয় শোষকের জীবন-রস নয়। জনগণের জীবনে তা ব্যাপ্ত হইয়াছে। দুনিয়ার ভৌগোলিক দূরত্ব আজ সঙ্কুচিত।

বিশ্ব-মানব আজ এক পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে যুদ্ধবাদী শোষকদের সমস্ত প্রতিরোধ তৈলিয়া। এই ভাবে পৃথিবীকে ছোট করিয়া বিজ্ঞান মানুষকে গ্রহ-নক্ষত্রের দেশে টানিয়া নিতেছে।

বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহে মানুষ চড়াইয়া পড়িবে, সে দিনও আর বেশী দূরে নয়। পঞ্চাশত্রে এটম বোমা ও ব্যালিস্টিক মিসাইল আজ সারা বিশ্বজগৎকে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার জন্য দাঁত বাহির করিয়াছে। এ সবই ঘটিতেছে কল্পনাভীত দ্রুত গতিতে।

আমরা বাস করিতেছি এই যুগে। আমাদের সাহিত্যিকরা আমাদের তরুণরা জন্ম নিয়াছেন এমনি বিপ্লবের ঝড় তুফানের মধ্যে ইসরাফিলের শিঙ্গার আওয়াজের সোরগোলে। কাজও করিতে হইবে তাঁদের এই পরিবেশেই। বিবর্তন আসিবে তাঁদের ঐ গতিতেই। এই হইবে আমাদের কৃষ্টি সাহিত্যের বিবর্তনের গতি।

### সাহিত্যের আংগিক

এটা সাহিত্যের প্রাণ ও রূপের দিক। আংগিকের দিকটা ভিন্ন রকমের। সাহিত্যের আংগিক মানে ভাষা। আমাদের ভাষা মানে, শুধু বাংলা ভাষা নয়, পূর্ব-বাংলার ভাষা। এইখানেই মার্কিন ইংলিশ ও ব্রিটিশ ইংলিশের দ্বন্দ্বটা আমাদের মডেল হইবে, ধারণা যোগাইবে।

সব ভাষার মতই বাংলা ভাষারও দুইটা রূপ : লেখ্য ও কথ্য। গদ্য ও পদ্যের কথা এখানে বলিলাম না। কারণ, ওটা আসলে ভাষার রূপ নয়, পদ-বিন্যাসের রূপ। লেখ্য বাংলা পশ্চিম ও পূর্ব-বাংলায় একই। মুসলমান লেখকদের বাংলায় আরবী ও ফারসী-মূলক শব্দের সংখ্যা একটু বেশী থাকে বটে, কিন্তু ও-পার্থক্য শ্রেণী-গত নয়, পরিমাণ-গত। কারণ, হিন্দু লেখকরাও যথেষ্ট আরবী-ফারসীমূলক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

কালক্রমে পূর্ব-বাংলার পাড়া-গাঁয়ের ক্ষেতি-খোলায়, নদী-বন্দরের, হাট-বাজারের বহু অজ্ঞাত-অবহেলিত শব্দ পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে স্থান পাইবে। তাতেও পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার লেখ্য ভাষার



## সাহিত্যের প্রাণ

পার্থক্য খুব বাড়বে না। বাড়িলেও সেটা হইবে পরিমাণ-গত। পশ্চিম-বাংলার গণ-মুখী উন্নতিশীল সাহিত্যেও তেমনি পাড়া-গাঁয়ের গজ-বাজারের বহু অবহেলিত শব্দ স্থান পাইবে।

কাজেই আজ যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনি পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার লেখ্য ভাষার ঐক্য অটুট থাকিবে। মার্কিন মুল্লকে অমন শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী ভাষা বিপ্লব হইবার পরেও ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও লেখ্য মার্কিন ইংরেজী ও বিলাতী ইংরেজী মোটামুটি একই আছে। আমাদের উভয় বাংলায়ও তাই থাকিবে। লেখ্য বাংলায় লেখ্য যে-কোনও প্রবন্ধ নিবন্ধ, যে কোনও দর্শন বিজ্ঞানের বই, এমনকি গল্প-উপন্যাসও উভয় বাংলার বই বলিয়া দাবি করিতেও পারিবে, সে দাবি গৃহীতও হইবে। কাজেই বলা যাইতে পারে, সাধু বা লেখ্য উভয় বাংলার ভাষা অবিভাজ্য।

## দুই বাংলার ভাষালেক্ষে পার্থক্য

কিন্তু কথা বাংলা সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। কথ্য বাংলা কি ধ্বনি কি মাত্রা কি স্বরভংগি কি উচ্চারণ কি পদ-বিন্যাস সব ব্যাপারেই দুই বাংলায় অনেকখানি পৃথক। ক্রিয়া পদেই এই পার্থক্য সবচেয়ে বেশী তীব্র।

এটা দেখা যাইবে যে এই উভয় প্রকার পার্থক্যেই আঞ্চলিক বিকৃতি পশ্চিম বাংলার কথ্য ভাষাকে সাধু বা লেখ্য বাংলা হইতে যতদূরে সরাইয়াছে, পূর্ব-বাংলার বিকৃতি এখানকার কথ্য ভাষাকে সাধু ভাষা হইতে ততদূরে সরায় নাই। তাছাড়া পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায় অনেক শব্দ সাধুরূপেই ব্যবহৃত হয়। পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় 'সূতা'কে 'সূতা' 'রূপা'কে 'রূপো' 'তুলা'কে 'তুলো' 'উল্টা'কে 'উল্টো' এমনকি মুসলমানী নামের আরবী 'উল্লা'কে 'উল্লো' করা

হইয়াছে। এমন শব্দ-বিকৃতি আরো অনেক আছে। কিন্তু পূর্ব-বাংলায় এগুলি সাধু রূপেই কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হইতেছে।

পশ্চিম-বাংলার এই বিকৃতি অমৌক্তিক ও অনাবশ্যিক। বলা হয়, শব্দ-মূলের আঞ্চলিক মোচড়ের প্রয়োজনেই এটা হইয়া থাকে। দুই সিলেবলের শব্দের প্রথমটা 'উ' হইলে পরেরটার 'আ' 'ও' হইয়া যায়।

কথাটা ঠিক নয়। কারণ পশ্চিম-বাংলার লোকেরাই 'সুরা' 'শুবা', 'মুদা', 'মুদ্রা', 'সুধা', 'মুর্ছা' ইত্যাদি বহু শব্দ সাধুরূপেই উচ্চারণ করিয়া থাকে। সুতরাং কতিপয় শব্দের এরূপ বিকৃতিকে ইংরাজীর 'বি ইউ টি বাট' ও 'পি ইউ টি পুটের' মত অন্ধ ও অকারণ বিকৃতি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। কাজেই এসব বিকৃতি গোড়াতে ছিল আঞ্চলিক ভাণগারিটি, সাহিত্যে বা ভদ্র লোকের মুখে স্থান পাইবার অযোগ্য।

এর চেয়েও গুরুতর ও ঘোরতর শব্দ-বিকৃতি ঘটিয়াছে পশ্চিম-বাংলায় ভাষার ক্রিয়াপদে। সাধু ও লেখ্য ভাষার 'খাইয়া', 'পরিয়া', 'বসিয়া', 'পড়িয়া', ইত্যাদি ধ্বনির শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলায় এক মোচড়ে 'খৈয়ে', 'পরে', 'বসে', 'পড়ে', হইয়া গিয়াছে। 'খাওয়াইয়া', 'পরাইয়া', 'বসাইয়া', 'পড়াইয়া', 'দাঁড়াইয়া' প্রভৃতি ধ্বনির শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলার মুখে এমন ডাইভিং মে'চড় দিয়াছে যে ওদের সাধু রূপ হইতে শব্দগুলিকে সহস্র যোজন দূরে নিয়া গিয়াছে। পশ্চিম-বাংলায় ওদের কথ্য রূপ 'খাইয়ে', 'পরিয়ে', 'বসিয়ে', 'পড়িয়ে', 'দাঁড়িয়ে', ইত্যাদি ইত্যাদি। না বলিয়া দিলে এদের পিতৃহু ঠাহর করিবার উপায় নাই।

শুধু তাই নয়। এইসব বিকৃতিতে সাধু শব্দ 'খাইয়া', 'পরিয়া', 'বসিয়া' প্রভৃতি শব্দকে উহাদের কথ্য রূপের সহিত গোল পাকাইয়া ভাষায় অনাবশ্যিক জটিলতা সৃষ্টি করা হইয়াছে। এর চেয়েও বাজীকরের উল্টা ডিগবাজী মারা হইয়াছে শুষ্ক ক্রিয়াপদে। 'পার হইয়া' 'পেরিয়ে' 'বাহির হইয়া' 'বেরিয়ে' ইত্যাদি বিকৃতির না আছে

## সাহিত্যের প্রাণ

কোনও যুক্তি না আছে কোনও আবশ্যিকতা। এই সব বিকৃতি শুধু ভাষার সার্বভ্যকে দুরূপনয় জটিলতায় ভারাক্রান্তই করে নাই, বিদেশী বাংলাশিক্ষার্থীর নাগালের বাইরে নিয়া গিয়াছে।

### আঞ্চলিক বিকৃতির পুরস্কার

এই সব বিকৃতি এবং এই ধরনের আরও হাজার বিকৃতি পশ্চিম-বাংলার আঞ্চলিক ক্রটি-বিদ্যুতি। আশালীন ভাষাগারিটি। পশ্চিম-বাংলার ভাষিক দুর্বলতা। সাধারণ অবস্থায় এই সব আশালীন ভাষাগারিটি সাহিত্যে স্থান পাইত না।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে পশ্চিম-বাংলার প্রাধান্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া এই সব ভাষাগারিটি সাহিত্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যে স্থান পাওয়ার ফলে এরা উদ্ভ্র, শালীন ও অভিজাত হইয়া উঠিয়াছে।

পঞ্চান্তরে ঐসব শব্দের সাধু রূপ রক্ষা করিয়া পূর্ব-বাংলা চোর বনিয়াছে। ক্রিয়াপদে পূর্ব-বাংলায় রূপান্তর যা ঘটিয়াছে, সেটা সাধু শব্দের খুবই কাছাকাছি। ‘খাইয়া’ ইত্যাদি ধ্বনির শব্দে হ্রস্ব ‘ই’ আরেককু হ্রস্ব হইয়াছে মাত্র। যুক্ত ক্রিয়াপদেও সে রূপান্তর শুধু ক্রিয়া অংশেই উপরোক্ত রকমের হ্রস্বতা লাভ করিয়াছে। মোট কথা, জোরের সংগেই একথা বলা যায়, পূর্ব-বাংলা ক্রিয়াপদেও সাধুতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব-বাংলার এই সাধুতা স্বাভাবিক কারণেই বাংলা সাহিত্যে স্থান পায় নাই। পায় নাই বলিয়া তারা অশালীন ভাষাগারিটি রহিয়া গিয়াছে। নব্য বাংলা সাহিত্যের বিচারে এইভাবে চোর হইয়াছে সাধু, আর সাধু হইয়াছে চোর।

যতদিন কলিকাতা আমাদের রাজধানী ছিল এবং সেজন্য বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল ততদিন আমরা পূর্ব-বাংলারীরাও এই অবিচার মানিয়া নিতাম অবস্থাগতিকে। আমরা নিজেদের লেখাতেও পূর্ব-বাংলার সাধুতাকে আশালীন ভাষাগারিটি বলিয়া বর্জন করিতাম।

আর পশ্চিম-বাংলার আশালীন বিকৃতিকে সাহিত্যের অলংকার রূপে অনুকরণ ও অনুসরণের চেষ্টা করিতাম। এটা না করিলে সাহিত্যিক-সমাজে স্থান হইত না। কাজেই অবস্থাগতিকেই আমাদের জন্য ছিল এই অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তা স্বাভাবিক।

অনুকরণ করি কেন ?

ইংরাজের আমলে অবিভক্ত ভারতে ইংরাজী শিখিতে ও বলিতে গিয়া আমরা ইংরাজের অভদ্র আশালীনও ভালগার বিকৃতি ও ক্রটি-বিদ্যুতিরও অনুকরণ করিতাম। তা না করিলে ইংরাজী শিক্ষা পারফেক্ট হইত না মনে করিতাম। এই অন্ধ অনুকরণ শুধু সাধু ইংরাজী শব্দের বিকৃত ইন্টোনেশনের অনুকরণেই সীমাবদ্ধ ছিল না। আমাদের নিজের দেশীয় শব্দে নিজেদের নামে শহর বন্দরের নামে ইংরাজের উচ্চারণ-ক্রটি স্বরভংগি ইন্টোনেশনে এমন কি তুল বানানে পর্যন্ত তাদের এইপিং অর্থাৎ বানরের মত অনুকরণ করিতাম। 'আহমদ'-কে 'আমেড', 'মোহাম্মদ'-কে 'মোহামেট', 'সাহা'-কে 'শ' 'মিত্র'-কে 'মিটার', 'ঠাকুর'-কে 'টেগোর' কলিকাতা'-কে 'ক্যালকাটা' এবং 'চাকা'-কে 'ডেক্সা' 'চাটগাঁও'-কে 'চিটাগাং বলিতাম ও লিখিতাম শুধু আমাদের তৎকালীন মুনিবদের অনুকরণ করিয়া 'ভদ্রলোক' হইবার আশায়।

আমরা বাংগালীরা ইংরাজের এবং আমরা পূর্ব-বাংগালীরা পশ্চিম-বাংগালীর বিকৃতির অনুকরণ করিতাম রাজনৈতিক অবস্থা বৈশ্বগ্যের ফলে। রাজনৈতিক প্রভাবের তারতম্য ছাড়াও লোকে ভাষার এই কথা বিকৃতির অনুকরণ করে যখন কেউ বিদেশী ভাষা শিখিতে চায়। কোনও বিদেশী লোক যদি ইংরাজী বা ফরাসী ভাষা শিখিতে চায় তবে সে শিক্ষার্থী শুধু লেখায় নয় কথাবার্তায়ও ঠিক ইংরাজ ফরাসীর মত ন্যাচারেল ভংগিতে বলিতে চেষ্টা করিবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

পঞ্চান্তরে একই ভাষাভাষী এক অঞ্চলের লোক অন্য অঞ্চলের ক্রটি-বিকৃতিকে কুমার বা কুপার চোখে দেখিবে, কিন্তু কদাচ অনুকরণ

করিবে না একমাত্র ক্যারিকেচার করার উদ্দেশ্য ছাড়া। ইংলণ্ডের ইংরাজ মার্কিন বিকৃতি, কিম্বা আমেরিকার মার্কিন ইংরাজের বিকৃতি কদাচ অনুকরণ করিবে না। তেমনি লাখনৌর উর্দু ভাষী দিল্লী বা লাহোরের উর্দু বিকৃতির অনুকরণ করিবে না। বিহারী হিন্দী ভাষী রাজপুতনার মাড়ওয়ানী হিন্দীর বিকৃতি অনুকরণ করিবে না। কেউ তা করে না।

কিন্তু আমরা পূর্ব-বাংলালীরা তা করি। আজো করি। পূর্ব-বাংলা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, পূর্ব-বাংলালী ভিন্ন নেশন হওয়ার পরেও করি। শুধু পশ্চিম-বাংলার বিকৃতি গ্রহণেই অনুকরণ করি না, পূর্ব-বাংলার সাধুতা বর্জনের ব্যাপারেও করি।

প্রাক-স্বাধীনতা আমলে কলিকাতায় বসিয়া আমরা যেমনভাবে পশ্চিম-বাংলার অঙ্ক অনুকরণ করিতাম এবং পূর্ব-বাংলার সাধুতাকে অশালীন ভাল্গারিটি বলিয়া বর্জন করিতাম, আজ ঢাকায় বসিয়াও তাই করিতেছি।

কেন করিতেছি? পুরাতন অভ্যাসের দোষে? যঁারা দীর্ঘ দিন কলিকাতায় বাস করিয়াছেন, কলিকাতার ভাষায় লিখিয়াছেন, ঐ ভাষায় কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁদের বেলায় না হয় অভ্যাসের শক্তিটা তর্কস্থলে মানিয়া নিলাম। কিন্তু কলিকাতা যঁারা চোখে দেখেন নাই, বাংলা ভাগ হওয়ার পর যঁাদের সাহিত্যে হাতেখড়ি হইয়াছে, তাঁদের বেলায় অভ্যাসের কথা উঠে কেমন করিয়া? তা ছাড়া অভ্যাসের শক্তিটা কোন শক্তিই নহ্ন। স্বকীয়তায় সচেতন আত্মমর্যাদাজ্ঞানী কোন লোকই এ শক্তি দিতে পারেন না।

### দুইটি অসার শক্তি

তা হইলে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকদের যঁারা এটা করেন, তাঁরা দুইটি কারণে তা করিয়া থাকেন। এক, তাঁরা মনে করেন

পশ্চিম-বাংলার কথা বাংলাই গোটা বাংলার একমাত্র সফিস্টিকেটেড্ স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা। দুই, পূর্ব-বাংলার নিজস্ব ঐরূপ কোন স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা নাই।

দ্বিতীয় যুক্তিটার আলোচনাই আগে করি। পূর্ব-বাংলার কোন স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা নাই এ কথা ঠিক না। তাঁদের কথার যেটুকু ঠিক তা এই যে সাহিত্যে স্বীকৃত কোনও স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা পূর্ব-বাংলার নাই। পূর্ব-বাংলার সুধী সমাজ যথা হাইকোর্টের জজ-ব্যারিস্টার ও উকিল-অফিসাররা, জিলা কোর্টের জজ-উকিল-মোখতার অফিসাররা, সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং-এর মন্ত্রী ও অফিসাররা, আইন-সভার মেম্বররা, বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যাপক-ছাত্র-অফিসাররা, শিল্প-বাণিজ্যের মালিক কর্মচারীরা, স্কুলসমূহের শিক্ষক আলেম-ওলামা ধর্ম প্রচারকরা সর্বোপরি সাহিত্যিক সাংবাদিকরা তাঁদের রোজকার আলাপ আলোচনায় যে ভাষায় কথা বলেন, সেইটাই পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য বাংলা।

পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জিলায় ও অঞ্চলে বিভিন্নরূপের কথ্য ভাষা আছে বলিয়াই এখানে কোনও স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা নাই, এটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। পশ্চিম-বাংলায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ডায়লেক্ট থাকা সত্ত্বেও কলিকাতার সুধীসমাজে যা হইয়াছে, আমাদের রাজধানীর বা বিভিন্ন শহরের সুধী সমাজেও তেমনি একটা কমন স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে।

দুর্ভাগ্য শুধু এই যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা আজো তাকে সাহিত্যে স্থান দেন নাই। এই স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড ভাষা এখনো ভালরূপে দানা বাঁধে নাই, অতএব সাহিত্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য এখনও হয় নাই, ক্রমে হইবে, এই যুক্তিও আমাদের সাহিত্যিকদের কাজে-কর্মে সমর্থিত হয় না।

পূর্ব-বাংলার নিজস্ব একটা স্ট্যাণ্ডার্ডাইম্‌ড কথ্য ভাষা হওয়া দরকার এটা যঁা্না মানেন তাঁরা এটাও নিশ্চয়ই মানেন যে সেটা গঠনের ও দানা

## সাহিত্যের প্রাণ

বাঁধাইবার প্রচেষ্টা সাহিত্যিকদেরই করিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ প্রচেষ্টা তারা করিয়া থাকিবেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থারূপে নিতান্ত আবশ্যিক-বোধে কলিকাতার প্রচলিত কথ্য ভাষাই ব্যবহার করিবেন। ইহাই আশা করা যায়।

### আসল কারণ কি ?

নিতান্ত আবশ্যিকের জ্ঞানগা কোন্-কোন্টা? তর্কস্থলে মানিয়া নিতেছি, সিনেমা-নাটকে পাত্র-পাত্রীদের মুখে গল্প-উপন্যাসের ডায়ালগে এটা আবশ্যিক। কিন্তু কার্যতঃ কলিকাতার কথ্য বাংলা আমাদের সাহিত্যের ঐ কয়টি জ্ঞানগাতেই সীমাবদ্ধ নাই। গল্প-উপন্যাসের গল্পকারের ভাষাতেও ঐ কথ্য বাংলা ঢুকিয়াছে।

আমাদের মাসিক-সাপ্তাহিক কাগজের আলোচনায়, আমাদের দৈনিক কাগজ সমূহের ম্যাগাজিন সেকশনে, কোন-কোন খবরের কাগজের সম্পাদকীয় ও সংবাদ পরিবেশনেও কলিকাতার কথ্য ভাষা ঢুকিয়াছে। এমন কি সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ধর্ম কৃষ্টি ইত্যাদি গুরু-গভীর বিষয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধেও কলিকাতার কথ্য বাংলার প্রয়োগ চলিয়াছে।

কথ্য ভাষায় না লিখিলে প্রবন্ধ-নিবন্ধ সহজ সরল ও প্রাজ্ঞ হয় না, নিশ্চয়ই কেউ এ কথা বলিবেন না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক, ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের দার্শনিক ও ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক প্রবন্ধগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এর সবগুলিই সহজ সরল লেখ্য বা সাধু বাংলায় লেখা। গল্প-উপন্যাসে গল্পকারের ভাষাকেও কথ্য বাংলা না করিলে ভাল গল্প-উপন্যাস হয় না, একথাও ঠিক নয়। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প-উপন্যাসগুলিতে গল্পকারের ভাষা লেখ্য সাধু বাংলা। এমনকি তারানন্দ্রের মত আধুনিক ও পপুলার উপন্যাসিকের অনেকগুলি বই-এও এই নিয়ম মানা হইয়াছে।

তবু যে পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকরা ও গল্পকাররা অনাবশ্যকভাবে পশ্চিম-বাংলার কথা ভাষা চালাইয়াছেন, সেটা পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড-ইন্ড কথ্য বাংলার অভাবে নয়, অন্য কারণে ।

### গোলাম্বি মনোভাব

এইখানেই প্রথম যুক্তিটি আসিয়া পড়ে । এই যুক্তিদাতারা বলেন, যাকে পশ্চিম-বাংলার বা কলিকাতার কথ্য ভাষা বলা হয়, এটা আসলে সারা বাংলার কথা বাংলা । উভয় বাংলার লেখকদের এটা সাধারণ কমন ভাষা । এটা পূর্ব-বাংলায় সকলেই বুঝিতে পারে । খুলনা যশোর কুষ্টিয়া ইত্যাদি জিলার লোকেরা বলিতেও পারে । সুতরাং এটাকে শুধু পশ্চিম-বাংলার ভাষা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না । এ ভাষা আমাদেরও । এ অবস্থায় এই ঐতিহ্যবান প্রচলিত ভাষা ত্যাগ করিয়া নতুনভাবে পূর্ব-বাংলার একটা স্ট্যাণ্ডার্ড-ইন্ড কথ্য বাংলা গড়িয়া তোলার দরকারও নাই, সম্ভবও নয় ।

এই আলোচনায় উপরে আমি যে সব কথা আগেই বলিয়াছি তার মধ্যেই এই যুক্তির জবাব আছে । তার বাদেও এই যুক্তিতে যে কয়টি কথা আছে এখানে আমি তারই আলোচনা করিব ।

এ কথা ঠিক যে আজ ত্রিশ বছর ধরিয়া বাংলা সাহিত্যে কলিকাতার কথ্য বাংলা চালু আছে বলিয়া এর একটা জনপ্রিয়তা আছে । এ কথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মত মনীষীরা এই ভাষায় লিখিয়াছেন বলিয়া এর একটা মর্যাদাবান ঐতিহ্য আছে । এ কথাও ঠিক যে পূর্ব-বাংলার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এ ভাষায় অভিনয়ও করিতে পারেন । এটাও মানিয়া নিলাম যে পূর্ব-বাংলার পাঠক ও শ্রোতা-দর্শকরা এ ভাষা বুঝিতেও পারে ।

কিন্তু এসব কি পূর্ব-বাংলার নিজস্ব কথ্য বাংলা ভাষা থাকার বিরোধী যুক্তি ? আমরা পশ্চিম-বাংলার ভাষায় লিখিতে ও ঐ ভাষা



বুঝিতে পারি বলিয়াই কি আমাদের নিজস্ব ভাষার আবশ্যিকতা নাই। পূর্ব-বাংলার বহু লোক উর্দু ভাষা লিখিতে-পড়িতে পারেন। বুঝিতেও পারেন অনেকে। তবু আমরা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করিবার দাবি করিয়াছিলাম কেন? কেন আমাদের ছাত্র-তরুণরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জান ক়োরবানি করিয়াছিল? তারা কি জান দিয়াছিল পশ্চিম-বাংলার বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য?

মনে রাখা দরকার, পশ্চিম-বাংগালীরা তাদের মাতৃভাষাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিতে জানও দেয় নাই, হয়ও নাই ওটা তাদের রাষ্ট্রভাষা। আমাদের তরুণরা যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দাবিতে জান দিয়াছিল, এবং যে বাংলাকে সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিয়াছেন, সেটা পূর্ব-বাংগালীর নিজস্ব বাংলা। যে বাংলায় সে কথা বলে ও চিন্তা করে সেই বাংলা। এটা প্রয়োজন জাতির স্বকীয়তা বিকাশের জন্য। শুধু কতিপয় লেখকের লেখার জন্য, কতিপয় অভিনেতার অভিনয়ের জন্য বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার দরকার ছিল না। ইংরেজী ও উর্দুতেও অনেকে লিখিতে এবং অভিনয় করিতে পারেন এবং পারিতেছেনও। দেশবাসী তা বুঝিতেও পারে এবং পারিতেছেও।

### অশুকরণের কুফল

কাজেই বিষয়টা কতিপয় লেখক-অভিনেতার ব্যক্তিগত প্রস্ন নয়। প্রস্নটা জাতির। গোটা-দেশের। দেশের জনগণের। গোটা জাতির কৃষ্টি ও স্বকীয়তার। মোটকথা, স্বাধীন সত্তাবিশিষ্ট আত্মমর্যাদাবান জাতি হিসাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকার বিকাশলাভের ও উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রস্ন এটা। এ প্রস্নকে রূপ হালকাভাবে নিলে এবং প্রচলিত প্রথার গড্ডালিকায় নিজেদেরে ভাসাইয়া দিলে কি অশুভ পরিণাম হইবে, সংক্ষেপে এখানে সেদিকে আমাদের সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলাকে আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখন্য চালু করিলেও উহা পূর্ব-বাংলার কথ্য বাংলা হইবে না। কারণ পূর্ব-বাংলায় পশ্চিম-বাংলার ধ্বনি মাত্র স্বরভংগি ইন্টোনেশন রফত করিতে পারিবে না। পারা সম্ভবও নয়, তার দরকারও নাই। স্বরভংগি ও ইন্টোনেশনের ব্যাপারটা ভৌগোলিক, সুতরাং প্রাকৃতিক। এটা শৈশবে মায়ের কাছে, কৈশোরে সমাজে ও স্কুলে শিক্ষা হয়। পরে হয় না।

সেই কারণেই আমাদের লেখকদের স্বারা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা ছাড়া আর কিছুই লেখেন না, তাঁরা নিজেরাই সে ভাষার কথা বলিতে পারেন না। চেষ্টা যা করেন সেটা হয় ক্যারিকচার মাত্র। এইজন্য আমাদের নাট্যশিল্পী ও রেডিও শিল্পীদের অনেকদিন ধরিয়া ইন্টোনেশনের ট্রেনিং দিতে হয়।

এই জন্যই আমাদের রেডিওর বাংলা নিউয-বুলেটিন-পাঠক নিয়োগ করার সময় পশ্চিম-বাংলার লোক খুঁজিতে হয়। এটা স্বাভাবিক। যে ভাষা বজেন স্বরভংগি ও ইন্টোনেশনে সেই ভাষা-ভাষীকেই অনুকরণ করিতে হয়। নইলে বলাটা ন্যাচারেল হয় না।

আমাদের রেডিওর ইংরাজী নিউয-বুলেটিন-পাঠক নিয়োগের বেলায়ও তাই। হয় খাঁটি ইংরাজ নিয়োগ করিতে হয়, নয় ত এমন পাকিস্তানী খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যিনি দীর্ঘদিন বিলাতে থাকার দরুন অথবা ইংরাজ প্রাইভেট টিউটর রাখিয়া রফত করার দরুন ইংরাজের ইন্টোনেশনে ইংরাজী বলিতে পারেন।

### জিহ্ব ও কলমের ভিন্ন গতি

কিন্তু এঁরা মুষ্টিমেয়। এঁরা সমাজের সাধারণ লোক নন। ব্যতিক্রম মাত্র। এঁরা অভিনেতা মাত্র, শ্রোতা বা দর্শক এঁরা নন। অভিনয়ের স্টেজ হইতে নামিয়াই এঁরা স্বাভাবিক সুরে কথা বলেন।

## সাহিত্যের প্রাণ

যেমন আমাদের লেখকরা লেখেন পশ্চিম-বাংলার ভাষায় ; কিন্তু কথা বলেন দেশী ভাষায় । এটাই স্বাভাবিক । এটা বৈজ্ঞানিক । প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের বিরোধিতা করা অসম্ভব ।

কিছুকাল এইভাবে চলিলে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা আমাদের জ্যেষ্ঠ বাংলা হইয়া যাইবে । তাতে কালক্রমে অন্ততঃ সাহিত্যিক-লেখকদের কাছে পূর্ব-বাংলা হইতে সাধু বাংলা উঠিয়া যাইবে । সাধু বাংলার স্থান দখল করিবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা ।

রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে অবিলম্বে আমাদের সরকারী ফাইল-পত্রের ভাষা শিক্ষার মাধ্যম ও আইন পরিষদের ভাষা করিবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই গণদাবি উঠিয়াছে । শীঘ্রই তা হইবেও । এ ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীরা অধ্যাপকরা ও আইন-রচয়িতারা কি করিবেন ?

স্বভাবতঃই তাঁরা প্রেরণার জন্য লেখক-সাহিত্যিকদের দিকে চাহিবেন । এঁরাই ভাষার স্বাভাবিক অথরিটি । সুতরাং অনতিবিলম্বে রেডিও পাকিস্তানের মতই সকল সরকারী দফতরের, আইন সভার প্রসিডিং-এর এবং স্কুল-কলেজ-বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমের ও পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হইয়া উঠিবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা ।

সম্প্রতি আমাদের একটি বাংলা কলেজ হইয়াছে । সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয় বাংলাতে শিখানোই এই কলেজের মহান উদ্দেশ্য । সাহিত্যিক-লেখকদের ভারের চাপে এখানকার শিক্ষা-কার্যও চলিবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় । তাতে দোষ কি ? দোষ আর কিছুই না । কাগজে-পত্রে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলাই মোটামুটি স্কন্ধভাবে লেখা হইবে । কিন্তু পড়িবার ও বলিবার সময় কেউ তা পশ্চিম-বাংলার ইন্টোনেশনে পড়িতে বা বলিতে পারিবে না ।

## গণ-বিরোধী রাষ্ট্রভাষা

ফলে সাহিত্যের, সরকারী দফতরের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেখা ভাষা হইবে আমাদের জনগণের কথ্য ভাষা হইতে পৃথক । সাহিত্যকে

গণমুখী করিবার যে উদ্দেশ্যে জনগণের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল, যে উদ্দেশ্যে কথ্য বাংলাকে সাধু বাংলার স্থলবর্তী করা হইয়াছিল এবং পশ্চিম-বাংলায় সাহিত্যের ভাষা ও জনগণের ভাষাকে এক করিয়া যে উদ্দেশ্যে সফল হইয়াছে, পূর্ব বাংলায় সেই মহান উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে।

পশ্চিম-বাংলায় যেখানে সাহিত্য ও জনগণের একটিমাত্র ভাষা, সেখানে পূর্ব-বাংলায় হইবে তিনটি ভাষা : একটি সাধু লেখ্য বাংলা, দ্বিতীয়টি পশ্চিম-বাংলার কথ্য আমাদের লেখ্য বাংলা, তৃতীয়টি আমাদের কথ্য বাংলা। পাঠ্য-পুস্তকেও এর ক্রিয়া হইবে।

ভাষার এই ত্রিভিতি বা ত্রিমুতি পূর্ব-বাংলার জাতীয় আত্মমর্যাদা-বোধের, কৃষ্টি-সভ্যতা বিকাশের, এমনকি জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে হইবে মারাত্মক। যে ভাষায় লেখে সে ভাষায় কথা বলে না বা বলিতে পারে না এটা কোন সভ্যদেশের নাগরিকের পক্ষেই মর্যাদার কথা নয়। যে ভাষায় কথা বলে সেটা সাহিত্যে বা রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহারের যোগ্য নয়, সে জন্য অন্য দেশের কথ্য ভাষার আমদানি করিতে হয়, এটাও কোন সভ্য ও কৃষ্টিবান জাতির পক্ষেই গৌরবের কথা নয়।

সর্বোপরি, পূর্ব-বাংলায় উন্নত সাহিত্য গড়িয়া উঠার পক্ষেও এটা হইবে ঘোরতর প্রতিবন্ধক। কারণ, পরের ভাষায় কখনো উন্নত সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। অনুকারী বা ক্যারিকেচারিস্ট কখনো মৌলিক আর্ট সৃষ্টি করিতে পারে না। এ বিষয়ে মার্কিন চিন্তানায়ক ইমার্সন এবং বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী বিলাতের সমারসেট মমের কথাটা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা উভয়েই বলিয়াছেন, পরের ভাষায় ও অনুকরণে অরিজিন্যাল আর্ট সৃষ্টি কখনো হয় না।

হইতে যে পারে না আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা নিজেদের জীবনেই তা টের পাইতেছেন। পনের বছরেও পূর্ব-বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি অতি নগণ্য। সামান্য যা কিছু হইয়াছে, তাও নাকি চলে না।

## সাহিত্যের প্রাণ

লেখক-প্রকাশক-বিক্রেতা সবারই অভিযোগ পাঠকরা পশ্চিম-বাংলার বই-পুস্তকে ঝুঁকিয়া পড়ে, পূর্ব-বাংলার বই-পুস্তক অবিক্রীত পড়িয়া থাকে।

বই-পুস্তক সম্বন্ধে যা, সিনেমা সম্বন্ধেও তাই সত্য। বাংলা বই চলে না বলিয়া প্রযোজকরা উর্দু বই প্রযোজনায় মন দিয়াছেন। সিনেমা ম্যাগামিনে দৈনিক কাগষের সিনেমা পেজে লেখক-সমালোচক ও অভিনেতারা এজন্য প্রযোজকদের দোষ দিতেছেন।

কিন্তু দোষ প্রযোজকদের নয়, পাঠক-শ্রোতাদেরও নয়। দোষ লেখক-সাহিত্যিকদের। তাঁরা যে ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন, মিস স্টেইনের কথায় সে ভাষা পূর্ব-বাংলার মাঠে-বন্দরে খেলিয়া বেড়ায় না। সে ভাষায় চিত্রিত পাত্র-পাত্রীর সাথে দর্শক-পাঠকের কোনও আত্মীয়তা নাই।

তাদের কাছে কলিকাতায় রচিত বই-সিনেমাও বিদেশী, ঢাকায় রচিত বই-সিনেমাও বিদেশী। বেশ-কম শুধু এই যে, একটা আসল অপরটা নকল। নকল ফেলিয়া লোকে আসলটা ধরবে, এতে আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

## দুইটা প্রতিদ্বন্দ্বী

কৃষ্টি ও সাহিত্যের ব্যাপারে পূর্ব-বাংলার ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি। একটি উর্দু, অপরটি কলিকাতার বাংলা। দুইটাই অসামান্য শক্তিশালী। উর্দুর পিছনে রাষ্ট্রশক্তি হালী-ইকবালের কলম ও ধর্মের আবেদন আছে। আর কলিকাতার বাংলার পিছনে আছে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র নজরুল ইসলামের কলম ও র্যাশিয়াল আবেদন।

এই দুইটার একটার সাথেও আমরা লড়াই করিতে চাই না। আমরা চাই শুধু আমাদের স্বকীয়তা। এখানে ইমারসনের মহাবাক্য আমাদের কাছে লাগবে। তিনি বলিয়াছেন : ইংলণ্ডের ইংরাজীর সাথে আমাদের শত্রুতা নাই। আমাদের বিলাতী মুরুব্বিদের প্রতি,

আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আমরা অশ্রদ্ধা দেখাইতেছি না। আমরা শুধু চাই আমাদের স্বকীয়তা। আমরা শুধু বাঁচিতে চাই।

আমরা যদি নিজস্ব কৃষ্টি ও সাহিত্য সৃষ্টি না করি, তবে বাংলা ভাষার জন্য আমাদের ছাত্র-তরুণদের আত্মদান ব্যর্থ হইবে। নিজস্ব সাহিত্যের অভাবে আমাদের জাতীয় ও কৃষ্টি-জীবনে ভ্যাকুয়াম আসিবে। ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি করিতে হয় না। ওটা আপনা-আপনি ঘটে। কিছু না করিলেই শূন্যতা হয়। অন্যান্য বস্তু মতই মানব-মনও ভ্যাকুয়াম সহ্য করে না। কাজেই নিজস্ব না থাকিলে পরস্বই সে ভ্যাকুয়াম পূর্ণ করে। নিজস্ব সাহিত্যের অভাবে পূর্ব-বাংলা হইয়া উঠিবে উর্দু ও কলিকাতার বাংলার মুদ্র-ক্ষেত্র। পূর্ব-বাংলার জাতীয় ও কৃষ্টি-জীবনের বিকাশের পথে সেটা হইবে উন্নয়নক প্রতিবন্ধক। তাতে আমাদের কৃষ্টিক মুক্তির দিন পিছাইয়া যাইবে।

আমাদের চিন্তাবিদ সাহিত্যিকরা যথাসময়ে হুঁশিয়ার হইলে এ বিপদ আমরা কাটাইতে পারিব। উপরোক্ত দুইটা প্রবল প্রতিবন্ধক আমাদের সাংস্কৃতিক আত্মাদি ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না। পাকিস্তান সংগ্রামেও এমনি দুইটা প্রবল প্রতিবন্ধক আমাদের সামনে ছিল : একদিকে ছিল বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী, অপরদিকে ছিল অসামান্য প্রভাবশালী হিন্দু ফিউডাল অলিগার্কি। জনগণ ও সুধী সমাজের সংকল্পের সামনে অমন 'বাধার বিঘ্নাচল'ও উড়িয়া গিয়াছিল।

### আমাদের কর্তব্য

কি করিতে হইবে আমাদের তবে? কর্তব্য আমাদের অতি সুস্পষ্ট। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ডাইন্ড কথা ভাষাকে তাঁদের সাহিত্যে স্থান দিবেন। কথ্য ভাষা মানে কোনও জিলা বা অঞ্চলের অবিকল ডায়ালেক্ট নয়। যে সফিস্টিকেটেড বাংলায় আমাদের রাজধানী ও অন্যান্য শহর-নগরের সুধীসমাজ কথা বলেন,

## সাহিত্যের প্রাণ

যে ভাষায় বঙ্গুতা করিয়া আমাদের বিগত ও বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা যুগে-যুগে বিভিন্ন আন্দোলন করিয়া আসিয়াছেন, যে ভাষায় আমাদের আলেম-সমাজ যুগ যুগ ধরিয়া ওয়ায-নসিহত খোতবা পাঠ ও ধর্ম প্রচার করিয়া আসিতেছেন, যে ভাষায় পল্লী অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষক-অধ্যাপক ও জমিদার-তালুকদাররা শতাব্দী কাল ধরিয়া কথা বলিয়া আসিয়াছেন, সেইটাই পূর্ব-বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড কথ্য বাংলা ভাষা।

এটা অভদ্র অশালীন ও ভালগার ভাষা নয়। এ ভাষাকে অভদ্র ভাষা বলিলে আমাদের যুগ-যুগের জন-নেতা আলেম পণ্ডিত জমিদার-তালুকদার জজ-হাকিম উকিল-মোখতার সবাইকে অভদ্র বলিতে হয়। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই তা বলেন না। তাঁদের মুখের ভাষাকে সাহিত্যে স্থান না দেওয়ার অর্থ কিন্তু তাই।

আমাদের নিজস্ব সুধী সমাজের সাথে আজ যোগ দিয়াছেন বহিরাগত দুইটি সুধী সমাজ। একদিকে পশ্চিম-বাংলার পঞ্চাশ লাখ মুসলমান পূর্ব-বাংলায় আসিয়াছেন। তাঁদের অধিকাংশই শিক্ষিত। আমাদের রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁরা প্রভাবশালী পদে ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। এঁদের মুখের ভাষা পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা। অপরদিকে বিহার যুক্ত-প্রদেশ হইতে বহু মুসলমান আসিয়াছেন। পূর্ব-বাংলাকে এঁরা স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এঁদের মুখের ভাষা উর্দু।

কাজেই আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ডাইজড কথ্য বাংলা হইবে এই তিনের ভাষার একটা খিচুড়ি। হটক, তাতে দোষ নাই। ভাষা মাত্রই খিচুড়ি। কথ্য ভাষা ত বটেই। এটাই হইবে আমাদের রাজধানীর ঢাকাইয়া বাংলা। কলিকাতাইয়া বাংলার স্থানে এটাই হইবে আমাদের গল্প-উপন্যাস ও স্টেজ-সিনেমার ডায়ালগের ভাষা।

এই ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা সাহিত্যে দানা বাঁধিবার আগে পর্যন্ত, এমনকি পরেও, একটা সাধারণ নিয়ম আমাদের সাহিত্যিকদের মানিয়া চলিতে হইবে। সেটা এই :

(ক) প্রবন্ধে-নিবন্ধে তাঁরা সর্বদাই সহজ সাধু বা লেখ্য ভাষা ব্যবহার করিবেন। লেখকেরা মনে রাখিবেন, সাধু ভাষা মানে কঠিন ভাষা নয়। শুধু ক্রিয়াপদটা কথ্য করিলেই ভাষাটা সহজ হয় না। ঠিক তেমনি, শুধু ক্রিয়াপদটা কথ্য না করিলেই ভাষা কঠিন হয় না।

(খ) গল্পকার ও ঔপন্যাসিকরা তাঁদের গল্প-উপন্যাসে গল্পকারের ভাষা সাধু রাখিবেন। শুধু পাত্র-পাত্রীর ভাষা কথ্য করিবেন। পাত্র-পাত্রীর শ্রেণীভেদে কথ্য বাংলার রূপও ভিন্ন হইতে পারে। গল্পের চরিত্রের মধ্যে যারা পশ্চিম-বাংলার মোহাজের তাঁদের মুখে পশ্চিম-বাংলার কথ্য বাংলা এবং যারা মুক্তপ্রদেশ-বিহারের মোহাজের তাঁদের মুখে সহজ উর্দু দিলে গল্প-নাটক স্বাভাবিকও হইবে, শ্রোতা-দর্শক-পাঠকদের বুঝিবারও সুবিধা হইবে।

বাংলা একাডেমীর এ ব্যাপারে অনেক করণীয় আছে। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেরও দায়িত্ব কম নয়। এঁরা সকলে একত্রে বা পৃথক-পৃথক সেমিনারের আয়োজন করিলে এ-বিষয়ে শীঘ্র পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে। সে পথ তাঁদের বাহির করিতেই হইবে। এ দায়িত্ব মূলতঃ তাঁদেরই।

২৪শে মাঘ

১৩৬৯ সন।



# ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা



## কেন মাতৃভাষা ?

একইশা ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে শুধুমাত্র ভাষা আন্দোলন বলিলে তুল হইবে। ব্যাপারটাকে ছোট করা হইবে। তাতে এর স্থূল রূপটাই শুধু দেখা হইবে। অন্তর্নিহিত বাণীটা উপেক্ষিত হইবে।

পরের ভাষার বদলে নিজের মাতৃ-ভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা করার দাবিতেই শহীদরা প্রাণ দিয়াছে, এটা এর প্রত্যক্ষ ও বাহিরের দিক মাত্র। এর অমর মর্মবাণী শাস্ত্রত সত্য ও চিরঞ্জীব গসপেল আসলে জাতীয় স্বকীয়তার বাণী।

স্বাধীন দেশ পাইলেই মানুষ আশাদ হয় না। স্বকীয়তা হাসিলের দ্বারা আশাদ হইতে হয়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি অস্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদীর কবল হইতে মুক্ত স্বাধীন ও সশ্ৰমিত ইটালি স্থাপন করিয়া গ্যারিবল্ডি বলিয়াছিলেন : ‘আমরা ইটালি সৃষ্টি করিয়াছি, এখন আমাদের কাজ ইটালিয়ান সৃষ্টি করা।’

ঐক একশ’ বছর পরে বিশ শতকের মাঝামাঝি ঢাকার ছাত্র-তরুণরা গ্যারিবল্ডির ভাষায় বলিয়াছে : ‘পাঁচ বছর আগে আমরা পাকিস্তান বানাইয়াছি, আজ আমরা পাকিস্তানী বানাইতেছি।’ এটা ছিল নূতন জাতির নয়া যিন্দেগির চিরন্তন ফুকর। গুলির আওয়াজে সে অবভেদী ফুকর স্তব্ব করিতে চাহিয়াছিল যারা তারা মুর্খ।

মাতৃ-ভাষার দাবি এই স্বকীয়তার গোড়ার কথা। ভাষার ইংরাজী টাং, ফারসী যবান, আরবী লিসান, জার্মানী যুংগে, ল্যাটিন ডিংগুয়া সবেদরই অর্থ জিভ। মানুষের ভাব প্রকাশের মিডিয়াম জিভ ছাড়াইয়া কবে কলম তুলি টাইপ মেশিনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তবু ভাষার নাম আজও জিভ রহিয়া গিয়াছে। মায়ের মুখ হইতে কথা বলা শিখিবার পর মানুষ কত পণ্ডিতের কাছে পণ্ডিতি ভাষা শিখিয়াছে। তবু সে ভাষার নাম রহিয়া গিয়াছে মাতৃভাষা।

মনে রাখিবেন মাতৃভাষা, পিতৃভাষা নয়। কারণ এটা বিবরণ নয় প্রতীক, এটা ডিসক্রিপশন নয় সিম্বল। এটা নাড়ির যোগের কথা, বাহিরের সম্পর্কের কথা নয়। মানুষের নাড়ির যোগ মায়ের সাথে, বাপের সাথে নয়। মা এখানে জাতির মা, ব্যক্তির মা নয়। মাতৃভাষা এখানে জাতির মাতৃভাষা, ব্যক্তির মাতৃভাষা নয়। ব্যক্তির জীবনে মাতৃভাষার গুরুত্ব তেমন বেশী নয়। ব্যক্তি মায়ের ভাষা ভুলিতে পারে, পরের ভাষায় পণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু জাতি তা পারে না।

### জাতির ব্যক্তিত্ব

কিন্তু জাতিরও একটা ব্যক্তিত্ব একটা পার্সনালিটি আছে। মুখের কথা যেমন ইনডিভিডুয়েল পার্সনালিটির সবটুকু নয়, মাতৃভাষাও তেমনি ন্যাশনাল পার্সনালিটির সবটুকু নয়। মাতৃভাষার প্রভাব পরিধি ও তাৎপর্য ব্যক্তির জীবনের মতই জাতির জীবনেও সবচেয়ে বেশী। তবু কিন্তু ভাষার মধ্যেই জাতির ব্যক্তিত্ব সীমিত নয়। শিক্ষা-সভ্যতা ধর্ম-নীতি শিল্প-সাহিত্য খোরাক-পোশাক প্রথা-সংস্কার এ সবার মধ্যে সে ব্যক্তি পরিব্যাপ্ত।

এক কথায় ব্যক্তির যা পার্সনালিটি জাতির তাই কালচার। কালচারই জাতির ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব তার স্বকীয়তা। এই স্বকীয়তারই মূল সূত্র, ফাস্ট প্রিন্সিপল, মাতৃভাষা। অতএব পূর্ব-বাংগালী স্বাধীন রাষ্ট্রের মালিক হইয়া যেদিন মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রের ভাষা করিবার দাবি তুলিয়াছিল, যে দাবির স্পিয়ারহেড রূপে ছাত্র-তরুণসমাজ জ্ঞান কোরবানি করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল, সেটা মুখ্যতঃ আমাদের নিজস্ব ভাষার দাবি ছিল বটে, কিন্তু মূলতঃ ইহা ছিল আমাদের জাতীয় স্বকীয়তার দাবি। দৃশ্যতঃ সে দাবি ছিল : আমাদের রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালিত হইবে আমাদেরই মাতৃভাষায়। তার মানে কি ?

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

রাষ্ট্রীয় সত্তা আজ দুনিয়ার সর্বত্রই জাতীয় সত্তার পনর আনা । আমাদেরও তাই । কাজেই ও-দাবির অর্থ এও ছিল যে, আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্প-বাণিজ্য প্রচার-প্রপাগ্যান্ডা যান-বাহন আর্ট-সাহিত্য আমোদ-প্রমোদ সবই চলবে আমাদের মাতৃভাষায় । ও দাবির মানে অতএব এও ছিল যে, খোরাকে-পোশাকে চলে-চলনে খেলা-ধুলায় আচার-আচরণে আমরা পুরাপুরি 'আমরা' হইব ।

### আমরা কে ?

এই আমরা মানে সমাজের উপর-তলার কতিপয় নয় । এ আমরা গোটা জাতি । এই গোটা জাতির জনগণ একদিকে রাষ্ট্রীয় হক-হকুক ভিক্ষা চাহিতে যেমন রাষ্ট্রের প্রাসাদের দুয়ারে আসিবে না স্বয়ং রাষ্ট্রই যেমন যাইবে জনগণের কুটির দুয়ারে, তেমনি সে জনগণ 'জ্ঞানের তাল্লাসে সুদূর চীন দেশ' ত নয়ই জ্ঞানীর বিদ্যায়তনেও যাইবে না । স্বয়ং জ্ঞানীরাই জ্ঞানের খাঞ্চা মাথায় করিয়া যাইবেন জনগণের আংগিনায় ।

এমনি করিয়া রাষ্ট্র বিদেশী ধূপদুরুস্ত পোশাক ও শরাকৃতির চং ছাড়িয়া শাসকের উচ্চ আসন হইতে পথের ধুলান্ন জনগণের মধ্যে নামিয়া আসিবে । জনগণের ভাষায় তাদের সাথে কথা বলিবে । এমনি-ভাবে আমাদের রাষ্ট্রকে এবং সেই সংগে তার সর্বাংগীন সত্তাকে পূর্ব-পাকিস্তানী হইতে হইবে ।

### দেশ-প্রেমের অর্থ

একবার কল্পনা করুন আমাদের সর্বাংগীন জাতীয় সত্তার এই পূর্ব-পাকিস্তানী রূপ । এর কোন্ রূপে আমরা কুৎসিত ? কোন্ গুণে আমরা হীন ? কোন্ সম্পদে আমরা দরিদ্র ? বীরত্ব-মহত্ব সত্যতা-সংস্কৃতি ভাষা-সাহিত্য ইতিহাস-ঐতিহ্য শিল্প-বাণিজ্য কোন্টায় আমরা

গৌরবান্বিত ছিলাম না? দুইশ' বছরের গোলামি জীবনের উপেক্ষা-অবহেলায় তার সবগুলিই আবর্জনায চাপা পড়িয়াছে সত্য। কোন-কোনটায় মরিচা ধরিয়াছে তাও ঠিক। কিন্তু আজিকার আযাদির প্রথর আলোকে স্বকীয়তার উদ্দীপনার আশুনে আত্মবিকাশের অনুপ্রেরণার উদ্দীপ্ত জ্যোতিতে সে-সব আবর্জনাশূন্য কি জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে না? সাধনার অগ্নিশিখায় সে মরিচা পুড়িয়া খাঁটিত্বের ঔজ্জ্বল্যে আমাদের সত্তা ঝলমল করিয়া উঠিবে না কি? আধুনিক-তার স্পর্শে সে সত্তা কি হইয়া উঠিবে না দীপ্যমান? নিশ্চয়ই হইবে, আলবৎ হইবে। চাই শুধু আত্ম-মর্যাদা-বোধ ও আত্মবিশ্বাসের অন্তর-ভেদী রঞ্জন রশ্মি।

এটা পাইতে হইলে আমাদের সুখী সমাজকে মনে-প্রাণে পূর্ব-পাকিস্তানী হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার নদী-নালা চান-সুরুজ আস-মান-জমিন ও তরুণতার রূপে মাতোয়ারা হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার চাষীর সুরে নদীর ডাকে পাখীর গানে মোহিত হইতে হইবে। পূর্ব-বাংলার ভাষায় কথা বলিতে হইবে। চিন্তা করিতে হইবে। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ করিতে হইবে। সাহিত্য ও সংগীত রচনা ও সাধনা করিতে হইবে। তবে না আমি পূর্ব-বাংলা হইব? তবে না আমি মায়ের ধন্য সন্তান হইব? তবে না মা আমার মহিয়সী-গরিয়সী মা হইবে? আমার মা কুরূপা কাংগালিনী? আমার মায়ের ভাষা অসভ্য অশালীন? তাই বলিয়া পরের রূপসী সুবাসিনী মাকে মা বলিব? তাই বলিয়া আমার অশালীন মাতৃভাষা ছাড়িয়া অপরের শালীন ভাষাকে নিজের মায়ের ভাষা বলিয়া চালাইব?

এমন আত্মবঞ্চনার জন্য আমাদের ছাত্র-তরুণরা জীবন কোরবানি দেয় নাই। আমরা যদি মূর্খ হই, তবে নিজেরাই আমরা জানী হইবার চেষ্টা করিব। পরের জ্ঞান ধার করিয়া জানীর অভিনয় করিব না। দেশ যদি আমাদের শিল্প-বাণিজ্যে অনুন্নত হয় তবে

তাকেই নিজ হাতে শিল্পান্বিত করিব। তাকে পরের শিল্পের বাজার করিয়া রাখিব না।

ঠিক তেমনি আমার মাতৃভাষা যদি রাষ্ট্র ও সাহিত্যের অনুপযোগী অশালীন ভাষা হয়, তবে তাকেই রাষ্ট্র ও সাহিত্যের উপযোগী করিব। কারণ ওটা যে আমারই মায়ের ভাষা। আমরা নিজেরা সভ্যতার দাবি করিব, অথচ নিজের মায়ের ভাষাকে অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিহার করিব, এমন হইতে পারে না।

আমাদের গায়ের পোশাক যদি যুগোপযোগী সুন্দর না হয় তবে কাটিয়া-ছাটিয়া তাকেই সমন্বয়যোগী রুচিসম্মত সুন্দর করিয়া লইব। পরের পোশাক পরিয়া বাবু সভ্য হইবার ফাঁকা বাহাদুরি করিব না।

আমাদের সামাজিক রীতি-নীতিতে আচার-অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদে যদি কোন ক্রটি থাকে, তবে তার সংস্কার-সংশোধন করিয়া আধুনিক রুচিমাফিক করিয়া লইব। তবু পরের আচার অনুষ্ঠানের অন্ধ অনুকরণ করিব না। সবকেই নিজের করিয়া লইব। নিজেকে পরের করিব না। এটা স্বিদের ব্যাপার নয়। পরহিংসার কথাও নয়। সংস্কার-বিরোধী স্ববিরতাও নয়। এটা স্বকীয়তার কথা। আত্ম-মর্যাদা-জ্ঞান ও জাতীয়তা-বোধের কথা। নিজেকে চিনিবার কথা। নিজেকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্জীবিত করার কথা।

### আমাদের ব্যর্থতা

আমরা একইশা ক্ষেত্রমারির শহীদানের আত্মত্যাগের ও মাতৃ-ভাষাকে রাষ্ট্র-ভাষা করিবার দাবির অন্তর্নিহিত বাণীর তাৎপর্য বুঝিতে ব্যর্থ হইয়াছি এইখানেই। এটা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয়তার বৈশিষ্ট্যের ভিতরকার পার্থক্যের সূক্ষ্মতার কথা। জাতিতে-জাতিতে ও মানুষ-মানুষে অনৈক্যের চেয়ে ঐক্য, পার্থক্যের চেয়ে সাদৃশ্য, ভিন্নতার চেয়ে সামঞ্জস্য হাজার গুণ বেশী।

তবু ঐ সামান্য অনৈক্য পার্থক্য ও বিভিন্নতাই জাতি এবং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্য লইয়াই তারা গৌরব করে। কারণ ঐটুকুই তাদের পরিচয়। এই স্বকীয়তা এই স্বাভাবিকতা এবং এই বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য চাই অবাধ সুযোগ ও অধিকার। এই অবাধ সুযোগের জন্যই দরকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্বাধীনতা। এই দরকার পূরণের উদ্দেশ্যেই হাসিল করা হইয়াছে পাকিস্তান। পাকিস্তান হাসিলের পূর্বা পাঁচ বছর পরে পূর্ব-বাংলাকে মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল ঠিক এই কারণেই।

যে স্বকীয়তা লাভ ও বিকাশনই ছিল পাকিস্তান সংগ্রামের মূল কথা, পাকিস্তান হাসিলের পাঁচ বছর পরে দেখা গেল পাকিস্তানের মেজরিচি পূর্ব-বাংলায়ই সে স্বকীয়তা হইতে বঞ্চিত হইতে স্বাইতেছে। তাদের মুখের ভাষার বদলে পরের ভাষা উর্দুকে তাদের মুখে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। নিতান্ত আত্মরক্ষার তাগিদে পূর্ব-বাংলার সুধী সমাজ ও জনগণ এই হামলার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইল। পূর্ব-বাংলার তরুণ ইন্টেলিজেন্সিয়া ও ভবিষ্যৎ নাগরিক ছাত্র-তরুণরা এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। পুলিশের গুলিতে “শির দিল তবু তারা নাহি দিল আমামা।”

সে আত্মত্যাগ ব্যর্থ হইল না। সংগ্রাম সফল হইল। বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র-ভাষা হইল। পূর্ব-পাকিস্তানীর মাতৃভাষা স্বমর্ষাদায় প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু কথাটা আংশিক মাত্র সত্য। বাংলা ভাষা শাসনতন্ত্রে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ঐটুকুই মাত্র সত্য। এটা কাগযী সত্য, বাস্তব সত্য নয়। আমাদের জীবনে এটা সত্য করিতে হইলে প্রথমতঃ বাংলাকে আমাদের সামগ্রিক জীবনের ভাষা করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সে বাংলা হইবে পূর্ব-বাংলার নিজস্ব বাংলা। বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্র-ভাষা হওয়ার এই দুইটার একটাও সফল হয় নাই। সফল করিবার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে মাত্র।



ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা ও নিজস্বতা কি তা বুঝিতে হইলে আমাদের কাছে ইতিহাসের পাতা উন্টাইতে হইবে। তা যদি করি তবে আমরা দেখিতে পাইব যে, আমাদের একটা ইতিহাস আছে তা গৌরবময়, আমাদের একটা ঐতিহ্য তা সম্পদে-সম্ভারে ভরা।

### মুসলিম আমলের প্রাঞ্চলে বাংলা

খৃষ্টীয় সনের তের শতকের আগেতক বাংলাদেশ বঙ্গ পুণ্ড্র ও বংগাল এই তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। পরে এই তিনটি জনপদে মোটামুটি পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ ও পূর্ব বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। এই তিনটি জনপদ আবার ভাষা ও সাহিত্যের দিক হইতে মাত্র দুইটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আজিকার পূর্ব-বাংলা, মানে তৎকালীন পুণ্ড্র-বংগাল, ছিল বঙ্গ এলাকা। আজিকার পশ্চিম বাংলা, মানে তৎকালীন বঙ্গ, ছিল অবঙ্গ বা অঙ্গ এলাকা।

গুপ্ত ও পাল সাম্রাজ্যের উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে পশ্চিম বঙ্গ ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আওতাভুক্ত। বৌদ্ধ-হিন্দু-নির্বিশেষে ও-দেশের উচ্চশ্রেণীর সকলে লেখাপড়া করিতেন রাজকর্ম চালাইতেন বিশুদ্ধ সংস্কৃতে। পাটলিপুত্র বরাবর গুপ্তদের এবং কান্যকুব্জ কিছুদিন পালদের রাজধানী ছিল। এই দুটি মহানগরী ছিল তৎকালে সংস্কৃত সাহিত্যের পীঠস্থান।

পঞ্চাশতের পাল রাজাদের রাজধানী গৌড়ও পুণ্ড্র-বংগাল দেশের ভাষা ছিল বৌদ্ধ-সংস্কৃত। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ছিল মাগধ-প্রাকৃত দেশজ ভাষাসমূহের সংমিশ্রণে একটা চলতি ভাষা। বৌদ্ধ-ধর্মীয় নেতারা এই চলতি ভাষাকেই সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেন। বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা তাঁদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদির বেশীর ভাগই এই ভাষাতেই লেখেন। জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষার খাতিরে এটা ছিল অপরিহার্য। বর্ণাশ্রম-বিরোধী সাম্যবাদী ধর্ম হিসাবে বৌদ্ধধর্ম স্বভাবতই ছিল জনগণের ধর্ম। কাজেই তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পুঁথি-পুস্তকও রচিত হইত ঐ

ভাষাতেই। ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন যে, তৎকালীন ভারতের সর্বপ্রধান বিহারগুলির অধিকাংশ ছিল পুণ্ড্র-বংগাল দেশে অর্থাৎ বর্তমান পূর্ব-পাকিস্তানে। ঢাকা জিলার বিক্রমপুরী বিহার ও রামপালী বিহার, রাজশাহী জিলার সুমপুরী বিহার, বগুড়া জিলার মহাস্থান বিহার, কুমিল্লা জিলার ময়নামতী বিহার ও চট্টগ্রাম জিলার পণ্ডিত বিহার ছিল সারা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়গুলির অন্যতম। বাংলার বাহিরের মাত্র নালন্দা ও তক্ষশীলা মহাবিদ্যালয়কেই এদের সমমর্যাদায় গণ্য করা হইত।

এইভাবে গোটা বাংলাদেশ তৎকালে দুইটা স্বতন্ত্র ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। গুপ্ত-পাল বংশের সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিগ্ৰহ সংস্কৃত উত্তর-ভারতসহ রাত-উৎকল অঞ্চলের উন্নত রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্যের ভাষারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চাশুরে গৌড়রাজ শশাংক গোপাল ও তাঁদের পরবর্তী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও বৌদ্ধধর্মের খাতিরে পাটলিপুত্রের বৌদ্ধ সম্রাটদের পরোক্ষ অনুমোদনক্রমে পুণ্ড্র-বংগালে বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষা সমৃদ্ধি লাভ করে। পরে সেন বংশের অভ্যুত্থানে হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলে। তাতে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পতন ঘটে। বৌদ্ধসংস্কৃত ভাষাও বিপদের সম্মুখীন হয়।

এই সময়ে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ছয়শ' বছর বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম থাকে। এই ছয়শ' বছরের মধ্যে প্রায় পৌনে তিনশ' বছর বাংলা পার্ঠান সুলতানদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলা এবং তিনশ' বছর দিল্লীর মুঘল-সাম্রাজ্যের অধীনে প্রায়-স্বায়ত্তশাসিত সুবে-বাংলা রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে রাষ্ট্রীয় অবস্থায়ই থাকুক, গৌড় পাণ্ডুরা লক্ষণাবতী সোনালগাঁও ঢাকা জংগল-ঝাড়ী বা মুর্শিদাবাদ স্বেচ্ছানেই বাংলার রাজধানী থাকুক, সর্বঅবস্থায় সর্বস্থানে গৌড়-বাংলার রাষ্ট্রনেতারা বৌদ্ধ আমলের প্রচলিত বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষা ও তার পরিবর্তিত রূপের স্থানীয় ভাষারই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছিলেন।

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

এই ভাষার পরিবর্তিত ও সংশোধিত রূপই চর্যাপদের ভাষা। এই ভাষাই বাংলা ভাষা বা পূর্ব-বাংলার বাংলা। এই ভাষাই ছিল তৎকালের সাহিত্যের বাংলা। পঞ্চাশত্রে পশ্চিম-বংগ তখন বিস্তৃত সংস্কৃত ভাষার আওতাভুক্ত থাকায় বাংলাভাষা বিকাশের কোনও কারণ ও সম্ভাবনাই ছিল না। বৌদ্ধ-প্রভাবের অবসানে সেন বংশের রাজাদের উদ্যোগে উত্তর-পূর্ব বংগ হইতে বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষার উৎস্রাত করিয়া সে স্থলে বিস্তৃত সংস্কৃত ঢালাইবার চেষ্টা চলিয়াছিল সত্য, কিন্তু গৌড়ের মুসলিম শাসকরা গোড়াতেই সে চেষ্টায় প্রবল ও সক্রিয় বাধা দিয়াছিলেন। নিজেদের শাসনব্যবস্থাকে জনগণের কাছে পরিচিত ও গ্রহণ করার জন্য এবং জনগণের সহিত যোগাযোগ রক্ষার উপায় স্বরূপে মুসলিম সুলতানরা স্বভাবতঃই প্রচলিত ভাষাকেই সমর্থন দিতেন। তার পর বিশেষ করিয়া নাসিরুদ্দিন বগড়া শাহ হোসেন শাহ তাঁর পুত্র নসরত শাহ তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ ও ছুটি খাঁ এবং তাঁদের বংশধরগণের আমলে ও পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অতুলপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করে।

মুসলিম নরপতিদের দেখাদেখি ও তাঁদের উৎসাহে তাঁদের অনুগত হিন্দু রাজা-মহারাজারাও বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এ-ব্যাপারে যশোর নাটোর সুওং ত্রিপুরা চট্টগ্রাম ও আরাকানের রাজাদের ভূমিকা ইতিহাস-বিখ্যাত। এদের রাজ-দরবারের আরবী-ফারসী ভাষার পণ্ডিতদের সংগে-সংগে বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকদেরও সমাবেশ হইত। চণ্ডিদাস কুন্ডিলাস কাশীরাম মালাধর বসু ও ভারতচন্দ্রের মত বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের অভ্যুদয় হয় বাংলার মুসলিম শাসকদের আমলেই।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উত্থান-উন্নতির স্তর বিভাগ বা ইতিহাস রচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। এ সম্পর্কে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার প্রতিভাবান সাহিত্য-ঐতিহাসিকদের কথার বাহিরে আমার নতুন কিছুই বলার নাই। প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক নামে তাঁরা বাংলা সাহিত্যের যৈ তিনটা স্তর বিভাগ করিয়াছেন একটু সংশোধিত আকারে আমি তাই মানিয়া লইতেছি। তাঁরা যেটাকে বলেন মধ্য যুগ, আমি তাকেই বলি আদি যুগ। আমার প্রতিপাদ্য এই যে সাহিত্যিক বাংলা ভাষার জন্মদান গৌড়কেন্দ্রিক পূর্ব-বাংলা। বৌদ্ধ যুগের মগধ-প্রাকৃত-দেশজ মিশ্রিত বৌদ্ধ-সংস্কৃতই বাংলা ভাষার জননী। গৌড়রাজ মুসলিম সুলতানরা আরাকানের রাজারা এবং তাঁদের অনুগত হিন্দু রাজা মহারাজারাই সে সন্তানদের পালক পিতা।

এই পালন ও পৃষ্ঠপোষকতা চলে একটানা 'বিশ' বছরেরও বেশী। এই যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রূপ ও আংগিকে মুসলিম-প্রভাবিত একটা পূর্ব-বাংলা ছিল। পূর্ব-বাংলার হিন্দু কৃষিটির মধ্যেও এই যুগে একটা বৌদ্ধ উদারতা ইসলামী সাম্য ও বারেন্দ্র আভিজাত্য ছিল। এই যুগের বাংলা-সাহিত্য ছিল তা প্রকট।

পশ্চিম স্তর বর্তমানের পশ্চিম বাংলায় এই যুগে কোন বাংলা ভাষাই ছিল না, সিংহাসিত দুঃস্বপ্নের কথা। আসলে ঐ যুগের পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতিতে বাংগালী ছিল না। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও রাজধানী পাতালিপত্রের নিকটতম দেশের অধিবাসী হিসাবে পশ্চিম বাংগালীরা এই সময় ছিল জাতিতে ভারতীয়। ফলে এই যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন ঐকলী বা রাষ্ট্রীয় রূপ ছিল না। একমাত্র বারেন্দ্র রূপেই ছিল তার পরিচয়। চণ্ডিদাস কাশীরাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর কৃষ্ণ-বাস মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণ নন্দী কবিকঙ্কন বিজয় গুপ্ত ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি বহু হিন্দু মনীষী, মুহাম্মদ সগীর দৌলত কাষী আলাওল

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

বাহরাম খাঁ সাইফুল্লা সৈয়দ সুলতান সৈয়দ হাম্‌যা ও গরীবুল্লাহ প্রমুখ শত-শত মুসলিম মনীষী বাংলা সাহিত্যের সেবা করেন এই রূপেই।

এই যুগের কাব্য ও উপাখ্যানের সাম্প্রদায়িক রূপ ছিল না। প্রেম ও বীরত্বের বর্ণনায় রোমান্টিক আর্ট সৃষ্টিই ছিল এ যুগের সাহিত্যের প্রাণ। সত্য পীরের পাঁচালি বাউল ভাটিয়ালি মুর্শিদী ভাওয়াইয়া ভাসান জারি সারি ও দেহতত্ত্ব প্রভৃতি কাব্যে ও গানে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভাস্ময় সাহিত্যে ও আধ্যাত্মিকতায় এই যুগে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ এক ঐক্যের ময়দানে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছিল। কালক্রমে সত্য-পীর যখন সত্য নারায়ণ হইয়া গেলেন তখনও তাঁর ভোগ থাকিল শিরনী। বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক প্রীতি ও আধ্যাত্মিক ঐক্যের বাণী-বাহক পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তা সৃষ্টি ও বিকাশের দিক হইতে এই মুদ্রতটা ছিল বাংলা সাহিত্যের আদি ও স্বর্ণযুগ।

### বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ

এর পরে আসে বাংলা সাহিত্যের মধ্য যুগ। গোড়রাজ হোসেন শাহের গৌরবময় শাসন আমলে ষোল শতকে পূর্ব-বাংলা পবিবেশের সম্ভান সিলেটের গৌরাংগ নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য রূপে আবির্ভূত হন এবং হিন্দুধর্মের প্রেমের বাণী ও ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের বাণীর সম্ম্বয়ে এক নয়া-জীবনধারা প্রচার শুরু করেন মুসলিম শাসকদের উদারতার ছায়াতলে। প্রায় দুইশ' বছর পরে আঠার শতকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ও তাঁর বংশধরদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নয়া জাগরণের বাণী শেষ পর্যন্ত সাহিত্যে রূপায়িত হয়। এই সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃত ছিল না, ছিল তৎকালীন প্রচলিত বাংলা। ধর্মের দিক হইতে চৈতন্যবাদ-পন্থীরা ইসলামের সাথে কোনও বিরোধ বাধাইল না। কারণ ইসলামের জনপ্রিয়তার বন্যা হইতে হিন্দুকে বাঁচাইবার জন্যই চৈতন্যবাদের আবির্ভাব হইলেও ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্ববাদই ছিল তার বুনিন্দ।

কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় ক্রমে-ক্রমে ধীরে-ধীরে দৃঢ়ভাবে পূর্ব-বাংলার প্রভাবের স্থানে পশ্চিম-বাংলার প্রভাব প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতে থাকে।

নবদ্বীপ অনেক আগে হইতেই সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র-ভূমি ছিল। এই পাণ্ডিত্য আগে পাটলিপুত্র ও কান্যকুব্জমুখী ছিল। শ্রীচৈতন্যের আধ্যাত্মিক ও কৃষ্ণরাজ-পরিবারের সরকারী প্রভাবে এই পণ্ডিতরা বাংলামুখী হইলেন বটে কিন্তু নিজেদের প্রেস্টিজ রক্ষার্থ তাঁরা বাংলা-ভাষার প্রচলিত পূর্ব-বাংগালিছ ঘুচাইয়া তাকে পশ্চিম-বাংগালী অর্থাৎ স্নাতীক করিয়া লইবার চেষ্টা চালাইলেন। এই কারণে এই সময়কার চৈতন্য সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ উভয়ভাবে বাংগালবিরোধী প্রচারণা চলিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চৈতন্য ভাগবৎ গ্রন্থের একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রভু চৈতন্যের দরবার বর্ণনায় এই গ্রন্থে লেখা হইয়াছে :

বঙ্গদেশী বাক্য অনুকরণ করিয়া।

বাঙ্গালেরে কদর্থেন হাসিয়া হাসিয়া ॥

বিশেষ চালেন প্রভু দেখি শ্রীহট্টিয়া।

কদর্থেন সেইমত বচন বলিয়া ॥

এই যুগের একটি সংস্কৃত শ্লোক এইরূপ :

আশীর্বাদং ন গৃহ্ণিয়াৎ পূর্ব বঙ্গ নিবাসিনঃ

শতায়ুর্ভিত্তি বজ্জব্যো হতায়ুর্ভদত্তি যতঃ।

অর্থাৎ পূর্ব বাংগালীর আশীর্বাদ গ্রহণ করিও না। উহারা 'শতায়ু হউক' বলিতে গিয়া 'হতায়ু হউক' বলিয়া ফেলে।

এই পূর্ব-বাংগালী-বিরুদ্ধ পরবর্তীকালে পশ্চিম-বাংলার ভাষা-সাহিত্যে ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এমন দানা বাঁধিয়া উঠে যে, বিশ শতকের গোড়াতেই পশ্চিম-বাংলার জনপ্রিয় প্রবচন হয় এইটি :

বাংগাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্ত

লাফ দিয়া গাছে উঠে লেজ নাই কিন্তু।

বাংগাল-বিরোধী এই প্রচারণার ফলে চৈতন্য যুগের কাব্য-উপা-খ্যানে স্বভাবতঃই ক্রমে-ক্রমে পূর্ব-বাংগালী শব্দাবলী ও বাক্য-বিন্যাস

বর্জিত হইতে থাকে। এই যুগের কীর্তন পদাবলী ও চৈতন্যে চরিতা-  
মুতে এই বিবর্তন সুস্পষ্ট। গোড়ার দিকে এই বাংলা-বিরোধী ভাব  
কিন্তু মুসলিম-বিরোধী ছিল না। বরঞ্চ সাম্য ও ব্রাহ্মত্ববাদ প্রচারে  
ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মৌলিক ঐক্য ও সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা চলে  
আরও একশ' বছর ধরিয়া।

### সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশ

কিন্তু এরপর এই ভাব রক্ষা করিয়া চলা সম্ভবও ছিল না, দরকারও  
ছিল না। চৈতন্যবাদ ছিল মূলতঃ হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলন। এই  
রেনেসাঁকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য অত্যাাবশ্যক হইয়া পড়ে হিন্দু  
মানস ও চিন্তাধারাকে পাঁচশ' বছরের মুসলিম-প্রভাব-মুক্ত করা।  
মুসলিম-প্রভাব কাটাইতে হইলে কিছুটা মুসলিম-বিদ্বেষ নিশ্চয়ই প্রচার  
করিতে হয়। আঠার শতকের বাংলা সাহিত্যে এই ভাবের প্রথম  
উন্মেষ দেখা দেয়। জোর ধরে তাতে উনিশ শতকে।

এই মনোভাবের দরুন বাংলা ভাষা হইতে বহু যুগের সুপ্রচলিত  
আরবী-ফারসী শব্দ বর্জনের প্রয়াস জন্মলাভ করে। বাংলায় প্রচলিত  
আরবী-ফারসী শব্দ মানে তাদের মূল আরবী-ফারসী রূপ নয়। ঐ  
সব শব্দের বাংলায় লোকালাইমুড রূপ। আজকাল যেমন আমরা  
কথাবার্তায় হাজার-হাজার আরবী-ফারসী শব্দ বাংলারূপে ব্যবহার  
করি, আরবী-ফারসী শব্দ বলিয়া যেমন তাদের চিনাই যায় না, তৎ-  
কালেও তাই ছিল। তবুও নবজাগরণে-সঞ্জীবিত হিন্দুরা বাংলায়  
ঐসব আরবী-ফারসী শব্দও বরদাশ্ত করিতে রাখি ছিল না।

তাই হিন্দু কবিরা আরবী-ফারসীমূলক ঐ-সব শব্দ বাদ দিয়া  
সেই স্থলে ভাষায় সংস্কৃত শব্দ ও সাহিত্যের বিষয়-বস্তুতে হিন্দুমানি  
প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে এর  
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কাব্যে হিন্দুমানি প্রবর্তনের জবাবে তাঁরা

## বাংলাদেশের কালচার

মুসলমানি আমদানি শুরু করেন। সংস্কৃত শব্দ আমদানির জবাবে তাঁরা আনকোরা নতুন-নতুন আরবী-ফারসী শব্দ আমদানি শুরু করেন।

এর ফলে আঠার শতকের বাংলা সাহিত্যে হিন্দু-ধারা ও মুসলিম-ধারা রূপে দুইটি স্বতন্ত্র ধারার দেখা পাওয়া যায়। গোড়াতে এই দুই ধারার মধ্যে কোনও সংঘাত ছিল না। রেল-লাইনের দুইটি রেলের মতই তারা সমান্তরালভাবে দুই খাতে পাশাপাশি প্রবাহিত হইত। কাব্যের উপাখ্যান ভাগ আগের মতই রোমান্টিক থাকিত। শুধু কিতাবের গোড়াতে হিন্দু কবিরী ঐশ্বর ও দেব-দেবীর বন্দনা করিতেন। মুসলিম কবিরী করিতেন আল্লা-রসুলের বন্দনা হামদ ও নাত লিখিয়া। ক্রমে এই স্বাতন্ত্র্যবোধ আরও স্পষ্ট ও তীব্র হয়। হিন্দু কবিদের আখ্যানবস্তু হিন্দু দেব-দেবী ও রাজপুরুষদের বীরত্ব-মহিমা বর্ণনায় এবং মুসলিম কবিদের আখ্যান-বস্তু মুসলিম পীর-পয়গাম্বর ও বীর পুরুষদের বীরত্ব-মাজেহা বর্ণনায় সীমাবদ্ধ হইতে থাকে।

## বাংলার সংস্কৃতিকরণ

এই অবস্থায় আসে ইংরাজ শাসন। উনিশ শতকের গোড়া হইতেই বাংলার সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইংরাজরা সক্রিয় হস্তক্ষেপ শুরু করে। নব-লক রাজ্য রক্ষা ও কায়েম করার জন্য এটা তাদের দরকারও ছিল। মুসলমানরা ইংরাজ শাসন মানিয়া লয় নাই। পতন যুগের মুসলমানদের সাংস্কৃতিক আত্মরক্ষার শেষ প্রয়াস ‘ওহাবী আন্দোলন’ শেষ পর্যন্ত ইংরাজবিরোধী সিপাই-বিদ্রোহ নামে জেহাদী স্বাধীনতা সংগ্রামে পরিণত হয়। বিদ্রোহী মুসলমানদের শাস্তা করিবার মতলবে ইংরাজরা হিন্দুদের সহায়তা নেন। নব-জাগরণে-উদ্বুদ্ধ হিন্দুর নবজ্ঞাত এই মুসলিম-বিদ্বেষে তারা ইকন যোগায় খুব। চাকুরী-বাকুরী ও শিল্পে-বাণিজ্যে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠিত করার আনুষঙ্গিক পস্থা হিসাবে তারা ভাষা ও সাহিত্যেও হিন্দুদের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করে।



## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

সাম্রাজ্যবাদী 'ডিভাইড এণ্ড রুল'-নীতি তারা ভাষা ও সাহিত্যেও প্রয়োগ করে। হিন্দু কলেজ-সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের সংগে-সংগে প্রচলিত বাংলাকে এককভাবে হিন্দু ভাষা করিবার ব্যবস্থা করে।

ছয় শ' বছরের মুসলিম শাসনের ভাল দিকের সংগে খারাপ দিকও ছিল স্ভাব্যতঃই। ইংরাজরা হিন্দুদের মন মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষায়িত করিবার উদ্দেশ্যে বাহিয়া-বাহিয়া কেবল খারাপ দিক দেখায়। একদিকে মিথ্যা ও আধা-সত্য ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া তারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে যে, মুসলমানরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। অন্যদিকে তেমনি দেখায় মুসলমানরা আরবী-ফারসী শব্দ ঢুকাইয়া বাংলা ভাষারও সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষার জন্য এইসব আরবী-ফারসী শব্দকে বাংলা ভাষা হইতে দূর করা দরকার। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের ও হুগলির শ্রীরামপুরের ফরস্টার মার্শম্যান ও উইলিয়ম ক্যারি প্রমুখ পাদ্রী-রাজনীতিক এই বাংলা ভাষা সংস্কার আন্দোলনের গোড়া পত্তন করেন। এঁরা আরবী-ফারসী শব্দ-বর্জিত বিশুদ্ধ বাংলাগদ্যে নিজেদের ধর্মীয় প্রচার-পত্র প্রকাশ করিতে শুরু করেন। এই বিশুদ্ধ বাংলাতে তাঁরা হুগলি হইতে বাংলা ভাষার প্রথম সপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

এখানে প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অনেকের ধারণা এই পাদ্রীরাই এই সময়ে সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের প্রচলন করেন। তাঁরা মনে করেন ইংরাজ আগমনের আগে বাংলা ভাষার লিখিত কোনও গদ্যরূপ ছিল না। ইংরাজ পাদ্রীরাই উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। কথাটা মোটেই সত্য নয়। মুসলিম শাসন-আমলে বাংলা গদ্য লেখা সুপ্রচলিত ছিল। এতেলানামা দরখাস্ত পরওয়ানা আদালতের আরযি-জবাব-রায় চিঠিপত্র জায়দাদ সম্পর্কিত দলিল তমসুক ও তওলিয়াতনামা হেবানামা দানপত্র ইত্যাদি সমস্তই গদ্য ভাষায় লেখা হইত। ছোটভাই রাধাকৃষ্ণের বরাবরে মহারাজা নন্দ-

কুমারের সতর'শ ছাপ্পান্ন খুণ্টাব্দে লিখিত ইতিহাস-বিখ্যাত চিঠি এবং লগুন মাদুঘরে রক্ষিত আরও দুই-চারখানা গদ্য লেখা তার প্রমাণ। এইসব দলিল-পত্রে স্বভাবতঃই সুপ্রচলিত আরবী-ফারসীজাত বহু শব্দ ব্যবহার করা হইত।

অতএব ইংরাজ পাদ্রীরা উনিশ শতকের গোড়াতে প্রথম বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন, এ কথার অর্থ এই যে, তাঁরা আরবী-ফারসী শব্দবিবজিত সংস্কৃত-শব্দবহুল বাংলা গদ্য প্রবর্তন করেন। হিন্দু সুধী সমাজকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার মতলবে এই পাদ্রীরা ইংরাজীতে বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান প্রণয়ন করেন। তাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত কোন্-কোন্ শব্দ আরবী-ফারসী তা দেখাইয়া দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যুত্যাঞ্জয় তর্কালংকার প্রমুখ পণ্ডিত এই সময় সংস্কৃত শব্দ-ভারাক্রান্ত নূতন বংগ ভাষার প্রবর্তন করেন। এঁরা নিজেদের লেখা বই-পুস্তকে বৌদ্ধ-মুসলিম-পতু'গিষ-প্রবর্তিত সুপ্রচলিত শব্দসমূহ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ করেন। কলমকে 'লেখনী' কাগমকে 'ভূর্জপত্র' দোয়াতকে 'মস্যাধার' করার চেষ্টা এই সময় করা হয়। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া দাবি এই যুগেই শুরু হয়। 'ব্যাকরণ কৌমুদী' ও ব্যাকরণ মঞ্জুসা' লেখা হয় এই সময়ে বাংলাকে সংস্কৃতের খাতে ফেলিবার উদ্দেশ্যে। খাওয়াকে 'আহার করা' পরাকে 'পরিধান করা' বসাকে 'উপবেশন করা' ইত্যাদি সংস্কার শুরু হয় খুবই দ্রুত গতিতেই। নদীয়াবাসী প্রতিভাবান সংস্কৃত পণ্ডিতদের শক্তিশালী লেখনী-মুখে বাংলা ভাষা যে সাহিত্যিক রূপ পায়, তার শব্দ প্রয়োগে বাক্য বিন্যাসে নদীয়ার বাকরীতি ও ভাষিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাময়িকভাবে বাংলা ভাষা সত্যসত্যই সংস্কৃতের পালিতা কন্যা হইয়া যায়। ভাষা ও সাহিত্যে হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার পৃথকীকরণ সম্পূর্ণ হয়। এইটাই বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ।

অধুনিক যুগ

কিন্তু নবজীবনের বাণীতে সজীবিত বাংলা হিন্দু সংস্কৃতির এই আধিপত্য বেশী দিন মানিয়া চলে নাই। সংস্কৃত পণ্ডিতদের সংস্কৃতান্বিত এই বংগ ভাষাকে তারা 'উৎকট উৎকলী' বাংলা বলিয়া পরিত্যাগ করে। বড়-বড় বাংলা হিন্দু মনীষীর অভ্যুদয়ে এবং ইংরাজী-ফরাসী সাহিত্যের সংশ্রবে এরপর বিপুল সমৃদ্ধিশালী এক বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। সে সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে সম্মানের আসন লাভ করে। ঐ সাহিত্যের ভাষা হিসাবে এমন একটি উন্নত বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় যা বর্ধমান হইতে চট্টগ্রাম রংপুর হইতে ডালমণ্ডহারবার পর্যন্ত গোটা বাংলাদেশের সাহিত্যের বাংলারূপে গৃহীত হয়। গল্প-উপন্যাস কাব্য-নাটকে এই যুগ নব্য বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

তবে এই স্বর্ণযুগের আলোকোজ্জ্বল মজলিসে মুসলিম-বাংলার স্থান ছিল না। বাংলার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আকাশে শুধু শরতের চন্দ্র উদিত হইত এবং সে চন্দ্রোদয়ে 'আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে যাইত দেশ ছেয়ে'। কিন্তু সে কাব্যাকাশে ঈদ-মোহররমের চাঁদ কখনও উত্তীর্ণ না। ঈদের আনন্দে ও মোহররমের শোকে দেশ কখনও 'ছেয়ে'ও যাইত না। বরঞ্চ এই সাহিত্যের আলোকের প্রখরতায় মুসলিম-বাংলার নিজস্ব সাহিত্য 'বটতলার পুঁথি সাহিত্য'র বদনাম লইয়া পল্লী-বাংলার মূখ লুকাইল। ঈশ্বরগুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র 'নেড়ে যবন' গাল দিয়া মুসলিম-বাংলাকে সেই যে সাহিত্যের মজলিস হইতে তাড়াইলেন, রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের বিরাট আকর্ষণী শক্তিও আর তাদের সে মজলিসে ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। এই না পারার স্বাভাবিক কারণও ছিল।

হিন্দু রেনেসাঁর প্লাবনে ইতিমধ্যে বাংলা সাহিত্য যে গতি-পথে চলিয়াছিল, তা হইতে ফিরিবার কোনও উপায় ছিল না। পক্ষান্তরে

মুসলিম-বাংলার পক্ষে সে পথে যাওয়াও সম্ভব ছিল না। শিল্প-সাহিত্যের এই স্বর্ণযুগে পশ্চিম-বংগ গোটা বাংলার যে মুসলিমহীন ইমেজ তৈয়ার করিয়াছে তা যতই সুন্দর হউক, ষোল-সত্তর শতকের বাংলার ইমেজ হইতে এটা সম্পূর্ণ পৃথক। আজিকার এই ইমেজে শুধু মুসলিম-বাংলা নয় পূর্ব-বাংলাও নির্বাণ লাভ করিয়াছে এবং চিরতরেই করিয়াছে।

### পাকিস্তান যুগ

তবু এই কথাটা বুঝিতে অনেকের অসুবিধা হয়। কারণ এই দুটিটুকোণ হইতে ব্যাপারটার বিচার আজও হয় নাই। হইতে পারে নাই।

পাকিস্তান দাবির মধ্যে সাম্প্রদায়িক আওয়াজ ও গণতান্ত্রিক জাতীয় আওয়াজ দুইটাই ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাবির মোটা আওয়াজের নিচে পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তার গণতান্ত্রিক জাতীয় দাবির ক্ষীণ আওয়াজটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল অবস্থা গতিকে। ফলে গোটা দাবিকেই মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবি বলিয়া ভুল করা হইয়াছে।

এই ভুল শুধু হিন্দুরা করে নাই। অনেক মুসলমানও করিয়াছে। পূর্ব-বাংলার ভাষিক ও সাহিত্যিক স্বকীয়তার দাবিকে এই কারণেই অনেক মুসলিম সাহিত্যিকও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পার্টিশন করার সাম্প্রদায়িক দাবি মনে করেন। এঁদের বুঝিতে কিছু সমস্যা লাগিবে যে, এই ধারণা ভুল।

গরান্থীন আমলের ভারতবর্ষের মডারেটরা ইংরাজ শাসনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাকাকে গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবিকে এঁরা একটা বিশ্বজয়ী সত্য সাম্রাজ্যের মেম্বরগিরি হারাইবার প্রগতি-বিরোধী আত্মঘাতী দাবি মনে করিতেন। আমাদের দেশের উপরোক্ত শ্রেণীর সাহিত্যিকদের মনোভাব কতকটা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের মতই এঁরা মনিবের সম্পদকেই নিজের

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

সম্পদ মনে করেন। এঁরা যে শুধু স্বাধীনতা চান না তা নয়, স্বাধীনতাকে দস্তুরমত ভয় পান এঁরা।

এখানে আসল ব্যাপার এই যে, কলিকাতা-কেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্য তার বিশালতার চাপেই পূর্ব-বাংলা ও মুসলিম-বাংলাকে নিচিপেষ্ট করিয়াছে। ইতিহাসের দিক হইতে পূর্ব-বাংলা-বিতাড়নের কাজটা মুসলিম-বাংলা-বিতাড়নের কয়েকদিন আগে হইতে শুরু হইলেও দুইটি অভিযানই চলে এক সংগে সমান্তরালভাবে অনেক দিন ধরিয়া। একদিকে যেমন চলে 'কলম'কে 'লেখনী' 'তাজ'কে 'মুকুট' 'তলওয়ার'কে 'তরবারি' 'ঘোড়-সওয়ার'কে 'অশ্বারোহী' শহরকে 'নগর' 'আয়নাকে' 'আরশী' 'গোশত'কে 'মাংস' ও লহকে 'রক্ত' করার অভিযান, অপরদিকে তেমনি চলে 'থনে'কে 'হইতে' 'ঠাঁই'কে 'নিকটে' 'ত'কে 'তে' 'রে'কে 'কে' এবং ক্রিয়াপদে 'কহিয়া'কে 'বলিয়া' 'ধুইয়াকে' 'রাখিয়া' 'জিগাইয়াকে' 'গুধাইয়া' করার অভিযান।

'পানি'কে 'জল' আর 'কাংকই'কে 'চিরুণী' করার মধ্যে কতটা মুসলিম-বিদ্বেষ আর কতটা বাংলা-বিদ্বেষ আছে তা কওয়া মুশকিল। শুধুমাত্র পশ্চিম-বাংলার হিন্দুরা ছাড়া আর সর্ব-ভারতীয় হিন্দুরাই 'পানি' ও 'কাংকই' ব্যবহার করিয়া থাকে। আর শব্দ দুইটিও আরবী-ফারসী নয়, একেবারেই বিগুহ্ন হিন্দী। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত একরকম অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, পশ্চিম-বাংলার হিন্দুদের 'পানি' ও 'কাংকই' বর্জনের মধ্যে মুসলিম-বর্জনের চেয়ে পূর্ব-বংগ বর্জনই বেশী সুস্পষ্ট।

পরবর্তীকালে পূর্ব-বাংলার হিন্দুদেরও অনেকে যে এই দুইটি শব্দ বর্জন করিয়া চলিত তার কারণ পশ্চিম-বাংলার ভাষিক ও সাহিত্যিক প্রভাব দুনিবার হইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল শুধু হিন্দুর উপরে নয়, অনেক মুসলমানের উপরেও।

সে প্রভাব ক্রমে ব্যাকরণের বিভক্তিতেও ছড়াইয়া পড়ে। মধ্যম বা দ্বিতীয় পুরুষের ক্রিয়াপদে সম্ভ্রম-সূচক 'বা' এর বদলে তুচ্ছার্থ-

বোধক 'বে' প্রবর্তন করা হয়। পূর্ব-বাংলার সর্বত্র 'তুমি খাইবা' 'তুমি যাইবা' ইত্যাদি চালু আছে। তৎকালীন সাহিত্যে এই ব্যবহারই চালু ছিল। পশ্চিম-বংগীকরণে এই 'তুমি খাইবা' 'যাইবা'র জায়গায় 'তুমি খাইবে' 'যাইবে' প্রবর্তন করা হয়। ছোট-বড় উচ্চ-নীচ ভক্তি-আদর বুঝাইবার জন্য উর্দু-হিন্দীর মত বাংলায়ও 'আপনে', 'তুমি' ও 'তুই' বলার রেওয়াজ আছে। পূর্ব বাংলায় 'যাওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহারে 'আপনে যাইবেন' 'তুমি যাইবা' ও 'তুই যাইবি' ব্যবহার করা হয়। স্পষ্টতঃই এটা ভদ্র ও শালীন ব্যবহার। বাহনীয়ও বটে। স্মৃতিতেও মিঠা।

পূর্ব-বাংলার প্রাধান্য থাকাকালে অর্থাৎ মুসলিম আমলে বাংলা সাহিত্যে এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত ছিল। দৌলত কামী আলাওল ও ফয়সল্লা প্রভৃতি মুসলিম কবির লেখায় ত বটেই হিন্দু কবিদের লেখাতেও এইরূপ ব্যবহার করা হইত। পুরাতন তওলিয়তনামা, হিন্দুদের উইল ও দান-পত্র, মামলা-মোকদ্দমার রায় ইত্যাদি দলিল-পত্রাদিতেও এইরূপ করা হইত দেখা যায়। যতদিন ভাষায় মধ্যম বা দ্বিতীয় পুরুষে ঐরূপ তিনটি স্তর আছে, ততদিন ক্রিয়াপদেও তিন স্তরের পার্থক্য থাকাটা দোষের ত নয়ই বরঞ্চ ব্যাকরণ-সম্মত সুবিধাজনক ও ভদ্রতাসূচক। কিন্তু পশ্চিম-বাংলায় ও কলিকাতায় 'তুমি যাইবা' বলা বাংলাপনা বলিয়া নিন্দিত।

### অসংগত ও অবৌক্তিক

আরেকটি দৃষ্টান্ত নেন। পূর্ব-বাংলার প্রায় সর্বত্র 'হইতের' প্রতিশব্দ 'খনে' আর 'কাছে' বা 'নিকটে'র প্রতিশব্দ 'ঠাই'। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও 'খনে' ও 'ঠাই' এর প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়। মধ্যযুগের ও বর্তমান যুগের সাহিত্যে 'খনে'র ও 'ঠাই'-এর ব্যবহার একদম নিষিদ্ধ। 'হতে' 'চেয়ে' 'থেকে' এবং 'কাছে' ও 'নিকটে' তাদের জায়গা দখল করিয়াছে।

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

আরব ও পারস্যের সংশ্রবের দরুনই হউক বা দ্রাবিড় মংগোলীয় অভ্যাসের দরুনই হউক, পূর্ব-বাংলার লোক চন্দ্রবিন্দুর অনুনাসিক উচ্চারণ করিতে পারে না। তার বদলে 'ন' উচ্চারণ করিয়া থাকে। তারা চাঁদের বদলে 'চান্দ' ফাঁদের বদলে 'ফান্দ' কাঁদার বদলে 'কান্দা' ব্যবহার করে। বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে এই ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। মধ্য ও বর্তমান যুগের বাংলা সাহিত্যে এটা অশালীন বলিয়া পরিত্যক্ত। 'র' ও 'ড়'-এর বেলাও তাই হইয়াছে।

ক্রিয়াপদের রূপান্তরের একটি উদাহরণ দেই। 'বসাইয়া' 'করাইয়া' 'ধরাইয়া' ইত্যাদি শব্দের কথ্যরূপ পূর্ব-বাংলায় 'বসা'য়া' 'করা'য়া' ও 'ধরা'য়া'। ঐ শব্দগুলির শুদ্ধ কবিতা রূপ যথা 'বসায়ৈ' 'করায়ৈ' ও 'ধরায়ৈ'র অতি ঘনিষ্ঠ রূপ এরা। তবু পশ্চিম-বাংলা শুধু যেন পূর্ব-বাংলা হইতে নিজেদের দূরত্ব প্রমাণের জন্যই ম্বিদ করিয়া ওগুলিকে 'বসিয়ে' 'করিয়ে' ও 'ধরিয়ে' করিয়াছে।

সংখ্যা-বাচক শব্দের একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াই আমি এদিককার বক্তব্য শেষ করিব। এক দুই তিন ইত্যাদি কাড়িন্যাল বা অংক-বাচক সংখ্যার অড়িন্যাল বা মান-বাচক সংখ্যারূপে পূর্ব-বাংলায় পয়লা দুসরা তেসরা ও চৌথা ব্যবহার করা হয়। এর পরে আঠার পর্যন্ত সংখ্যার শেষে 'ই' যোগ করিয়া এবং তারও পরে সংখ্যা-শব্দের উচ্চারণ-ভেদে 'আ' বা 'ই' যোগ করিয়া শব্দ গঠন করা হয়। যথা : তেরই পনরই সতরই একইশা ত্রিশা চল্লিশা ষাইটা সত্তুরা বাহাত্তরা একাশিয়া বিরানব্বইআ ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যেও এইরূপ ব্যবহার হইত।

কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মধ্যযুগের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা সাহিত্যে এক হইতে চার পর্যন্ত প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ লেখার পর পাঁচ হইতে তদূর্ধ সংখ্যায় 'ম' 'তম' ও 'তিতম' প্রত্যয় যোগ করিয়া সমস্ত মান-বাচক সংখ্যাকে দুরদার সংস্কৃত শব্দ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় লিখিবার সময় সকল সংখ্যার পর সংক্ষেপে 'ম' বসাইয়া কাজ সারা

হর্ন বটে, কিন্তু পড়বার সময় পঞ্চবিংশতিতম ষষ্ঠষষ্ঠিতম, অষ্টসপ্ত-  
তিতম ইত্যাদি উচ্চারণ করিতেই হয়। এটার দুঃসাধ্যতা স্বীকৃতির  
ফলে অনেকেই ইদানীং পড়বার সময় প্রচলিত সহজ বাংলা অংক-  
সংখ্যার পর শুধু 'তম' উচ্চারণ করিয়া থাকে। যথা পঁচিশতম  
একচল্লিশতম বিরামিতম ও একশতম ইত্যাদি। এটা কি যুক্তিসংগত  
না ব্যাকরণ-সম্মত? এর একটাও না। তবু এটা করা হইয়া  
থাকে। কারণ বিকল্প সহজ শব্দটি বাংলায়।

### পরিভাষার ছুতা

আমাদের মাতৃভাষাকে আজও সরকারী দফতরের অফিসিয়াল  
ল্যাংগুয়েজ করা হয় নাই বলিয়া গবর্নমেন্টকে আমরা দোষ দেই।  
কিন্তু আমাদের বেসরকারী ও ব্যক্তিগত কাল-কারবারে দোকান-পাটে  
রাস্তা-ঘাটে স্কুল-কলেজে আমরা যে বাংলার প্রাপ্য মর্যাদা দিতেছি  
না এটা কার দোষ? আমরা যে ক্লাবে-পার্টিতে, সভা-সমিতিতে,  
ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে, বিয়া-শাদির দাওয়াত-নামায় পর্যন্ত ইংরাজী  
চলিয়াইতেছি, তার জন্যও কি সরকার দায়ী? শহর মফস্বলের সমস্ত  
মিউনিসিপালিটির রাস্তা-ঘাটের নাম-ফলক, মায় ইউনিয়ন কাউন্সিলের  
চিঠি-পত্র, তাদের ছাপা শিরোনামা, খেলা-ধুগার অনুষ্ঠান-পত্র সবই  
যে চলিয়াছে আগের মতই ইংরাজীতে, এ দোষ আমরা চাপাইব কার  
ঘাড়ে? মোট কথা পরাধীনতার আমলে এবং বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা  
করিবার আগে অবস্থা পরিবেশ এবং মনোভাব যা ছিল, আজো ঠিক  
তাই আছে।

মাতৃভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে দ্বিমত নাই। কিন্তু বিভ্রান্তি আছে। বিভ্রান্তি  
আমাদের সুখী সমাজে। শিক্ষক অধ্যাপক ও সাহিত্যিক সাংবাদিকরাই  
সুখী সমাজের অগ্রণী। কারণ এঁরাই স্বাধীনভাবে চিন্তা ও কাজ করিতে  
পারেন।



## ভাষা আলোচনের মর্মকথা

শিক্ষকদের কথাটাই আগে বলি। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আবশ্য-  
কতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু সেটা হয় নাই। আরওই হয়  
নাই। কারণ বাংলায় আজো পাঠ্য-পুস্তক, বিশেষতঃ বিজ্ঞানের  
পাঠ্যপুস্তক, লেখা হয় নাই। যেহেতু আজো পরিভাষা সৃষ্টি হয় নাই।  
কেন হয় নাই? প্রয়োজনীয় পরিভাষা সৃষ্টির জন্য বাংলা একাডেমি ও  
ইউনিভার্সিটির পরিভাষা কমিটিরা চেষ্টা করিতেছেন। মতদিন  
ও-কাজ সমাপ্ত না হইবে ততদিন মাতৃভাষায় শিক্ষাদান স্থগিত  
থাকিবে।

কথাটা যে কত বড় অসত্য তা যে-কোন কাণ্ডজ্ঞানী লোকের  
বুঝিবার কথা। পরিভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা যে কত কৃতিম অনাবশ্যক  
ও অসংগত চেষ্টা, অর্থ শক্তি ও সময়ের যে কত বড় অপচয়, সুধী  
সমাজকে তা বুঝাইবার চেষ্টা করাও শক্তি ও সময়ের অপচয় মাত্র।  
যে শব্দ বাংলাদেশের সকলে বুঝে ও বলে, সেটাই বাংলা শব্দ। যে  
ভাষায় আমরা রোজ কথা কই, যে ভাষায় ছাত্র-শিক্ষকরা নিজেদের  
মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান করেন, সেটাই বাংলাভাষা। তার আবার  
পরিভাষা কি? সে ভাষার কোন শব্দটা ইংরাজী কোন্টা সংস্কৃত  
কোন্টা আরবী কোন্টা ফারসী কোন্টা পতু'গীয সেটা বিবেচ্য বিষয়  
ভাষা-বিজ্ঞানীর, শিক্ষক ছাত্র লেখক ও জনসাধারণের বিবেচ্য নয়।

ভাষার পরিচয় যে শুধু ক্রিয়া পদে, এটাও কি কাউকে বুঝাইয়া  
দিতে হইবে? দশটা বাংলা-ইংরাজী শব্দ একত্র করিয়া তার সাথে  
'হোতা হ্যাম', 'করতা হ্যাম' লাগাইয়া দিলেই হিন্দী-উর্দু বাক্য হইয়া  
যায়, এটা একেবারে ফাঁকা রসিকতা নয়। 'আমাদের কলেজের  
প্রফেসররা ক্লাসরুমে লেকচার দিবার সময় ব্যাকবোডে ড্রয়িং আঁকিয়া  
লেসন দিয়া থাকেন। আর স্টুডেন্টরা সে সব নোট করিয়া লয় এবং  
প্রাকটিক্যাল ক্লাস করার সময় ল্যাবরেটরিতে তদনুসারে এক্সপেরিমেন্ট  
করিয়া থাকে।' এটা কি বাংলা নয়? এই ভাষায় বাংলা হরফে  
টেকস্ট বুক লেখা যায় না? টেকস্টবুক বোর্ডের বাংলা পরিভাষা

## বাংলাদেশের কালচার

সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত ঐ বোর্ড গঠন স্বগিত থাকিল না কেন? পরিভাষা সৃষ্টি হইবার আগেই সেকেশনারি এডুকেশন বোর্ডই বা গঠিত হইল কেমন করিয়া? হাসপিটাল বেড নার্স ক্যাবিন ওয়ার্ড মেডিসিন ইনজেকশন অপারেশন ইমার্জেন্সির পরিভাষা সৃষ্টি হওয়ার আগেই হাসপাতাল খোলা হইল কোন্ যুক্তিতে? থার্মোমিটার স্টেথিসকোপ ও সিরিজের পরিভাষা সৃষ্টি হওয়ার আগেই আমরা বাড়িতেই বা ডাক্তারকে কল দেই কোন্ অধিকারে? আর ডাক্তাররাই বা পরিভাষা সৃষ্টির আগেই প্রেসক্রিপশন লিখিয়া ভিষিট ক্লেইম করেন কোন্ আইনে? আর আমরা জনসাধারণই বা সেই প্রেসক্রিপশন লইয়া ডিপেনেন্সারিতে কমপাউণ্ডারের কাছে যাই কোন্ আঙ্কলে? আর সেই বা মিকচার দিয়া ক্যাশ মেমো কাটে কিরূপে?

সুতরাং বুঝা গেল পরিভাষার অভাবের অজুহাত একটা বাজে অজুহাত মাত্র। আমাদের বদভ্যাস ও গোলামি মনোভাব ঢাকা দেওয়ার একটা অপকৌশলমাত্র। এটা ত গেল আমাদের শিক্ষকদের কথা। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের অবস্থা আরও অনেক বেশী শোচনীয়।

### আদর্শের দিকজ্ঞান

পাকিস্তান হাসিলের আগে আমরা লেখক-সাহিত্যিকরা যে পথে যেদিকে যাইতেছিলাম আজও সেই পথে ঠিক সেই দিকে যাইতেছি। স্বাধীনতার আগে কলিকাতায় বসিয়া আমরা যে-ভাষায় লেখিয়া যে ধরনের সাহিত্য রচনা করিতাম, পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় বসিয়াও সেই ভাষায় সেই ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছি।

ইতিমধ্যে মুসলিম-ভারতের তমদ্দুনী বৈশিষ্ট্যের দাবিতে পাকিস্তান নামে যে একটা রাষ্ট্রীয় বিপ্লব হইয়া গেল, মুসলিম-বাংলার ও হিন্দু-বাংলার নিজ-নিজ স্বকীয়তার দাবিতে যে এক বাংলা দুই বাংলা হইয়া গেল, সে বিপ্লবের ঝড়-তুফানে যে লক্ষ-লক্ষ মানুষ জ্ঞান দিল এবং

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

কোটি-কোটি মানুষ ছিন্নমূল বাস্তুহারা হইল, তাতেও আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের পাষণ্ড হৃদয়ে ও জন্মট মস্তকে একটা আঁচড়ও লাগিল না। কলিকাতার উন্নত সাহিত্যিক ঐতিহ্যের কড়া নেশা আজো তাঁদের কাটে নাই। তাঁরা আজও কলিকাতার আর্টের আবিরে দেহ-মুখ রাংগাইয়া কলিকাতার ভাষায় হুলুধ্বনি দিয়া চলিয়াছেন।

পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয়তাকে পূর্ব-বাংলার স্বকীয়তাকে রূপায়িত ও সজীবিত করিবার, পূর্ব-বাংলার ভাষাকে সাহিত্যিক আভিজাত্য দিবার কোনও চেষ্টাই তাঁরা করিতেছেন না। বরঞ্চ পূর্ব-বাংলার ভাষিক বৈশিষ্ট্য ও কৃষ্টিত্বকে অভদ্রতা ও অশালীনতার তহমত দিয়া পশ্চিম-বাংলার শালীন ভাষায় আমাদের গুন্ধি করিবার অভিযান চালাইয়াছেন।

এ সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্র অভিমত বিভিন্ন ভাষণে ও প্রবন্ধে একাধিক-বার বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আজ তার পুনরুক্তি করিব না। শুধু এইটুকুই স্মরণ করাইয়া দিব :

## ভাষিক বিজ্ঞান

দুনিয়ার সব উন্নত ভাষার মতই বাংলারই লেখ্য ও কথ্য দুইটা রূপ। কথ্য বাংলারও স্বভাবতই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু লেখ্য বাংলা নিখিলবংগীয় ভাষা। তাতে পূর্ব-পশ্চিমা কোনও উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নাই। উহাই উভয় বাংলার পার্থ্য-পুস্তকের বাংলা বর্ণপরিচয় বালাশিক্ষা হইতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ইংলণ্ড আয়ারল্যান্ড ওয়েলস ও স্কটল্যান্ডের, এমনকি রাজধানী লণ্ডন শহরেরও নিজস্ব আঞ্চলিক ইংরাজী আছে। তা সত্ত্বেও সারা গ্রেটব্রিটেনে একটা স্ট্যান্ডার্ড ইংরাজী আছে। এটাই সাহিত্যের ও টেক্সট বুকের ইংরাজী। গল্প উপন্যাসে নাটক-নভেলে স্বাভাবিকতা ও লোক্যাল কালার দেওয়ার জন্য প্রয়োজনমত আঞ্চলিক ভাষা প্রযুক্ত হইলেও কোন আঞ্চলিক

## বাংলাদেশের কালচার

ভাষাকেই স্ট্যাণ্ডার্ড ইংরেজীতে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। অপেক্ষাকৃত উন্নত বলিয়া এক অঞ্চলের ভাষাকে অন্য অঞ্চল কদাচ তার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা করে না। এমনকি খোদ রাজধানী লণ্ডনের ভাষাও না। 'কিংস ইংলিশ' বা রাজার ইংরাজীই সর্বত্র স্ট্যাণ্ডার্ড ইংরাজী ও সাহিত্যের ভাষা।

ফ্রান্স জার্মানি ইটালি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও তাই। জার্মানিতে কান্দা জার্মান (হাই জার্মান) ও নোয়া জার্মান (লো জার্মান) নামে দুইটা আঞ্চলিক জার্মানি ভাষা প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এ দুইয়ের মধ্যে হরফ ও শব্দের উচ্চারণে ক্রিয়াপদে ও বাক্য-বিন্যাসে মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। পনের শ' একত্রিশ সালে মার্টিন লুথারের মত প্রভাবশালী উভয় জার্মানির ধর্মীয় নেতা এই দুই অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আপোস ঘটাইবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লো এবং হাই জার্মানির সংমিশ্রণের এক সংশোধিত জার্মান ভাষা সৃষ্টি করিয়া সেই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। কিন্তু সমস্বয়িত লুথারিয়ান জার্মানে হাই জার্মানের প্রাধান্য আছে, এই অজুহাতে লো জার্মানিরা লুথারের ভাষা গ্রহণ করে নাই। ফলে হাই-জার্মানি এখন তার আভিজাত্যের দাবি ত্যাগ করিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড জার্মানিকেই সাহিত্য দর্শন বিভ্রানের ভাষা বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। ফ্রান্স ইটালি ও যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেও তেমনি উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য আছে। তা সত্ত্বেও এদের সাহিত্য সাংবাদিকতা চলে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায়। প্রাধান্য তাতে স্বীকৃত হয় নাই।

সত্য দুনিয়ার সর্বত্র এই অবস্থা। একই দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যেও। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা কি? আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরা শুধু পূর্ব-বাংলার বাংলাকে নয় খোদ স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলাকে বর্জন করিয়া পশ্চিম-বাংলার কথা বাংলাকে সাহিত্যের ভাষা করিয়াছেন। শুধু গল্প-উপন্যাস সিনেমা-নাটকের পাত্র-পাত্রীর ভাষাগই নয়, স্বয়ং গল্পকারের ভাষাও এরা পশ্চিম-বাংলার কথা বাংলায় লিখিতেছেন।

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

শুধু গল্প উপন্যাসও নয়। ধর্ম দর্শন ইতিহাস ও জীবনীর মত গুরুগভীর বিষয়ের প্রবন্ধগুলিও এঁরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় লিখিতেছেন। পূর্ব-বাংলায় প্রকাশিত মাসিক ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিনগুলির সব প্রবন্ধই এই ভাষায় লেখা হইতেছে। একটি কাগযেও আর স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা-ভাষার লেখা বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

মাসিকাদি সাহিত্যিক কাগযের লেখকরাই শুধু নয়, দৈনিক সাপ্তাহিকের ফিচার রাইটাররা পর্যন্ত এই সাহিত্যিক টেডিসম চালাইয়াছেন। একমাত্র ভরসা সাংবাদিকরা, মানে রিপোর্টাররা ও সম্পাদকীয় লেখকরা। কেবল মাত্র এঁরাই প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যে সাহস করিয়া স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু আর কতদিন তাঁরা এই টেডিসমের বন্যার স্রোতের মুখে দাঁড়াইয়া এটা চালাইতে পারিবেন বলা কঠিন। কারণ সরকারী প্রচার দফতর হইতে প্রচারিত প্রেসনোট ফিচার ও নেতাদের বিরূতি বক্তৃত্যও ইদানীং এই টেডি ভাষায় লেখা শুরু হইয়াছে। মন্ত্রীদের ছাপা বক্তৃত্য এবং রেডিও টকাদিও হইতেছে এই ভাষায়। সাহিত্যের এই টেডিসম এমন ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে যে বিদেশী দূতাবাস ও ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রচারিত প্রচার-পত্র ও বিজ্ঞাপনাদিও এই ভাষায় চলিয়াছে! চলিবেই ত। ও-সবের রচয়িত্যও যে আমাদের লেখক-সাহিত্যিকরাই। এই আধুনিকতার টেডিসম ও অন্ধ অনুকরণের ড্যাঙালিসম পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিক সাংবাদিক ও সমগ্র ইণ্টেলেকচুয়েল জীবনকে পশ্চিমবংগীকরণে প্রায় সফলকাম হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা রাজ্যের চেয়ে বেশী রাজভক্ত হইয়া উঠিয়াছি।

ডাক্তার শহীদুল্লাহ ও মওলানা আকরাম খাঁ সাহেবের মত পূর্ব-পাকিস্তানী মনীষীদের মধ্যে খাঁদের জন্ম-কর্ম শিক্ষা-দীক্ষা পশ্চিম-বাংলায়, তথাকার কথ্য বাংলায় লিখিবার ও বলিবার যোগ্যতা ও অধিকার খাঁদের আছে, তাঁরা যেখানে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় লিখিতেছেন,

## বাংলাদেশের কাজচার

সেখানে পৰ্ব্বন্ত আমাদের 'খাস বাংলা' লেখক-সাহিত্যিকরা পশ্চিম-বাংলায় কথ্য বাংলা লিখিতেছেন।

শুধু কি তাই? খোদ পশ্চিম-বাংলার খ্যাতনামা লেখকরা যেখানে যেসব বিষয় স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলায় লিখিতেছেন সেখানেও এবং যেসব বিষয়েও পূর্ব-পাকিস্তানীরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় লিখিতেছেন। বোধ হয় দেখাইতে চান, তাঁরা পশ্চিম-বাংলার অনুসরণ করেন।

### অল্প অনুকরণ

একটি অতিসাম্প্রতিক নথির দেই। ঢাকার একটি মাসিক কাগজে মাত্র সেদিনকার এক সংখ্যায় এক সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ব-বাংলার একজন লেখক পশ্চিম-বাংলার বর্তমান সময়ের একজন খ্যাতনামা লেখকের লেখার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন : "তঁাহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাতপ্রতিঘাতের এবং মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। বিশ্লেষণ যাহা কিছু আছে তাহা কবিত্ব সুসমায় রূপান্তরিত হইয়া কবির উচ্ছ্বাসিত আবেগ ও গীতি ব্যঙ্গার প্রকাশ করে।" এইখানে পশ্চিম-বাংলার লেখকদের কোটেশন শেষ। পণ্ডিত লেখকেরা যেমন বিদেশী কোটেশন দিয়া অল্প বিদ্যার পাঠকদের সুবিধার জন্য দেশী ভাষায় তার ব্যাখ্যা করেন, ঠিক তেমনি পূর্ব-বাংলার উক্ত প্রবন্ধের পশ্চিম-বাংলার লেখকের উক্ত স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা কোটেশনের মর্মবাণী পূর্ব-বাংলার পাঠকদেরে বুঝাইবার জন্য নিশ্চরূপ লিখিয়াছেন? "অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে এদের লক্ষ্য যদিও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তবু তাঁরা তাঁদের উপন্যাসে বিশ্লেষণের বিজ্ঞান-সম্মত পথ ধরে অগ্রসর হননি। কাব্যিক ভাবানুষ্টি প্রতিক্ষেত্র ঘটিয়েছেন ইত্যাদি।" কোটেশন শেষ। পূর্ব-বাংলার পাঠক এইবার

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

কথাটা বুঝিলেন ত? উভয় বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষায় লেখা পশ্চিম-বাংলার লেখকের লেখাটা পূর্ব-বাংলার লেখক পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায়, অবশ্য শুধু ক্রিয়াপদে, তর্জমা করিয়া কেমন পানির মতন তরল করিয়া কত সুন্দরভাবে আপনাদের বুঝাইয়া দিলেন।

এমনি করিয়া আমাদের আধুনিক লেখকরা আমরা বাঙ্গালদেয়ে বিদগ্ধ করিবার আশ্রয় চেষ্টা করিতেছেন। তাঁদের ভাষাজ্ঞানের উত্তাপে আমরা দগ্ধ হইতেছি বটে, কিন্তু সংগে-সংগে বিদগ্ধও কিছুটা হইতেছি না কি? পশ্চিম-বাংলার বিদগ্ধ সমাজে আমরা বাঙ্গালদেয়ে গ্রহণ-যোগ্য করিবার মহৎ উদ্দেশ্যে এঁরা আমাদের মুখের ভাষার চামামিকে আর্ঘ্যমিতে শুদ্ধ করিতেছেন। আমাদের গ্রাম-বাংলার জনগণের হর-হামেশা এস্টেমালা করা মুসলিম ঐতিহ্যবাহী হাজার-হাজার লক্ষ্যকে এঁরা ভাষা-শৈলীর শলার ঝাঁটায় ঝাঁটাইয়া বই-পুস্তকের পৃষ্ঠা হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া ফেলিতেছেন। তাঁদের বদলে ভদ্রলোকের ব্যবহৃত বিগুচ্ছ আর্ঘ্য শব্দাবলীর প্রবর্তন করিতেছেন।

### মুখ শুদ্ধিকরণ

এই সংস্কারকরা আমাদের চৌদ্দ পুরুষের মুখাণ্ডি করিয়া তাঁদের মুখের খানাকে 'খাদ্য' গোশতকে 'মাংস' আঙাকে 'ডিম' সালুনকে 'ব্যঞ্জন' সুরুয়াকে 'ঝোল' বরতনকে 'খাল' নওলা-লুকমাকে 'গ্রাস' করিয়া ফেলিয়াছেন। গোসলের বদলে এঁরা আমাদের স্নান করাইতে-ছেন। আমাদের বাড়ির বিলাইকে 'বিড়াল' কুড়াকে 'কুকুর' আমাদের ঘরের চালের কাউয়াকে 'কাক' করিয়া ফেলিয়াছেন। আমাদের সমাজের আদব-কায়দা ও তমিষ-লেহাষকে শিল্পাচার বিনয়-নব্রতায় উন্নত করিয়াছেন। আমাদের 'মেহমানদেয়ে দাওয়াত' না করিয়া এঁরা 'অতিথিদের নিমন্ত্রণ' করিতেছেন। এত করিবার পরেও যাতে আমাদের কেউ বাঙ্গাল বলিয়া চিনিয়া না ফেলে, সেই উদ্দেশ্যে এই

## বাংলাদেশের কালচার

সাহিত্যিকরা আমাদেরকে পশ্চিম-বাংলার ভাষিক বিকৃতি ও স্লাম্বেজ-লিতে পর্যন্ত ট্রেনিং দিতেছেন। এই জন্যই তাঁরা লেখা স্ট্যাণ্ডার্ড এবং আমাদের কথা বাংলার তুল্যকে 'তুলো' সুতাকে 'সুতো' গুলিকে 'গুলো' নাইকে 'নাই' ও 'নি' দেওয়াকে 'দেয়া' নেওয়াকে 'নেয়া' এমন কি আরবী উল্লাকে 'উল্লা' দেওয়ানকে 'দেয়ান' করিয়া ফেলিয়াছেন। রেডিও নিউস বুলেটিন হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কর্তাদের সখের কথা বাংলাতেও যেখানে সহজেই বলা চলে : "আমাদের প্রধান মন্ত্রী আগামী এপ্রিল মাসে লণ্ডন যাবেন বলে আশা করা যায়", সেখানেও রেডিও পাকিস্তান বলিতেছেন; "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আগামী এপ্রিল মাসে লণ্ডন যাচ্ছেন বলে আশা করা যাচ্ছে।"

### কথ্য বনাম লেখ্য

বলিবার সময় কথা শব্দ ব্যবহার দরকার হইতে পারে। বলাও যাইতে পারে। কিন্তু লেখার সময় কেন? কথা ভাষা মানে পরস্পর সাক্ষাৎ বাক্যালাপ। সামনাসামনি আলাপে বক্তারা ও শ্রোতারা দুই পক্ষেই কথা বলে। সেটা হয় ডায়লগ। রেডিও ইত্যাদিতে আমরা যে 'টক' দেই তা 'টক' নয় পাঠ। রেডিও নিউস বুলেটিন যে 'বলা' হয় না 'পড়া' হয় এটা ঠিকই করা হয়। ওতে বক্তা-শ্রোতার মধ্যে ডায়লগ হয় না। শুধু বক্তার এক-তরফা কথা হয়। কাজেই টকের দোহাই দিয়া ও-সবে কথা (তাও আবার অন্য বাংলার কথা) ভাষা প্রয়োগের কোনও শৃঙ্খলা নাই। তবু উদ্র হইবার আশায় তাও আমরা করি। এতেও আমরা মূঢ় বাংগালরা পুরাপুরি উদ্রলোক নাও হইতে পারি। সে আশঙ্কা দূর করিবার জন্য এঁরা আমাদের সভাসমিতিতে শুধুমাত্র সভাপতিত্ব না করিয়া, এমন কি ঈদের জমাতে ইমামতি না করিয়া ঈদ-সমাবেশেও, পৌরোহিত্য করিতেছেন। আমাদের আত্মীয়-বিল্লোগে শোক প্রকাশ না করিয়া এঁরা স্মৃতিতর্পণ করিতেছেন।



## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য ম্যানেজারকে কর্মাধ্যক্ষ, প্র্যাজুন্সেটকে স্নাতক, আইন সভাকে বিধান সভা, গভর্নরকে প্রদেশপাল, চ্যাম্বেলারকে আচার্য ও ভাইস চ্যাম্বেলরকে উপাচার্য আখ্যা দিতেছেন। এখন প্রগতির পথে আরেকটু আগাইয়া হলের প্রভোস্টকে 'প্রকোর্টের ভট্টাচার্য' এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলকে 'মিলন সংঘ' করিয়া ফেলিলেই বাংগালরা সভ্য ও তাদের ভাষা শালীন হইয়া উঠিবে। তার আর বেশী দেরিও নাই।

আমাদের সাহিত্যিকরা একটা করিতেছেন যুগের দাবিতে আধুনিক হওয়ার তাগিদে। সাহিত্যকে যুগোপযোগী গণমুখী করিতে হইলে স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা ছাড়িয়া কথ্য ভাষায় লিখিতে হয়।

তাই তাঁরা কথ্য ভাষায় গণ-সাহিত্য রচিতেছেন। কিন্তু এঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন যে শুধু ক্রিয়াপদ ও কতিপয় শব্দ কথ্য করিলেই সাহিত্য গণ-সাহিত্য হয় না, ভাষাও সরল প্রাক্তল গণ-ভাষা হয় না। জনগণের মুখের কথায় সোজা শব্দের সহজ প্রয়োগে সরল বাক্য রচনাই কেবল ভাষাকে গণ-ভাষা ও সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিতে পারে। আবার সে কথ্য ক্রিয়াপদ ও শব্দগুলি যদি অন্যদেশের আঞ্চলিক বিকৃতি হয়, তবে বিপদ ও বিভ্রান্তির আর সীমা থাকে না।

এ সম্পর্কে ছোট পশ্চিম-বংগের ভাষা-বিজ্ঞানের অথরিটি ডাঃ সুনীতি চ্যাটার্জির মত এই : 'ভালর জন্যই হউক আর মন্দ্রর জন্যই হউক উচিতই হউক আর অনুচিতই হউক ভাগীরথী নদীর সংলগ্ন স্থানের বিশেষতঃ কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্র সমাজের কথ্য ভাষা আজকাল সাহিত্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এই ভাষা অঞ্চল বিশেষের মৌখিক ভাষা। ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবহারিকভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও নিজ মাতৃভাষার ভাষাগত রিক্ত-হিসাবে উহার বিশেষত্বের অধিকারী হয় নাই। সে জন্য অবিসংবাদিতার্থ সাধু ভাষার রাজপথ ছাড়িয়া যাঁরা কলিকাতার আঞ্চলিক ভাষার পথে চলিতেছেন, অচেনা পথে চলার জন্য তাঁদের

অনেকে এমন অনেক বিলাট ঘটাইয়া থাকেন যাহা লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই কষ্টকর। আজকালকার যে কোনও বালা দৈনিক সাপ্তাহিক মাসিক পত্রের অনেক লেখকের লেখা পড়িলেই এ কথা বেশ বৃষ্টিতে পারা যায়।’ ডাঃ চ্যাটার্জি পশ্চিম-বাংলার লেখকদের সম্বন্ধে যা বলিয়াছেন পাক-বাংলার লেখকদের সম্বন্ধে সে কথা আরও বেশী সত্য।

### আমাদের কথা ‘অকথ্য’

পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষা অশালীন। তাই আমরা পশ্চিম-বাংলার শালীন কথ্য ভাষায় পূর্ব-বাংলার জন্য গণমুখী সাহিত্য রচনা করিতেছি। যতদিন পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষা শালীন না হয়, ততদিন আমরা পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় লিখিতে থাকিব।

পূর্ব-বাংলায় কথ্য ভাষাকে লেখকরা সাহিত্যে স্থান না দিলে শালীন হইবে কেমন করিয়া? এই প্রশ্ন করিবেন? এর উত্তর সোজা। অশালীন ভাষা কারও ফরমায়েশ-মত্ত শালীন সাহিত্যের ভাষা হয় না। সে জন্য দরকার প্রতিভাধরের জন্ম। পূর্ব-বাংলায় আগে শূণ্য-প্রবর্তক আর্ট-স্পটের জন্ম হউক, তাঁর অগ্নি-করা কলমের আগায় পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষা পশ্চিম-বাংলার ভাষার সাথে প্রতিযোগিতা করিয়া পরীক্ষায় পাশ করুক। তার পরে পূর্ব-বাংলার ভাষা সাহিত্যে স্থান পাইবে। তার আগে নয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা সাহিত্যিকরা পশ্চিম-বাংলার প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সাথে প্রতিযোগিতা না করিয়াই, পশ্চিম-বাংলার উন্নত সাহিত্যের পরীক্ষায় পাশ না করিয়াই, বাংলা একাডেমি ও আদমজি-দাউদের সাহিত্য পুরস্কার নিতেছি এবং নিতে থাকিব। আমাদের পলিটিশিয়ানরাও ভারতীয় নেতাদের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়াই, ভারতীয় রাজনীতির পরীক্ষায় পাশ না করিয়াই, মন্ত্রী-মেম্বর হইতে

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

থাকিবেন। আমাদের চাকুরিয়া শিক্ষক সওদাগর শিল্পপতি কাউকেই পশ্চিম-বাংলার বা ভারতের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে হইবে না। পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হওয়ার দাবিতেই তাঁরা ও-সব করিতে পারিবেন। শুধু মাত্র পূর্ব-বাংলার ভাষা ও সাহিত্যকেই পশ্চিম-বাংলার ও ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। কি বিচার।

### লজিকের সীমা

অতএব যতদিন তা না হয় ততদিন আমাদের সাহিত্যের ভাষা, আমাদের বাংলা একাডেমি ও ইসলামিক একাডেমির মুখপত্র সহ সমস্ত মাসিক-পত্রের ও দৈনিক খবরের কাগশের ফিচারের ভাষা হইবে পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষা।

তা যদি উচিত হয়, তবে খানকতক দৈনিকের সম্পাদকীয় ও খবর সরবরাহের রিপোর্টিং-এ স্ট্যান্ডার্ড বাংলা চালাইবার আবশ্যিকতা কি? যুক্তি কোথায়? ইউনিটি ফেইথ এণ্ড ডিসিপ্লিনের খাতিরে তাদেরও উচিত আধুনিকতার এই মিছিলে যিন্দাবাদ বলিয়া শামিল হইয়া পড়া।

আর অধ্যাপক-শিক্ষক ও পাঠ্য-পুস্তক-প্রকাশক-রচয়িতাদেরও বলি, যে-ভাষা পূর্ব-বাংলার সাহিত্যে সাংবাদিকতায় চলিবে না, চাকুরি-বাকুরিতে লাগিবে না, সেই প্রাচীন স্ট্যান্ডার্ড লেখ্য বাংলা আর ছাত্রদের পড়াইয়া আপনাদের নিজেদের সময় ও ছেলেমেয়েদের মাথা নষ্ট করিতেছেন কেন? আপনারাও অতঃপর ঐকোর নামে পশ্চিম-বাংলার শালীন কথ্য ভাষায় পাঠ্য-পুস্তক ব্যাকরণাদি রচনা ও শিক্ষা দান শুরু করেন। ঐসব নয়া পুস্তক মফস্বলের ও পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলের পাঠ্য করিয়া ফেলেন। ছাত্রদের ঠিকমত উচ্চারণ শিখাইবার জন্য পশ্চিম-বাংলা হইতে শিক্ষক আমদানি করুন। পাড়াগাঁয়ের শিশুরা

পর্যন্ত পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষায় চিত্রিত-পত্র ও রচনা লিখিতে ও পড়িতে পারিবে।

শিশুদের বাপ-দাদারাও ঐ ভাষাতেই রেজিস্টারি আফিসের দলিল-তমসুক, আদালতের আরশি-দরখাস্ত, থানা-পুলিসে এযহার ও সভা-সমিতির প্রস্তাবাদি লিখিতে পারিবেন। পূর্ব-বাংলা অন্ততঃ লেখা-পড়ায় পশ্চিম-বাংলা হইয়া যাইবে। আমরাও আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি পশ্চিম-বাংলার হেফায়তে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিত হইতে পারিব।

### আত্ম-বিশ্বাস

ঠাট্টা-তামাশা নয়। আমাদের অবস্থা সত্যই এই। কিন্তু কেন এমন হইল? কেন আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে এমন স্বকীয়তা-বিরোধী আত্ম-মর্ষাদা-বোধহীন বিদেশী প্রবণতা দেখা দিল?

যে পূর্ব-বাংলার ভাষার সারা গায় মুসলিম তমদ্দনের ছাপ, যে পূর্ব-বাংলার প্রচলিত যবানী গণ-ভাষার শতকরা মাইটটার মত লক্ষ্য আরবী ফারসীমূলক শব্দ, কলিকাতার হিন্দু সাহিত্যরথীরা যে জন-গণের ভাষাকে মুসলমানী বাংলা বা দুভাষী বাংলা বলিয়া সাহিত্যে স্থান দিতে অস্বীকার করিলেন, যে অন্যান্য অস্বীকৃতিই মুসলিম-বাংলার ভাষিক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-বোধের জন্মদাতা, মুসলিম-বাংলার যে স্বাতন্ত্র্যবোধই শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান হাসিলে রূপায়িত, সেই পূর্ব-বাংলার ভাষার প্রতি পাকিস্তানের খাঁটি সন্তান তরুণ সাহিত্যিকদের মনে এমন বিতৃষ্ণা এমন নফরত এমন হেকারত পল্লদা হইল কেমন করিয়া? কেন তারা তাহবিব-তমদ্দনের চেয়ে কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে অধিক ভাল-বাসে? কেনই বা এরা দোআ-খাম্বের অপেক্ষা আশীষ-আশীর্বাদ বেশী চায়? কেন তারা তারিফ-তাশিমের চেয়ে প্রশংসা-সম্মানের বেশী আকাঙ্ক্ষী? কেনই বা তাদের জিভে আগার চেয়ে ডিমে এবং গোশ্বতের চেয়ে মাংসে এত বেশী স্বাদ লাগে?

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

বহুদিন গভীর চিন্তা করিয়াও এ-সব প্রশ্নের কোন উত্তর পাই নাই। কিন্তু সেদিন বয়সে আমারও মুরুব্বি একজন প্রবীণ সাহিত্যিক-রাজনীতিক এর একটা জবাব দিয়াছেন। তিনি বলেন, পূর্ব-বাংলার তরুণদের সংগত কারণেই উর্দু-ফোবিয়ায় পাইয়াছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্র-নায়কদের উর্দুর দিকে অতি উৎসাহকেই তিনি ফোবিয়া সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন। পূর্ব-বাংলার কথ্য ভাষায় আরবী ফারসী শব্দের প্রাচুর্য হেতু এ ভাষা উর্দুর কাছাকাছি। এই সূক্তিতেই নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র-ভাষা করার এবং অন্ততঃ আরবী হরফে বাংলা লেখাইবার চেষ্টা করেন। এর ফলে আমাদের তরুণদের মনে স্বভাবতঃই এই ডর সাজাইয়াছে যে, যতদিন আমাদের ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য থাকিবে, ততদিন উর্দুর হামলার সম্ভাবনা দূর হইবে না। তাই তরুণ সাহিত্যিকদের এই আরবী-ফারসী-বিরোধী অভিযান। তাঁর সূচিস্থিত মত এই যে, আমাদের তরুণদের সাম্প্রতিক রবীন্দ্র-ভক্তির আতিশয্য আসলে আমাদের ঘাড়ে ইকবাল চাপাইবার অস্ত্র চেষ্টার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া মাত্র।

কিন্তু আমরা উভয়েই একমত হইয়াছিলাম, এ ডর অমূলক ও হাস্যকর। আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য সত্ত্বেও যখন আমরা উর্দুর দুই-দুইটা হামলার সামনে টিকিয়া আছি, তখন ভবিষ্যতেও থাকিব। সে হামলার ভয়ে আমরা ঐতিহ্য বিসর্জন দিব না। বিশেষতঃ আমাদের ছাত্র-তরুণরা বাংলার জন্য জান কোরবানি করিয়াছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের ইকবালকে বাংলাদেশের মাথার উপর হইতে সরাইয়া পশ্চিম-বাংলার রবীন্দ্রনাথকে মাথায় বসাইবার জন্য নয়। তারা এটা করিয়াছিল বাংলাদেশের নিজস্ব ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির জন্য। তা ছাড়া মুখের ভাষায় আরবী-ফারসীর প্রাচুর্য যদি ঐ কারণেই বর্জন করিতে হয়, তবে ঐ সূক্তিতেই আমাদের সব মুসল-মানের এবং সব কল্পটা বাংলা দৈনিকের আরবী-ফারসী নাম বদলাইয়া রাখিতে হয় সংস্কৃত নাম।

## পোশাকে গোলামী

এতক্ষণ ভাষার কথা বলিলাম। এইবার আসুন পোশাকের কথাটা আলোচনা করি। ভাষা ও সাহিত্যের মতই আমরা পোশাক-পাতিতেও নয়া জাতীয়তার উদ্দীপনার ও নয়া যিন্দেগি উপলব্ধির কোন প্রমাণ দিতেছি না।

আমাদের প্রেসিডেন্ট-মিনিস্টার হইতে শুরু করিয়া চূনাপুঁটি অফিসাররা পর্যন্ত, আইন সভাসমূহের স্পীকার-মেম্বর হইতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত আদালতের জজ-ম্যাজিস্ট্রেট হইতে শুরু করিয়া উকিল-ব্যারিস্টার-মোখতার পর্যন্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর হইতে শুরু করিয়া প্রফেসার-লেকচারার পর্যন্ত, শিল্প-বাণিজ্যের বড়কর্তা হইতে শুরু করিয়া কেরানিকুল পর্যন্ত সকলে, এক কথায় সারা পাকিস্তানের গোটা সুখী সমাজই, আজও গোলামি যুগের বিদেশী পোশাকেই আমাদের লজ্জাহীন লজ্জা ডাকিয়া বেড়াইতেছেন।

গুটিকতক 'পুরাতনপছী' লোক বাদে আর সবাই প্রগতির নামে ভূতপূর্ব মনিবদের তকমা আজও বহন করিতেছেন। তাঁরা পিঠে কোট চড়াইয়া ও গলায় টাই-এর দড়ি বাঁধিয়া নিজেদের আজাদির পিঠে বোঝা ও তাহযিব-তমদ্দুনের গলায় দড়ি দিতেছেন।

যেন গোলামি যুগের আগে পাকিস্তানবাসীদের কোন সভ্য শালীন পোশাক ছিল না। সভ্য পোশাকওয়ালারা ইংরাজরাই যে ন্যাংটা পাকিস্তানবাসীকে সর্ব-প্রথম সভ্য পোশাক পরিতে শিখাইয়াছেন। যেন এই কারণে কৃতজ্ঞতাভাষে ভক্তিতে আমরা আঘাদির ষোল বছর পরেও বরফের দেশের ইংরেজের মোটা পোশাকের ডাব্বি এবং দামী বস্তাটা পিঠে করিয়া বেড়াইতেছি।

দামের কথাটা যখন উঠিয়াই পড়িল তখন সেটাই আগে বলিয়া ফেলি। জামা-পাজামা লুংগি-পাজাবি কুর্তা-সদরিয়া ও আচকান-শির-ওয়ানিতে আজ আমাদের মন ওঠে না। তাই আমরা দশগুণ দামে

## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

কোট-প্যান্ট-টাই লাগাই। কোট-প্যান্ট-টাইএর সাথে মিশ খাওয়ালেই আমাদের তিনগুণ দামে শু কিনিতে হয়।

তাতে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে যে-দেশের জনপ্রতি বাষ্মিক আয় গড়ে এক শ আশি টাকা, যে-দেশের জনগণ শীতাতপে শরীর রক্ষা ত দুন্নের কথা ছতর চাকিবাবর কাপড় পায় না, সেই দেশের নেতা ও সুধী সমাজের প্রত্যেকে একসেট পোশাক বানাইতে খরচ করেন সে বাষ্মিক আয়ের তিনগুণ। এই লজ্জাকর অর্থনৈতিক বৈষম্যটাই আমাদের কর্তব্য নির্দেশের জন্য যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল।

তার উপর আছে জাতীয় আত্ম-মর্যাদার প্রশ্নটা। সরকারী মিটিং-কনফারেন্স, সামাজিক বৈঠক-মজলিস, আনন্দ-উৎসবের ক্লাবপার্টির কোথাও গিন্মা আপনি বুঝিতেই পারিবেন না সমবেত উন্নলোকেরা পাকিস্তানেরই লোক। কার বাপের সাধ্য বলিবে এঁরাই ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানের ভাগ্য-নিয়ন্তা নাগরিক ?

ছেলেরা সব টেডি হইয়া ষাইতেছে বলিয়া বাপ-চাচা মুক্লব্বিদের হান্ন-আফসোসের সীমা নাই। এঁরা নিজেরা যখন বিলাতী টেডিষম করিতে লজ্জা পান না, তখন তাঁদের ছেলেরা মাকিন টেডিষম করিতে লজ্জা পাইবে কেন ? যাঁরা নিজেরাই নিজস্বতায় বিশ্বাসী নন, তাঁদের ছেলেরা স্বকীয়তা পাইবে কোথায় ?

এই সব কথা কেউ প্রাচীন-প্রীতি প্রগতি-বিরোধী নস্টালজিয়া মনে করিবেন না। প্রগতি-বিরোধী প্রাচীন পন্থী নস্টালজিক আমি নই। আমি উন্নয়নক প্রগতিবাদী। অনেকের চেয়ে বেশী বিপ্লবী। আমাদের সুধী সমাজ ও তরুণরা প্রগতি ও বিপ্লবের পথে বেশী মাত্রায় আগাইয়া গিন্মাছে, এটা আমার অভিযোগ নয়। বরঞ্চ আমার অভিযোগ, মোল বছরের আষাদির জীবনে এরা এক পা অগ্রসর হয় নাই।

মোল বছর আগে যেখানে তারা ছিল, আজো সেইখানেই আছে। গোলামির মূগে লগনে বসিন্মা বিদেশী শাসকরা যে ভাষায় ও যে

পোশাকে আমাদের শাসন করিতেন এবং শাসকদের অনুকরণে যে রাজপোশাক পরিয়া এবং যে রাজ-ভাষা বলিয়া আমরা গৌরব বোধ করিতাম, আষাদির আমলে ঢাকা-পিন্ডিতে বসিয়া দেশী শাসকরা সেই পোশাকে সেই ভাষায় আমাদের শাসন করিতেছেন। পোশাকে ও ভাষায় আমরা আজও তেমনিভাবে রাজ-পুরুষদের অনুকরণেই গর্ব-বোধ করিতেছি।

সত্তর কোটি চীনার নেতা চৌ-এন লাই নিজের জাতীয় পোশাক পরিয়া এবং চল্লিশ কোটি ভারতীয়ের নেতা নেহরু আমাদের পোশাক পরিয়া আমাদের দেশে আসেন। আর আমরা তাঁদের অভ্যর্থনা করি ইংরেজী পোশাক পরিয়া।

### গোলামী সাহিত্য

আষাদি-পূর্ব যুগে হিন্দু-প্রধান কলিকাতা অবিভক্ত বাংলার কৃষ্টি-কেন্দ্র থাকা কালে পূর্ব-বাংলা লেখক-সাহিত্যিকরা পরাধীন পরিবেশের চাপে যে-ভাষায় যে-ধরনের সাহিত্য রচনা করিতেন, আষাদি যুগে মুসলিম-প্রধান ঢাকার মুক্ত আবহাওয়াও তাঁরা আগের মতই পরানুকরণে পনের ভাষায় গোলামি সাহিত্য রচনা করিয়া চলিয়াছেন।

অধিকন্তু স্বাধীনতা-প্রাপ্ত পশ্চিম বাংলা তার নিজস্ব কৃষ্টি-সাংস্কৃতিকে নিজস্ব ধারায় বিদ্যৎ গতিতে আগাইয়া নিয়া চলিয়াছে। তাই দেখিয়া আমরা তাদের অনুকরণে তাদেরই পথে তাদেরই পিছনে ধাওয়া করিতেছি। না বুঝিয়া ছোট মুখে বড় গলায় বড়-বড় কথা আওড়াইতেছি। বলিতেছি সাহিত্য সার্বজনীন, আর্ট দেশ-কালের উর্ধে ইত্যাদি।

আমরা ভুলিয়া যাইতেছি, ওসব বড় কথার অর্থ দেশহীনতা নয়। দেশ ও কালের উর্ধে হাওয়ায় আর্ট সৃষ্টি হইতে পারে না। প্রগতিও আসিতে পারে না। যতই দক্ষ হউক, পরানুকরণ বিপ্লব বা প্রগতি



## ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা

নয়। প্রগতি বিপ্লব ও রেনেসাঁ কেবল শ্রবণীয়তার মধ্যেই সম্ভব। আমরা আজও তা বুঝি নাই। কি মনে কি চিন্তায় কি সাহিত্যে কি সংস্কৃতিতে কি দেহে কি পোশাকে কোথাও আমাদের হাওয়া আমাদের স্পর্শ করে নাই। ফলে আমাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পিণ্ডির উপর, পোশাক-নৈতিক কর্তব্য লণ্ডনের উপর এবং সাহিত্য-নৈতিক বিচার-ভার কলিকাতার উপর ছাড়িয়া দিয়া আমরা দিব্য নিশ্চিন্তে বড় আরামে দিন কাটাইতেছি।

## ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী

এই সার্বজনীন পরকীয়তার পক্ষাঘাত হইতে আরোগ্য লাভই ভাষা আন্দোলনের মর্মবাণী। আমরা একটা জাতি। স্বকীয়তা আমাদের অধিকার ও দায়িত্ব। মুসলমান হওয়াটাই সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নয়। পূর্ব-বাংগালী হওয়াটাই সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা নয়।

আমাদের দেশ ও ধর্ম লইয়াই আমরা একটা জাতি। যে ভাষায় আমরা কথা কই, সে ভাষা নিজেই একটা জাতীয় ভাষা। আমরা নিজেরা যদি অসভ্য অভদ্র ও অশালীন না হই, তবে আমাদের মুখের ভাষা অসভ্য ও অশালীন হইতে পারে না। আমরা যেমন দেশের মাটি ত্যাগ করিতে পারি না, তেমনি মুখের ভাষাও ত্যাগ করিতে পারি না। দেশের মাটি আমাদের যতই শিল্পহীন অসুন্দর অনুর্বর হউক, বুদ্ধি-কৌশল ও শ্রমের দ্বারা তাকেই আমরা শিল্পায়িত সুন্দর ও উর্বর করিয়া তুলিব।

তেমনি আমাদের জাতীয় ভাষা যতই ঋটিপূর্ণ হউক, সংস্কার করিয়া তাকেই আমরা সভ্য জাতির যুগোপযোগী ভাষা করিয়া তুলিব। একটা স্বাধীন রাষ্ট্র চালাইবার যোগ্যতা যদি আমাদের মধ্যে থাকিয়া থাকে, তবে স্বাধীন জাতির সাহিত্য সৃষ্টি করিবার যোগ্যতাও আমাদের ভাষায় সুপ্ত রহিয়াছে। এই সুপ্ত অনুভূতির

## বাংলাদেশের কালচার

নিঃশব্দ তন্ত্রীতে বাংকার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের ছাত্র-তরুণরা শহীদ হইয়াছিল। সে আত্মত্যাগকে ব্যর্থ হইতে আমরা দিতে পারি না।

সভ্য মানুষ হিসাবে আমরা প্রাচীন হইলেও নেশন হিসাবে আমরা তরুণ। শত-শত বৎসর ধরিয়া আমরা পরাধীনতার মিন্দানখানায় বন্দী ছিলাম। চলার কায়দা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সদ্যমুক্ত দায়মুলের কয়েদীর মতই আমরা প্রাথমিক জড়তায় ভুগিতেছি। এই জড়তা সাময়িক। এটা কাটিয়া যাওয়ার পর আমরা এতদিনের হারানো সময় উসুল করিবার জন্যই দুর্বীর গতিতে আগাইয়া চলিব। যুগ-যুগ ধরিয়া আমাদের মুখের ভাষা অবরুদ্ধ ও অপাংক্ত্য ছিল। আজ আমরা মুক্ত-কণ্ঠ বটে, কিন্তু যুগ-যুগান্তরের অবরোধে গলা আমাদের আড়লট। এই প্রাথমিক আড়লটতা কাটিবার পর আমাদের মুখের ভাষা সদ্য-পঞ্জরা-মুক্ত পাখীর মতই নিজের সুরে গলা ফাটাইয়া গান করিয়া নীল আকাশে উড়িয়া ফিরিবে। বাঁধ-ভাংগা নিরুদ্ধ যৌবনের জোয়ারের স্রোত আমাদের জীবনের দুই কূল ছাপাইয়া গোটা জাতিকে প্রাণ-রসে প্রাবিত করিবে। সে রসে সঞ্জীবিত হইয়া আমাদের জীবনে বহু তরুণতা আবার ফুলে-ফলে মঞ্জরিত হইয়া উঠিবে। আমাদের দেশ হইয়া উঠিবে নিজস্ব তমদ্দুনে রঞ্জিত ও প্রাণবন্ত শিল্প-সাহিত্যের ফুলবাগিচা।

এইভাবে আমরা নতুন করিয়া নিজেদের এবং নিজেদের দেশকে চিনিতে পারিব। এটাই হইবে পূর্ব-বাংলার রি-ডিসকভারি। সেই দিন হইব আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত গবিত ও গৌরবান্বিত জাতি। পাকিস্তান হাসিলের ইহাই ছিল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য রূপায়ণের পথনির্দেশই ভাষা আন্দোলনের মর্মকথা।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪

# পাক-বাংলার রেভেন্সাঁ



হাযেরানে মজলিস,

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সন্মিলনীর এহ পয়লা বৈঠকের মূল সভাপতি মনোনীত করে আপনারা আমাকে সরফরায করেছেন। সে জন্য আপনারা আমার শুকরিয়া জানবেন।

এ জলসা শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের পয়লা বৈঠক নয়। এ ধরনের সন্মিলন সারা ভারতেও এই প্রথম। কাজেই এই সন্মিলনীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও নিয়ত-মকসেদ সম্বন্ধে শুরুতেই কিছু আরম্ভ করা দরকার। এই সন্মিলনীর অভির্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি সাহেব এ বিষয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছেন। তিনিই পূর্ব-পাকিস্তানের রেনেসাঁ সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ। সুতরাং এ ব্যাপারে কথা বলবার অধিকার ও যোগ্যতা সবচেয়ে বেশী তাঁরই। তাঁর মুখে আপনারা যে-সব মূল্যবান কথা শুনেছেন, সে-সব আমি আর দুহুরাতে চাই না। আমি আর এক দিক থেকে দু'চারটি কথা আরম্ভ করছি। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সন্মিলনীর মর্ম-কথা বুঝতে হলে আগে 'পাকিস্তান' ও 'রেনেসাঁ' দুটি কথারই তাৎপর্য গওর করে বুঝতে হবে।

### পাকিস্তান কি ?

পয়লা ধরা যাক 'পাকিস্তানের' কথা। 'পাকিস্তান' মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবি। মুসলিম লীগই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত। এ-কথায় তাঁদের সন্দেহ রয়েছে তাঁদেরও নিশ্চয়ই এটা জানা আছে যে, মুসলিম লীগ ছাড়া আর যে-সব রাজনৈতিক দল মুসলমান সমাজে রয়েছে তাঁরাও প্রকারান্তরে ও ভাষান্তরে পাকিস্তানেরই

কথা বলছেন। সুতরাং পাকিস্তান দাবিকে নিঃসন্দেহে মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলা যেতে পারে। তবু এই পাকিস্তান নিয়ে রাজনীতিক মহলে তর্ক-বিতর্কেরও সীমা নেই; রাগারাগি গালাগালিরও অন্ত নেই। কিন্তু এ হলো অস্বাভাবিক নয়। কারণ এটা একটা নয়া কথা। নতুন যতই দরকারী ও স্বাভাবিক হোক, বিনা-প্রতিবাদে বিনা-হল্লায় কেউ কখনো তাকে গ্রহণ করে নি। মা যেমন করে দামালকের মধ্যে নয়া শিশু প্রসব করেন, জাতিও তেমনি দামালকের মধ্যে নয়া চিন্তা প্রসব করে। রাজনৈতিক মহলে আপনারা আজকার দিনে যে দামালকে দেখেছেন, আমরা সাহিত্যিকরা এটাকে তাই জননীর প্রসব-বেদনার চীৎকার বলেই দার্শনিক নিঃশব্দতায় গ্রহণ করছি।

কারণ রাজনীতিকের বিচারে ‘পাকিস্তানের’ অর্থ যাই হোক না কেন, সাহিত্যের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আযাদি, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কালচার্যাল অটনমি। রাজনৈতিক আযাদি ছাড়া কোন জাতি বাঁচতে পারে কি না সে প্রশ্নের জবাব পাবেন আপনারা রাষ্ট্র-নেতাদের কাছে। আমরা সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পারি যে, তমদ্দুনী আযাদি ছাড়া কোন সাহিত্য বাঁচতে পারে ত পরের কথা, জন্মাতেই পারে না।

রাজনৈতিক পাকিস্তান নিয়ে বাদ-বিতণ্ডা এই জন্য যে, এতে হিন্দু ও মুসলমানকে এক রাজনৈতিক জাতি বলা হচ্ছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানরা আলাদা জাতি কি না, তা নিয়ে ত তর্কের কবকাশ আছে : কিন্তু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তারা যে আলাদা জাতি, এতে কোনো তর্কের জায়গা নেই। এই সন্মিলনীর তাহযিব-তমদ্দুন শাখার পড়াপড়ির ভাষণ থেকে আপনারা তা ভাল করেই জানতে পারবেন। এ কথা মানি যে, হিন্দুর সংস্কৃতিতে ও মুসলমানের তমদ্দুনে এক শ’ একটা মিল রয়েছে। কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, তাদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে প্রচুর। এ কথা আপনারা সবাই জানেন যে, জীব-জীব, জাতিতে-জাতিতে, এমন কি ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতেও মিলটা সত্য নয়,

## পাক-বাংলার রেনেসাঁ

গরমিলটাই সত্য। কারণ ঐটাই সত্তা। ঐটুকু দিয়েই এককে অন্য থেকে আলাদা করে চেনা যায়। 'আমি' ও 'তুমি'র মধ্যে এক শ' একটা মিল রয়েছে। তার তুলনায় গরমিলের সংখ্যা কত কম! তবু আমরা 'আমি' ও 'তুমি'র বিচার করি ঐ গরমিল টুকু দিয়েই, মিল টুকু দিয়ে নয়। এমন কি মানুষ-পশুতেও গরমিলের চেয়ে মিলের সংখ্যাই কি বেশী নয়? তবু ঐ গরমিল টুকুকেই আমরা মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব করে থাকি।

### কালচার্যাল অটনমি

সংস্কৃতির ব্যাপারটাও এই। শুধু হিন্দু-মুসলিমের নয়, তামাম দুনিয়ার সকল জাতির সংস্কৃতিই মূলতঃ এক। তবু জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য কত সুস্পষ্ট। হরেক জাতির রাজনৈতিক আখ্যাদি নিশ্চয়ই হবে অদুরাগত ভবিষ্যতের যুগবাণী। কিন্তু সে রাজনৈতিক স্বরাজের সার্থকতা হবে জাতির স্বকীয় নিরংকুশ বিকাশে। এই বিকাশের মর্মবাণী হচ্ছে তমদ্দনী আখ্যাদি বা কালচার্যাল অটনমি। এরই নাম পাকিস্তান। কৃষ্টিগত পর-সহিষ্ণুতা পাকিস্তানের বুনিন্দাদ। "লাকুম দিনুকুম ওলিয়াদিন, তোমার ধর্ম তোমার আমার ধর্ম আমার" কোরানের এই উদার বাণীই পাকিস্তানের গোড়ার কথা।

ভারতের বৃকে এ বাণী স্পন্দিত হয়েছে, ভারতের মাটিতেই এর পরখ হবে, এটা খুবই স্বাভাবিক হয়েছে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক-একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ও মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। পদ্মফুল ও বসরাই গোলাপ শ্বেমন করে একই বাগিচায় নিজ-নিজ স্থানে প্রস্ফুটিত হতে পারে, ভারতের বৃকেও তেমনি হিন্দু ও মুসলিম-সংস্কৃতিকে নিজ-নিজ স্বকীয়তায় বাড়তে দিতে হবে। যাঁরা অতীতে হিন্দু-মুসলিম-সংস্কৃতিকে ভেঙ্গেচুরে এক করতে চেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধুতায় শ্রদ্ধা জানিয়েও আমরা বলতে বাধ্য, তাঁরা

ঠিক কাজ করেন নি। ঠিক কাজ করেন নি এই জন্য যে, তাঁরা, চেয়েছেন এই উভয় সংস্কৃতিকে তাদের প্রাণ-ধর্ম বা ফাণ্ডামেন্টাল থেকে বিদ্যুত করতে। তাঁরা প্রকৃতির বিরুদ্ধে চেষ্টা করেছেন বলেই যুগে-যুগে সে চেষ্টা তাঁদের ব্যর্থ হয়েছে। ভারতীয় মনীষা তাতে নিজের শ্রান্তি উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই আজ পাকিস্তানবাদের উদ্ভব হয়েছে।

অনেক বন্ধুর ধারণা, পাকিস্তান আন্দোলনটা প্রগতি-বিরোধী। কারণ এতে জোর দেওয়া হচ্ছে ধর্মোন্মাদনার দিকে এবং তাতে করে উপেক্ষা করা হচ্ছে বিজ্ঞান প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধিকে। বন্ধুদের এ কথাটা শুধু যে শুলদর্শী ও অজ্ঞতা-প্রসূত তাই নয়, কথাটা অবৈজ্ঞানিকও বটে অনৈতিহাসিকও বটে। কারণ কোন জাতি বা মানব-গোষ্ঠীই নিজের সংস্কৃতিকে এড়িয়ে বা ডিঙিয়ে প্রগতির পথে এগুতে পারে না। যারা সে চেষ্টা করে, তারা অনুকরণ করে মাত্র, সৃষ্টি করে না। দুনিয়ার প্রগতিতে কোনো দান করতে তারা পারে না। অতএব সংস্কৃতিই হচ্ছে সকল জাতির জীবন সাধনার বুনியাদ। আর এই সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম-বীজেরই ফুলে-ফুলে-মঞ্জরিত জীবন্ত গাছ। কিন্তু ঐ তথাকথিত প্রগতিবাদী বন্ধুরা কথাটা সহজে বুঝতে চান না। তাঁরা বলেন, বিজ্ঞানের প্রসারের দ্বারা মানব-মন যতই বিকশিত হবে, ধর্মীয় বাধা-বন্ধ ও সীমা-সরহদ ভেঙে ততই মানব এক-ধর্মী হয়ে যাবে। তারা তখন স্থানীয় ও জাতীয় ধর্ম ছেড়ে এক উদার উগ্‌মাহীন আন্তর্জাতিক ধর্ম গ্রহণ করবে। সে ধর্মের নাম হবে হিউন্যানিয়াম।

### ইউনিফর্মিটি নয় বৈচিত্র্য

কথাটা নতুন নয়, অসাধারণও নয়। যাঁরা মানুষের প্রাণ-ধর্মে বিশ্বাসী নন যাঁরা যন্ত্র-ধর্মে বিশ্বাসী, তাঁরাই মানুষের মধ্যে এই যান্ত্রিক ইউনিফর্মিটি আনতে চান। অনেক দেশে অনেক জাতিতে এ যন্ত্রবাদের



পরখ হয়েছে। ইউরোপের পরখটা ত মাত্র সে দিনকার কথা। মধ্য যুগীয় ধর্মান্তরার গোড়ামির বিরুদ্ধে তৎকালের চিন্তা-নায়করা যে বিদ্রোহ করেছিলেন, তা হিউম্যানিয়ম নামক নয়া ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তা বেশীদিন টেকে নি। টেকে নি এই জন্য যে, ওটা স্বাভাবিক নয়। বাস্তবমানব-জীবনের সংগেও মতবাদের কোন যোগ নেই। তাই পণ্ডিতেভরা ইউরোপের বুকোও আজ ঐ মতবাদের প্রসার নেই। আল্‌ডুয়াস হাকসলি প্রমুখ জন কতক সাহিত্যিক আজো হিউম্যানিয়মের গান গাইছেন বটে, কিন্তু সে গান জোরালো জীবন্ত কোরাস গান নয়, ওটা গতাসুপ্রায় ক্ষীণ কণ্ঠের বহুদূর-নিঃসৃত সোলোর রেশ মাত্র। বস্তুতঃ প্রাণ-ধর্মই জীবন ধর্ম, যান্ত্রিক ঐক্য বা মিকানিক্যাল ইউনিফরমিটি জীবন-ধর্ম নয়। তাই শুধু ইউনিফরমিটি দিয়ে ধর্মের প্রাণ যাচাই করা চলে না। শুধু দুনিয়ার লাভ-লোকসান দিয়ে ধর্মের বিচার করলে সেটা আর ধর্ম থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসাদারি। শুধু শরীর দিয়ে ধর্মের বিচার করলেও ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় প্যাগানিয়ম। তা যদি হয়, তবে সে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞান বা মেটাফিজিক্স শুভংকরীর আর্চার কাছে হয় পরাজিত। মানুষ যতই স্বার্থপর ক্ষুধাতুর হোক, তার দৈহিক প্রয়োজন যতই দুর্বীর হোক, তার কলেক-টিভ মন ও সমষ্টিগত সত্তা আত্মার দৈন্য ও শূন্যতা বেশী দিন বরদাশ্ত করতে পারে না। কারণ মানুষ আর যাই হোক, একটা যন্ত্র। তার একটা প্রাণ আছে।

সোজা কথায় সমস্ত দুনিয়ার জীব-জন্তু ও গাছ-পালার জন্য যেমন একই মাটি একই আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না, তেমনি সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্যও একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই কালক্রমে সমস্ত সংস্কৃতির আইল ভেঙে একই সংস্কৃতির বিশ্বজোড়া মাঠ তৈরী হবে, এ আশা যারীরা কচ্ছেন, তাঁরা প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার কচ্ছেন। কাজেই এ বাণী ভবিষ্যৎ বিশ্বের বাণী হতে পারে না। যদি তেমন চেষ্টা হয়

তবে সেটা হবে কালচার্যাল ফ্যাশিয়ম বা তমদ্দুনী যুলুমবাযি। তার চেয়ে বরঞ্চ বিভিন্ন অঞ্চল ও আবহাওয়ার মানবগোষ্ঠী নিজ-নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বুনিন্মাদে আত্মবিকাশ করবে, প্রগতি ও কল্যাণের পথে হবে তাদের ভেতর সুন্দর ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা, খোদার বিচিত্র দুনিয়ায় রচিত হবে কল্যাণমুখী বৈচিত্র্যের এক বাগিচা : এইটাই ত সহজ, এই ত স্বাভাবিক, এই ত বৈজ্ঞানিক সত্য।

### রাষ্ট্র-দর্শন নয় জীবন-দর্শন

সুতরাং পাকিস্তান রাষ্ট্র-দর্শনের কথা নয়, এটা জীবন-দর্শনের কথা। পাকিস্তান শুধু মুসলমানের জীবন-বাণী নয়, শুধু ভারতের হিন্দু-মুসলিমেরও বাণী নয়। পাকিস্তান সারা দুনিয়ার অদুরাগত ভবিষ্যতের বাণী।

এইবার আসুন পূর্ব-পাকিস্তানে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাতি নয়। তাদের সংস্কৃতিও এক নয়। এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি নিজেরা এক-একটা আন্ত জাতি? অথবা তাদের সংস্কৃতি এক-একটা আন্ত কৃষ্টি? তা' নয়। আরবী তুর্কী ফারসী আফগানরা একই মুসলমান হয়েও এক জাতি নয়। ইংরাজ ফারসী ইতালীয় জার্মান একই খৃষ্টান হয়েও এক জাতি নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম সংস্কৃতির সম্পর্ক তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম। বীজ থেকেই গাছের জন্ম। আবার গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে। সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবুও গাছ ও বীজ এক নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতি এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে-সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ ও সমৃদ্ধি।

## পাক-বাংলার রেনেসাঁ

এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের সরহদ্দ। এই খানেই পূর্ব-পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা। এই জন্যই পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত। ইতিহাস শাখার সভাপতির ভাষণে এই দিকটার সুন্দর আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন।

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি তাই পূর্ব-পাকিস্তানেরই রেনেসাঁ আনতে চায়। পূর্ব-পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক ইউনিট। কিন্তু সাহিত্যিকের চোখে, বিপ্লবীর বিচারে, মানুষ ছাড়া ভূগোলের কোনো আলাদা সত্তা নেই। তাই রেনেসাঁ সোসাইটি পূর্ব-পাকিস্তান বলতে এই ইউনিটের বাশেন্দাদেরই বুঝে থাকে। সোসাইটি তাই ভূগোলের নয় মানুষের রেনেসাঁ আনতে চায়।

### রেনেসাঁ কি ?

এখন প্রশ্ন উঠে : রেনেসাঁ কাকে বলে? জাতির মরা হাড়ে জীবনের বিদ্যৎ চমকানোকেই আমরা এক কথায় রেনেসাঁ বলে থাকি। রাষ্ট্র-সমাজে শিল্পে-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে, এক কথায় জীবনের সকল স্তরে, বিপ্লব আনার নাম রেনেসাঁ। অনেক বন্ধু বলছেন : বিপ্লব আনবে, তবে রিভলিউশন বলছো না কেন? কেউ কেউ আবার বলছেন : জাতিকে জাগাবে, ত রিফরমেশন বা রিভাইভ্যাল নাম না রেখে সোসাইটির নাম রেনেসাঁ রাখলে কেন?

এর উত্তর খুবই সোজা। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির নাম 'রিভলিউশন সোসাইটি' হয় নি এইজন্য যে, রিভলিউশন দ্বারা আমরা সাধারণতঃ রাষ্ট্র-বিপ্লব বুঝে থাকি। কিন্তু আমরা সাহিত্যিক, রাষ্ট্র-নেতা আমরা নই। কাজেই আমরা শুধু রাষ্ট্র-বিপ্লবে সম্বল্ট হতে পারি না। আমরা চাই জাতির সর্বাঙ্গীন বিপ্লব। আর সে বিপ্লব

হবে জনগণের কল্যাণে রূপায়িত। শুধু রাষ্ট্র-রূপের পরিবর্তনে অথবা রাষ্ট্র-নেতার হাতফেরিতে পর্যবসিত হবে না সে বিপ্লব। রিভলিউশনে যে রাষ্ট্র রূপায়ন হবে, তাতে গণকল্যাণ হতেও পারে, নাও হতে পারে। তাতে বিপ্লবীরও জয় হতে পারে, আবার প্রতি-বিপ্লবীরও জয় হতে পারে। কিন্তু রেনেসাঁর পথে যে সর্বাঙ্গীন জয়লাভ হবে, তাতে এ-ডিক্টেটর বা ও-ডিক্টেটরের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না; প্রতিষ্ঠিত হবে এক আল্লাহর রাজত্ব। সে রাষ্ট্রে তখন এ-শাসক ও-শাসিত বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে স্বরাট; সকলে হবে সমান। সে রাজ্যে এ-ধনিক আর ও-শ্রমিক বলে কেউ থাকবে না। সব ধনের মালিক হবেন আল্লাহ। আর আল্লাহর ধনের সমান ভোগী হবে তার সকল বান্দা। এ জন্য রেনেসাঁ সোদাইটী রিভলিউশনের চেয়ে রেনেসাঁয় বেশী বিশ্বাসী।

### রিফরমেশন নয় কেন ?

তারপর রিফরমেশন নয় কেন ? রিফরমেশন ধর্মীয় সংস্কারের কথা। আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম। ধর্ম আমাদের দীনে-মোকামে। কোন রিফরমেশনের এতে দরকার নেই; কোন সংস্কারের এতে গুঞ্জায়ন নেই। ইউরোপে রিফরমেশনের দরকার পড়েছিল। কারণ খৃস্ট-ধর্ম সেখানে স্বরূপ হারিয়ে গৌড়া কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল। আমাদের ইসলামে তা হয়নি, এর চারপাশে অনেক আগাছা-আবর্জনা জন্ম নিয়েছে সত্য, কিন্তু কালের বিবর্তন ভ্রুগোলের পরিবর্তন রাজার রাজদণ্ড কিছুই ইমলামকে তার স্বকীয়তা থেকে হটাতে পারে নি। কাজেই আমাদের ধর্ম-সংস্কার বা রিফরমেশনের দরকার নেই।

তারপর ধরুন, রিভাইভ্যালিষমের কথা। রিভাইভ্যালিষমটা হচ্ছে 'ফিরে চলার' ডাক, 'গোয়িং ব্যাকের' আবাহন। আমরা কোথায় ফিরে যাব ? দিল্লী-আশ্রার তখতে-তাউসেও ফিরে যেতে পারবো না,

বাগদাদ-দামেশকের খেলাফতেও ফিরে যাওয়া চলবে না। সে আশা হবে বাতুলতা, আর সে চেষ্টা হবে আত্মঘাতী। আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ফাঁকি দিতে পারবো না। প্রগতিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না। সেটা হবে আত্মহত্যারই শামিল।

বিগত গৌরবের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কাররূপে মুসলমান ছিল দুনিয়ার শিক্ষক। শিল্প-বাণিজ্যে ছিল তারা বিশ্বের নেতা। প্রগতির ছিল তারা অগ্রপথিক। এ যুগে আমাদের সে গৌরবের পথে ফিরে যেতে হলে, সে নেতৃত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের চলতে হবে যুগের আগে-আগে। প্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে রওয়ানা হলে চলবে না। কাজেই নিভাইড্যালিয়ম বা 'ফিরে চলোর' ডাক আমাদের আদর্শ হতে পারে না।

পূর্ব-পাকিস্তানের জাগরণের জন্য তাই রেনেসাঁ অপরিহার্য। এটা আমরা বুঝতে পারি ইউরোপের রেনেসাঁর বিচার করলে। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রাক্কালে তথাকার খৃষ্টান জাতিসমূহের যে দুরবস্থা হয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তানের বাশিন্দাদেরও আজ তিক সেই দুরবস্থা।

### ইউরোপের রেনেসাঁ

ইউরোপে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল কখন? খৃষ্টীয় পনের শতকে। ইউরোপ তখন জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে পর্যুদস্ত ও বিপর্যস্ত। দু'শ বছরের জেহাদে সারা ইউরোপের সমবেত খৃষ্টান রাজ শক্তি মুসলিম রাষ্ট্র শক্তির হাতে পরাজিত। পোপের আধিপত্য ও রোমক সাম্রাজ্য লণ্ড-ভণ্ড। বিশ্বব্যাপী খৃষ্টাধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন চুরমার। জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্পে-সাহিত্যে ব্যবসা-বাণিজ্যে খৃষ্টান-জগৎ তখন মুসলিম-জগতের অনুসারী ও অনুগ্রহ-তিথারী। অশিক্ষা কুসংস্কার আত্মকলহ ও গৃহ-বিবাদে খৃষ্টান ইউরোপ তখন ছিন্ন-ভিন্ন। এই চরম বিপদের দিনে মুসলিম শক্তি খৃষ্টান ইউরোপের শিরে কঠোর আঘাত হানলো কনস্টান্টিনোপল দখল করে। রোমের

সম্রাটরা এই কনস্টান্টিনোপলকেই রাজধানী করে সারা ইউরোপ ও এশিয়ার উপর রাজদণ্ড চালাবেন বলে পরিকল্পনা রচনা করে আস-ছিলেন। ১৪৫৩ খৃষ্টীয় সনে এই কনস্টান্টিনোপলই দখল করে নিল মুসলমানরা। খৃষ্টান সম্রাটদের সাধের কনস্টান্টিনোপল তাঁদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হল ইসলামী-রঙে-রঞ্জিত কস্টনতুনিয়ায় ও ইস্তাম্বুলে। এই চরম আঘাত ক্লান্ত অলস ও তন্দ্রাগ্রস্ত খৃষ্টান-মনে যে তীব্র বেত্রাঘাত হ'নলো, তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে এল খৃষ্টান-বুকে অফুরন্ত যৌবন জোয়ার। এই দিন থেকে শুরু হল তার রেনেসাঁ।

ইতালিতেই এ রেনেসাঁ শুরু হল স্বভাবতঃই। ১৪৪৪ সাল থেকে ১৪৯২ সাল तक এই পঞ্চাশ বছর একা ইতালীই খৃষ্টান ইউরোপের নওজোয়ানির পতাকা বহন করে আসছিলো। তারপর ঐ সালে অষ্টম চার্লস নেপলস আক্রমণ করে ইতালির দরজা খুলে দিলেন ফরাসী-জার্মান স্পেনিয়ার্ড-পতু'গাল ও ইংরাজ-ওলন্দাজ সকলের জন্য। ঐ দিন থেকে ইতালির অর্দ্ধশতকের রেনেসাঁ-সাধনার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হতে লাগলো সারা ইউরোপে। সমগ্র খৃষ্টান-জগৎ নব জাগরণের গানে মুখরিত হল। অভ্যুত্থানের কাজে তারা মেতে উঠলো।

এ সাধনা চললো প্রায় এক শ' বছর। তার ফলে দেখা দিল আধুনিক যুগ। সমগ্র ইউরোপের রং-চেহারা গেল একদম বদলে। দেখ-দেখ করে খৃষ্টান ইউরোপ হয়ে উঠলো সারে দুনিয়ার নামক শাসক ও শোষক, ফ্রেণ্ড ফিলসফার এণ্ড গাইড। যে ইতালীয় শিল্প, জার্মান বিজ্ঞান, স্পেনীয় নৌবহর, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপকে দুনিয়ার বাদশা বানিয়ে দিল, তা এই রেনেসাঁরই সৃষ্টি।

তবেই দেখা যাচ্ছে যে, মধ্য যুগের আঁধার থেকে মডার্ন এজের আলোতে আসার যে আধো-আলো-আধো-আঁধার পথটুকু ইউরোপের বেলা তারই নাম রেনেসাঁর যুগ। এ রেনেসাঁর কোনো সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা রুখা। একে শুধু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এই বলে যে, অতীতের সংস্কার মোহ এবং তজ্জনিত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবার যে

প্রবল বাসনা নও-জোয়ানির উন্মাদনায় রূপায়িত হয়, সেই নব-উদগত কর্মোন্মাদনার নাম রেনেসাঁ। নতুন দৃষ্টিতে আল্লার দুনিয়াকে দেখা, তাঁর সৃষ্টি-রহস্যে কুদরতের সূর্য-কিরণে নিজেদের কুসংস্কারের জ্বোনাকীর ঝিকিমিকি ভুলে যাওয়ার নামই মানব-মনের রেনেসাঁ। মনের রেনেসাঁ একবার এসে পড়লে কর্মের রেনেসাঁ আপনি আসতে বাধ্য। জীবন্মৃত লাহিত কোণ-ঠাসা শ্বুটান-জগৎ এই রেনেসাঁর পথেই আজ দুনিয়ার নেতা হয়েছে।

### আমাদের অবস্থা

পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতিকেও অমনি করে রেনেসাঁর পথেই নওজোয়ানি লাভ করতে হবে। পনের শতকের শ্বুটান ইউরোপের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতির আজিকার দুর্দশার তুলনা করুন। আঠারো শতকে এরাই বাংলার শাসক নায়ক, ফ্রেণ্ড ফিলসফার এণ্ড গাইড। বাংলার শিল্প-সাহিত্য তাহমিব-তমদ্দুন বাবসা-বাগিজ্য শাসন-পালন সবই এদের হাতে। হঠাৎ একদিন পলাশীর ময়দানে এদের বিশ্বজয়ী শানিত তলুওয়ার বেইমানী ও জালজুয়াচুরির মুখে ভোঁতা হয়ে গেল। বিশ্বাসঘাতকতায় রাজ্য গেল, ভাষা পরিবর্তনে চাকুরী গেল, বাষেয়াফতিতে জমিদারি গেল, পোশাক পরিবর্তনে খান্দানির গোরবটুকুরও অবসান হল। আগের দিনের বাদশা পরের দিনের পথের ফকির হল। গত কালের পণ্ডিত আজকার মূর্খ বনে গেল। বহু যুগের খান্দানী ভদ্রলোক এক রাত্রি 'চাষী ছোট লোক' হয়ে গেল। শিক্ষা-সভ্যতায় শিল্প-সাহিত্যে ব্যবসা-বাগিজ্যে সিনেমা-থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে কোথাও আজ তাদের দেখা পাবেন না। রাজ দরবারে তাদের স্থান নেই। তাদের ভিড় দেখুন গে কাদা-নর্দমায়, নদী-নালায়। তাদের কাতার দেখুন গে জমিদারের কাছারীতে, মহাজনের আঙিনায়। তাদের মিছিল দেখুন গে শহর-বন্দরের ফুটপাথে। কুসংস্কারে তারা আকর্ষ

নিমজ্জিত, আত্মকলহে তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। নিজের শক্তি ও গৌরব এদের অজ্ঞাত। নিজের অধিকারে এরা উদাসীন। এদের সংখ্যা চারি কোটি। সমগ্র ইংলণ্ড ও সমগ্র ফ্রান্সের সমান।

### মুক্তির পথ

এই বঞ্চিত লাক্ষিত আত্ম-ভোলা জাতকে বাঁচাবেন আপনারা দু' চারটা চাকরি দিয়ে? দু'চারটা স্কুল-কলেজ খুলে? আইন সভায় দু' দশটা প্রস্তাব পাশ করে? তা হয় না। এদের মুক্তি এদের আবাদি আনতে হলে চাই সর্বগ্রাসী বিপ্লব। সে বিপ্লবের আশুনে শুলুম ও বেইনসাফির সমস্ত জঞ্জাল-আবর্জনাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কচুরিপানা পোড়াতে গেলেও ধান-টানও কিছু পোড়া যায় নিশ্চয়। তেমনি রেনেসাঁর দহন আশুনে সামাজিক অবিচার যুলুমের জঞ্জাল পোড়াতে গেলেও খোড়া-বহত ভাল জিনিসও পোড়া যাবে নিশ্চয়। ভূতুড়ে বাড়ী ভেঙে নয়া বাড়ী তৈরী করতে গেলে অমন-কিছু খোড়া-বহত ভাল জিনিসেরও মায়্যা আমাদের কাটাতে হবে।

তবেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পূর্ব-পাকিস্তানের আবাদির জন্য রেনেসাঁর পথে যাওয়া ছাড়া আমাদের গতান্তর নেই। এটাও আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে, রেনেসাঁ একটা তামাশার কথা নয়। এটা জাতীয় জীবনের একটা গুরুতর নৈতিক সাধনার বস্তু। একটা সার্বজনীন কর্মোন্মাদনার ব্যাপার। জাতীয় নওজোয়ানির পাহাড়-ভাঙা পর্বত-ডিঙানো দৃঢ় সংকল্পের রূপায়ন।

এটা কেমন করে ঘটতে পারে? কথায় কথায় যাঁরা বিপ্লবের বুলি আওড়ান, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা মানব-মনের রহস্য উপেক্ষা করে থাকেন। বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁরা ভুলে যান। চিন্তার রাজ্যে জাতির কলেকটিভ মনে বিপ্লব না এলে কর্মে বিপ্লব আসতে পারে না। চিন্তায় বিপ্লব আনবার দায়িত্ব কবি-সাহিত্যিকের। ফরাসী-বিপ্লব



প্রভৃতি সত্যিকার বিপ্লবের দিকে নয়র দিনেই আমরা এটা দেখতে পাই। রুশো-ভল্টেয়ার টলস্টয়-টুর্গেনিভ গোকি-ডস্টয়েভস্কি চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবের আশ্রয় না ছড়ানো পর্যন্ত কর্মে বিপ্লব কেউ আনতে পারেন নি।

### আগে চাই সাহিত্যিক বিপ্লব

পাকিস্তানও একটা বিপ্লব। এ বিপ্লব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য? এ দিক-কার আলোচনা সাহিত্য-শাখার সুযোগ্য সভাপতির ভাষণে শুনতে পাবেন। আমি শুধু প্রসঙ্গতঃ মুখতসরভাবে এ বিষয়ে কয়েকটা ব্যাপারের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

পূর্ব-পাকিস্তান অর্থাৎ বাঙলা ও আসামের সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি তা বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের সাহিত্য। এটা খুবই উন্নত সাহিত্য। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ এ-সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গেছেন।

তবু এ-সাহিত্য পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাঙলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নেই শুধু তা নয়, মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই। অর্থাৎ এ-সাহিত্য থেকে মুসলিম সমাজ কোনো প্রেরণা পায় নি এবং পাচ্ছে না। এর কারণ আছে। সে কারণ এই যে এ-সাহিত্যের স্বষ্টিও মুসলমান নয়; এর বিষয়-বস্তুও মুসলমান নয়। এর স্পিরিটও মুসলমান নয়; এর ভাষাও মুসলমানের ভাষা নয়।

প্রথমতঃ এ-সাহিত্যের স্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ সাহিত্য হিন্দু-মনীষার সৃষ্টি। সুতরাং স্বভাবতঃই হিন্দু সংস্কৃতিকে বুনিয়ে দ করেই তাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ঠিকই করেছেন তাঁরা। নইলে ওটা জীবন্ত সাহিত্য হতো না। হিন্দু-সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মেরই সন্তান।

হিন্দু ধর্ম ত্যাগ বৈরাগ্য ও মূনি ঋষির ধর্ম। হিন্দুর সংস্কৃতিও তাই ত্যাগ প্রেম ও ভক্তিবাদের সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতির বুনিন্মাদ প্রতীক-পূজা। কাজেই হিন্দুর শিল্পী মন সুন্দরের পূজারী। এতে করে এই বাঙলা সাহিত্যের প্রাণ হলে দাঁড়িয়েছে সত্যম শিবম সুন্দরমের সাধনা। সে-সাধনার কামনা হচ্ছে “আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-খুলার তলে।” সুন্দর ও প্রতীক-পূজারী এই রসিক-মন স্বচ্ছন্দে ‘আর্টের জন্যই আর্ট’ এই মতবাদ প্রচার করেছে। প্রতীক-পূজারী নিত্যানন্দ রস-পিপাসু মন স্পন্দিত হয়েছে পরকীয়া প্রেমে। আত্মার তসল্লির জন্য ভক্তিবাদ ও আর্টবাদের মিল ঘটাইবার উদ্দেশ্যে রাখা-কৃষ্ণ-প্রেমের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে বাঙলা সাহিত্য গড়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে। নারী এখানে সৌন্দর্যের প্রতীক। নারী-প্রেমের সাধনা করতে গিয়ে নারী-মনকে করে তোলা হয়েছে গভীর রহস্য পুরী। সে দুর্জয় রহস্য পুরীর হুমকি নারী-প্রেমকে জাগাবার সোনার কাঠির সন্ধানে গোটা তরুণ-রুদ্ধ জাতীয় মনকে তোলা হয়েছে ফ্লেপিলে। ক্রমে শিল্পীর তুলিতে ত্যাগ বৈরাগ্য ভক্তি-প্রেম প্রভৃতি হিন্দু সংস্কৃতির বড়-বড় মহান মূল সূত্রগুলিও শিল্পিত হয়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করেই।

ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ, ভক্তিবাদের আদর্শ প্রেমের আদর্শ, সমস্তই উঁচু দরের আদর্শ। এইসব আদর্শকে বুনিন্মাদ করে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে হিন্দু শিল্প-মনীষা যে সাহিত্য রচনা করেছে, সে সবই হয়েছে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের মতই মুসলমান রস-পিপাসীরও পিপাসা নিবারণ করে থাকে।

### শিল্প দর্শনের ব্যবধান

কিন্তু সত্য কথা এই যে, ঐ সাহিত্যকে মুসলমানরা তাদের জাতীয় সাহিত্য মনে করতে পারে না। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তি-প্রেম মতই উঁচুদরের আদর্শ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। হিন্দুর ধর্ম

যেমন ত্যাগ বৈরাগ্য ও মুনি-ঋষির ধর্ম, মুসলমানের ধর্ম তেমনি হক-ইনসাফ ও জেহাদ-শহীদের ধর্ম। প্রতীকবাদী সুন্দর-পূজারী আর্টবাদী হিন্দু সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতি তেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়। হক-ইনসাফবাদী কল্যাণমুখী মুসলিম সংস্কৃতি তাই সমাজ-কেন্দ্রিক। মুসলমানের বিচারে তাই আর্টের জন্য আর্ট নয়, আর্ট সমাজের জন্য। এই সমবেত কল্যাণমুখিতার ফলে মুসলমান মূলতঃ কর্মবাদী, ভক্তিবাদী নয়। এই জন্যই মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা ত্যাগের বা বৈরাগ্যের বা দান-দক্ষিণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা হক ও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী মুসলমানের নষের দেবী নয়, রহস্য-পুরীর রাক্ষসীও নয়। সে মানবী। বিধবা ও 'সতী' হিসেবে ত্যাগের মূর্তিমান দেবী রূপে তার যতই পূজা-অর্চনা করা হোক, তার ওম্মারিশী সম্পত্তি এবং দেনমোহরের টাকা আদায় না করা পর্যন্ত তার উপর ন্যায় বিচার করা হল না বলে মুসলমান মনে করে। হক ও ইনসাফের দ্বারা, অধিকার ও সাম্যের দ্বারা সমাজের অপর সব মেঘরের মতই নারীরও মন পাওয়া যেতে পারে। অভিসারের ছোড়ায় চড়ে, 'দেহি পদ-পল্লব-মুদারমে'র সোনার কাঠি নিয়ে তার অন্তরের রহস্য পুরীতে প্রবেশ করে কাল্মিকাটির বাণে রাক্ষস-শুষ্কস মারবার কোনো দরকার করে না।

মুসলিম সমাজ-মনের রায় এই যে, নিষ্কর্মা অলস ও নিদ্রাহীন হতভাগ্য অভিজাতেরাই নারী-হৃদয়কে রহস্যময় ও নারী-প্রেমকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলেছে। বড়লোকের অনর্জিত অর্থ-রাশি ব্যয়ের অবসর-প্রচুর জীবন অতিবাহিত করার জন্যে ইনডোর খেলা হিসেবে রহস্যপূর্ণ নারী-হৃদয় খুবই চিত্তাকর্ষক। তা ছাড়া তাদের নির্ভাহীন জীবনে নারী-প্রেম সত্যই দুর্লভ বস্তু। তাদের বহুভোগী চঞ্চল চপল মনের কাছে নারী-হৃদয় সত্যই রহস্যপুরী। বাঙলার মুসলমান অনর্জিত বিভ্রাটের অবসর-প্রচুর শ্রমকুষ্ঠ অভিজাত শ্রেণী নয়। কাজেই নারী-প্রেম তাদের দুর্লভও নয়, নারী-মন তাদের কাছে

রহস্যপূরীও নয়। এই জন্যই বর্তমান বাঙলা সাহিত্য মুসলিম সমাজ-মনে কোনো প্রেরণার স্পন্দন জাগাতে পারে নি। তাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমে প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে আনন্দে নৃত্য করতে দেখেও মুসলিম সমাজ-মনের একটা তারও ঝনাৎ করে উঠে নি। তাই বিশ্ব-কবির 'মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার তলে'র অত-বড় আবেদনে একটি মুসলমানেরও মাথা এক ইঞ্চি হেট হলো না।

তার বদলে বরঞ্চ যেদিন এক অচেনা অজানা বালক হঠাৎ মিকির দিয়ে উঠলো : 'বল বীর উন্নত মম শির', সেদিন রিজ্জ ক্লাস্ত ঘুমন্ত ও জীবন্ত মুসলমান ধচ্‌মচ্‌ করে জেগে উঠে চোখ রগড়াতে-রগড়াতে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো : 'উন্নত মম শির'। কারণ এ যে তারই অন্তরের ঘুমন্ত শিশুর চীৎকার। এ যে তারই জীবনের কথা। তাই নজরুল ইসলামের আকস্মিক আবির্ভাব মুসলিম সমাজ-মনকে এমন করে আন্দোলিত করতে পেরেছে। মুসলমানের বিবেচনায় মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ আলো-আঁধার হাসি-কান্না, তাদের দেবত্ব-পশুত্ব, তাদের মহত্ব-বীরত্ব, তাদের হীনতা-ক্ষুদ্রতা তাদের সংগ্রাম-সাধনা, এ-সবই সাহিত্যের বুনিন্যাদ এবং নজরুল ইসলাম এই জীবনকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। শুধু এই কারণেই নজরুল ইসলাম পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি।

### সাহিত্যের বিষয়-বস্তু

সাহিত্যের স্পিরিট সম্বন্ধে যা বলেছি বিষয়-বস্তু সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়। সাহিত্যের নায়ক-নায়িকা যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের পটভূমি যদি আমার কর্ম-ভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার মর্মবাণী না হলো, তবে সে সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কিরূপে? আমার ঐতিহ্য, আমার ইতিহাস, আমার কিম্বদন্তী এবং আমার উপকথা যে সাহিত্যের উৎস নয়, সে সাহিত্য আমার জীবন-উৎস হবে কেমন করে? রাম-লক্ষণ, ভীম-অর্জুন, সীতা-সাবিত্রী,

রাধা-কৃষ্ণ, মথুরা-অযোধ্যা, উজ্জয়িনী-ইন্দ্রপ্রস্থ হিন্দুর মনে যে স্মৃতি কল্পনা ও রস সৃষ্টি করে ; যে আইডিয়া অব-এসোসিয়েশন জাগায়, মুসলিম-মনে কি তা করতে পারে ? তেমনি আবার আলী-হামযা সোহরাব-রুস্তম শাহজাহান-আলমগীর হাযেরা-রহিমা রাবিয়া-চাঁদসুল-তানা সিরাজ-কাসেম ঈসা খাঁ-মুসা খাঁ গৌড়-সোনারগাঁ মুসলিম মনে যে স্মৃতি কল্পনা ও রস সৃষ্টি করে বা আইডিয়া-অব-এসোসিয়েশন জাগায়, হিন্দুর মনে তা করতে পারে না। এটা শুধু হিন্দু-মুসলিমের কথা নয়। তামাম দুনিয়ার সকল জাতি সম্বন্ধেই এ কথা সত্য। সব জাতির জাতীয় চেতনাই জাগে তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়ে দিতে পারে সাহিত্য রচিত না হবে ততদিন সে সাহিত্য থেকে কোনো জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি আধুনিক নমির দিচ্ছি।

### ইতিহাসের নমির

ইংরেজী সাহিত্য খুবই উন্নত ও সম্পদশালী সাহিত্য। ওটা মিলটন-শেকসপিয়ার স্কট-শেলীর সাহিত্য। কিন্তু অতবড় সাহিত্যও আইরিশ জাতির প্রাণে প্রেরণা জাগাতে পারে নি। সুইফট বার্কলে গোল্ডস্মিথ ও বার্নার্ড শ'র মত অনেক প্রতিভাবান আইরিশ এই ইংরেজী সাহিত্যের সেবা করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন। কিন্তু তাঁদের সাহিত্য-সেবা হয়েছে লগুনে বসে, আয়ার্ল্যান্ডের মাটিতে নয়। আয়ার্ল্যান্ড-বাসীর জাতীয় জীবনে সে সাহিত্য কোন স্পন্দন সৃষ্টি করতে পারে নি। তাই পার্নেল ড্যাভিট রেডমণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ কঠোর সাধনা কিছুই আইরিশ জাতির মুক্তি আন্দোলন সফল করতে পারে নি।

অথচ যেদিন আয়ার্ল্যান্ডের জাতীয় কবি ওল্ফিউ. বি. ইয়েটস ইংরেজী প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, ইংরেজী কালচার অনুকরণমুক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ সাহিত্য সাধনাকে

কেলটিক সংস্কৃতির বুনিয়েদে নিজস্ব রূপ দান করলেন, সেই দিন আইরিশ গণ-মন নিজের হারানো ধন ফিরে পেল। নব-জন্মের আনন্দে সে মেতে উঠলো। নিজের ভাগ্য নির্মাণে সে কর্মোন্মত্ত হলে পড়ল। তার ফল হলো এই যে, আইরিশ জাতির দু'শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা আন্দোলন ডি ভেলেরার নেতৃত্বে কুড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো।

আইরিশ জাতির কপালে যা যা ঘটেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতির কপালেও তাই ঘটেছে এবং সাহিত্যে স্বকীয়তা আনতে না পারলে বাকীটুকুও ঘটবে। বাঙলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনেসাঁ আনতে হলে তার সাহিত্য সাধনাকে অনুকরণ-অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব সাহিত্য দিতে হবে। হিন্দুর সৃষ্ট বাঙলা সাহিত্য খুবই বড়। খুবই উচ্চাঙ্গের। কিন্তু তার নকল করে মুসলমান অমন বড় অমন জীবন্ত সাহিত্য-রচনা করতে পারবে না, হোমার মিল্টন শেকস-পিন্সারকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ অতবড় সাহিত্য রচনা করতে পারতেন না। তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনাকে নিজস্ব কৃষ্টিটির উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন বলেই তিনি আজ বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার মুসলমানও তেমনি রবীন্দ্রনাথের নকল করে বড় হতে পারবে না। তাকে বড় হতে হবে তার স্বকীয়ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, নিজের কৃষ্টিতে বুনিয়েদ করে। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীয় আকাশে কতবার শরতের চন্দ্রোদয় হয়েছে, তাতে শারদীয়া পূজায় 'আনন্দময়ী মা' কতবার এসেছে গিয়েছে, কিন্তু একদিনের তরেও সে বিশ্বের আকাশে ঈদ-মোহররমের চাঁদ উঠেনি। সে চাঁদ উঠাবার তার ছিল নজরুল ইসলামের ওপর। এতে দুঃখ করবার কিছু নেই। কারণ এটা স্বাভাবিক। কাজেই কঠোর সত্য।

### আমাদের ঐতিহ্য

তবে কি বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্যিক ঐতিহ্য নেই? তাকে কি তবে সাহিত্য-সাধনার ক'খ থেকে শুরু করতে হবে? না।

অবস্থা অতটা নৈরাশ্যজনক নয়। বাংলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের কোনো দান নেই বলে বাঙালী মুসলমানের কোনো সাহিত্যই নেই, এ কথা ঠিক নয়। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীর ভিড় নেই বলে মুসলিম সমাজে বিদ্যাচর্চাই নেই, এ কথাও ঠিক নয়। বস্তুতঃ বাংলার মুসলমানের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য। মকতবে-মাদ্রাসায় শিক্ষিত লক্ষ-লক্ষ মুসলমান পাঠক ঐ পুঁথি সাহিত্য থেকেই জীবনের প্রেরণা পাচ্ছে।

এই পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনারা ঐ বিভাগের সভাপতির মুখে অনেক কথা শুনতে পাবেন। আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই যে, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি সাহিত্যের বুনিন্মাদে। আমরা আবার পুঁথি-সাহিত্যে ফিরে যাব, সে কথা আমি বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। এই দুই দিকেই আমরা পুঁথি-সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।

### আমাদের মুখের ভাষা

এখানে আমাদের ভাষার কথাও আপনি এসে পড়ছে। ভাষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ থেকে আপনারা ও-দিককার কথা শুনবেন। আমি প্রসঙ্গতঃ এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, আজকার তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনেই যে শুধু বাদ পড়েছে তা নয়, তার মুখের ভাষাও সে সাহিত্যে অপাংস্তেয় রয়েছে। মুসলমানের আল্লা-খোদা রোযা-নামায হজ্ব-যাকাত এবাদৎ-বন্দেগি অশু-গোসল খানা-পানি সমস্তই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এ হুলুমবায়ির মধ্যে কোনো জাতির সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায়। সে ভাষা

## বাংলাদেশের কালচার

সংস্কৃত ব্যাকরণের বা তথাকথিত বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূর্ব-পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষায় নিজস্ব সত্যাকার বাংলা ব্যাকরণ রচনা করবে।

ভাষার কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। এ সম্পর্কেও আপনারা বিভাগীয় সভাপতির ভাষণে অনেক কথা শুনবেন। আমি শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমরা রাখবো না। এখন বাংলায় ৪০টা হরফ আছে। এর উপর আছে কার ফলা ও যুক্তাক্ষর। এটা শুধু শিক্ষা সাহিত্যের উপর যুলুম নয়; ছাপা টাইপ ও টেলিগ্রাফ বেতার প্রভৃতি সকল রকম জ্ঞান-বিকাশের দিক থেকেও এই বর্ণ-বাহুল্য মারাত্মক রকম প্রগতি-বিরোধী। পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির অত্যন্তম বড় কাজ এই বর্ণমালা কমানো। রেনেসাঁ সোসাইটির তরফ থেকে যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে মাত্র কুড়িটি হরফ ও চারিটি হরকত বা কার থাকবে। ফলা ও যুক্তাক্ষর কিছু থাকবে না।

বন্ধুগণ,

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। অতঃপর আমার সহকর্মী বন্ধুগণের ভাষণে রেনেসাঁ সোসাইটির আদর্শ-উদ্দেশ্য ও নিয়ত-মকসেদ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা শুনবেন। তাতে আপনারা দেখবেন, আমরা বিপুল আশা-আকাঙ্ক্ষার কল্পনার তাজমহল রচনা করে বসে আছি। হতে পারে এ-সব আমাদের স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার শক্তি-প্রাচুর্য আপনারা মধ্যে সূপ্ত রয়েছে। আপনারা যদি আত্মবিশ্বাসী হন, আপনাদেরকে সে শক্তি প্রচুর্য নিয়ে যদি আপনারা কল্পে দাঁড়ান, পূর্ব-পাকিস্তানের তরুণ মন যদি কর্মোন্মাদনায় মেতে উঠে, তবে এ স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হবে, চার কোটি মুসলমান তাদের জীবন-জেহাদে জয়-যুক্ত হবে, এই আশা নিয়ে আমি আপনাদের খেদমতে আদাব আরম্ভ করছি।

০ ১৯৪৪ সালের পাঁচই মে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মূল-সভাপতির ভাষণ।



# শিক্ষার মডিউল



## চিনা চতুরালি

আজ একইশা ফেব্রুয়ারি। এটা বিপ্লবের দিন। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা জাতীয় স্বকীয়তা। সে স্বকীয়তা লাভ হইতে পারে শুধু নিজস্ব সাহিত্যে। নিজস্ব সাহিত্য হইতে পারে কেবলমাত্র মাতৃ-ভাষায়।

শিক্ষা এ সবেগ গোড়ার কথা। কাজেই এই বিপ্লব বাষিকীতে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমের কথা উত্থিয়াছে স্বাভাবিকভাবেই। যে ভাষায় মায়ের কাছে প্রথম বুলি শিখিয়াছি, যে ভাষায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব, জীবনের শিক্ষা লাভ করিব, সেই ভাষাতেই, এটা ত পানির মত সরল কথা।

তবু এটা লইয়া তর্ক বাধিয়াছে। বাংলা প্রচলনের জন্য ছাত্র-তরুণদের বছর-বছর 'সপ্তাহ' পালন করিতে হইতেছে। কারণ মায়ের বিরুদ্ধেও সন্তান আছে। তবে তাঁরা সোজাসুজি বিরোধিতা করিতেছেন না। অত আহাম্মক তাঁরা নন। মাতৃভাষার তাঁরা বিরোধিতা করিতেছেন সনাতন কৌশলে। বলিতেছেন : মাতৃভাষা ত নিশ্চয়ই। তবে তার জন্য প্রস্তুতি চাই। সাত তাড়াতাড়িতে ইন্সটের চেয়ে অনিষ্ট হইবে বেশী। শিক্ষার মান নিচু হইয়া যাইবে। দেশের সর্বনাশ হইবে। শিক্ষা বড় নাযুক ব্যাপার। আঙুন লইয়া খেলা। ধীরে ধীরে আগ বাড়িতে হইবে।

আমাদের চিনা চতুরালি এ-সব। ভুক্তিত স্বার্থের ভেস্টেড ইন্টা-রেস্টের সেই গ্র্যাজুয়েল রিয়েলিয়েশন-অব-সেল্ফ গবর্নমেন্ট। সেই কমিশন কমিটি এক্সপার্ট বডি নিয়োগের প্রস্তাব।

কৌশলটা ওখানেই শেষ নয়। ইংরাজের অধীনে ত আর স্বাধা খানবাহাদুরি করেন নাই। তার সূক্ষ্ম নীতিরও খানিকটা রক্ষত করিয়াছেন। এদেরই একদল বলিলেন : 'এখনই বাংলা করা যায় না। তবে আগামী দুই-তিন বছরের মধ্যে করিবার চেষ্টা করিব।'

প্রতিবাদ করিবার জন্য আমরা যেই কোমর বাঁধিলাম, অমনি আর একদল হায় হায় করিয়া উঠিলেন। ছাতি পিটাইয়া মাথায় হাত মারিয়া বলিলেন : 'দুই-তিন বছরে বাংলা আনিলে শিক্ষা গোল্লায় যাইবে। প্রস্তুতি করিতে কম-সে-কম ত্রিশ বছর লাগিবে।'

আমরা পাগড়ি ঘুরাইয়া বাঁধিলাম। দুই-তিন বছরওলালাদের তরফ হইতে মুষ্টি ফিরাইয়া ত্রিশ বছরওলালাদের মোকাবেলায় রুখিয়া দাঁড়াইলাম। ত্রিশ বছরের চেয়ে তিন বছর কম, এ জ্ঞানটুকু আমরা বাংলা মাধ্যম ছাড়াই শিখিয়াছি। অতএব তিনে-ত্রিশে লাগিল ফ্রি-ফাইট। মাতৃভাষা আমাদের লাজুক গ্রাম্য গিরস্হের মেয়ে। তারে লইয়া ঝগড়া বাধায় লাজে সে ঘোমটা টানিল। শিক্ষার মানের আসন্ন বিপদ কাটিয়া গেল।

এ খেলা চিরন্তন। আমাদের স্বাধীনতার আঠার বছর। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরেও চৌদ্দ বছর। রাষ্ট্র-ভাষারূপে স্বীকৃতি পাওয়ার পরেও দশ বছর। আরও যে কতদিন যাইবে, তা আল্লাই জানেন। কারণ তিন বছর-ত্রিশ-বছরে মূলতবি যঁারা চাহিতেছেন, ফযলে-খোদা, তাঁরা সবাই ততদিন হায়াতে বাঁচিয়া থাকিলেও যঁার-তঁার চাকুরিতে থাকিবেন না নিশ্চয়ই। তবু তাঁরা মূলতবি চান। তাঁদের ভাবখানা এই : কোন-মতে আমার মুদতটা কাটিয়া গেলেই বাঁচি। বাকী আল্লার মর্শি।

এখনই সম্ভব নয় কেন ?

এই মুহূর্তে ইংরেজীর বদলে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিরোধীরা যে-সব অসুবিধার কথা বলিতেছেন, সংক্ষেপে তা এই :

- (১) বাংলায় পাঠ্য বই নাই।
- (২) প্রয়োজনীয় পরিভাষা নাই।
- (৩) উপযুক্ত শিক্ষক নাই।

## শিক্ষার মিডিয়াম

(৪) সরকারী-বেসরকারী অফিস ও আদালতে বাংলা চালু হয় নাই।

(৫) পূর্ব-পাকিস্তানে উর্দু-ভাষী ও পশ্চিম-পাকিস্তানে বাংলা-ভাষী শিক্ষকদের অসুবিধা।

(৬) রাজনৈতিক তাগিদেই বাংলা প্রচলনের এই তাড়াহুড়া। শিক্ষায় রাজনীতি বিপজ্জনক।

(৭) প্রস্তুতির আগে বাংলা চলাইবার চেষ্টা শিক্ষার মানের অবনতি ঘটাইবে।

লক্ষ্যণীয়, সব আপত্তি শিক্ষার মাধ্যম বিবেচনার মধ্যই সীমাবদ্ধ। একটা মূল কথাই এতে বাদ পড়িয়াছে। আপত্তিগুলির জবাব দিবার আগে কাজেই সেই মূল কথাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। কথাটা এই : মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে-সাথে এক সংগে তিনটা কাজ হইয়া যায়। এক, শিক্ষা দান ও জ্ঞান লাভ সহজ হয়। দুই, সংগে-সংগে মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রসেস শুরু হয়। তিন, বিদ্যা আভিজাত্যের আইতরি টাওয়ার হইতে জনগণের মধ্যে নামিয়া আসে। এর একটাও আর একটা ছাড়া হয় না। কাজেই বিচ্ছিন্নভাবে এ-সব প্রস্নের বিচার করিলে চিন্তায় গলদ থাকিয়া যাইবে। এই মূল কথাটি মনে রাখিয়া আপত্তিগুলির বিচার করুন।

### পুস্তকের অভাব

পাঠ্য পুস্তকের অভাবের কথাটাই ধরুন। এ অভাব কেন? আমরা বই লিখি নাই। কেন লিখি নাই? দরকার নাই। দরকার নাই কেন? বাংলায় পড়াই না বলিয়া। ইংরাজীতে পড়াই। সে ভাষায় বই-পুস্তক ত আছেই। আগে দরকার পরে সৃষ্টি।

এতকাল আমরা ইংরেজীতে শিক্ষা দিতেছি। তবু ইংরেজীতে আমরা বই লিখি নাই কেন? কারণ দরকার ছিল না। আমাদের চেয়ে বড়-বড় পণ্ডিতরা ঐ ঐ বিষয়ে আগেই বই লিখিয়া রাখিয়াছেন।

প্রয়োজনমত লিখিতেছেন। লিখিবেনও। আমরা যদি আগে বই-লেখা হওয়ার আশায় আরও ত্রিশ বা তিনশ' বছর ইংরেজীতেই শিক্ষা দিতে থাকি, তবে কি মনে করেন, ইতিমধ্যে বাংলায় পাঠ্য-বই লেখা হইয়া যাইবে? কে লিখিবেন? কার জন্য লিখিবেন? কে কিনবেন? কে পড়িবেন?

বাংলা-বিরোধীরাও এটা বুঝেন। তাই এক তরুণ অধ্যাপক প্রস্তাব করিয়াছেন, সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানেরা আগামী দশ বছরে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহের উপর বই-পুস্তক লেখাইবেন। সে উদ্দেশ্যে বিশেষত্ব কমিটি নিয়োগ করিবেন। আশাটা বোধ হয় এই যে, দশ বছরে প্রয়োজনীয় সব পাঠ্য-বই লেখা ছাপা ও বাঁধাই হইয়া কোনও এক নিরাপদ স্থানে জমা থাকিবে। দশ বছর পরে বাংলা মাধ্যম হইলে সব বই হড়-হড় করিয়া বিক্রি হইয়া যাইবে।

এই ধরনের প্রস্তাব মারা করিতে পারেন, তাঁরা আর যে কাজেরই যোগ্য হউন না কেন, শিক্ষকতার যোগ্য তাঁরা নন। আসলে এটা আগে সঁাতার শিক্ষিয়া পরে পানিতে নামার অথবা আগে বড় হইয়া পরে হাঁটিতে শিখিবার উপদেশের শামিল। বাংলা কলেজ বই-পুস্তক ছাড়াই ডিগ্রী ক্লাস পর্যন্ত পড়াইয়া, উচ্চহারে পাশ করাইয়া এবং এম. এ. ক্লাস খুলিবার সাহস করিয়া এঁদের এ দিককার সব যুক্তি অসার প্রমাণ করিয়াছে।

### শিক্ষাদান কি?

আসলে শিক্ষাদানটা হইল শিক্ষক যা বুঝেন ছাত্রকে তাই বুঝাইয়া দেওয়া। যত বড় বিজ্ঞানীই আপনি হউন, আর ইংরাজী ফরাসী জার্মানী রুশীয় আরবী ফারসী যে ভাষাতেই আপনি সে বিজ্ঞান পড়িয়া থাকুন, আপনি তা বুঝিয়াছেন আপনার মাতৃ-ভাষাতেই। চিন্তাও করেন আপনি সেই ভাষাতেই। কাজেই অপরকে বুঝাইতেও

## শিক্ষার মিডিয়াম

পারিবেন সেই ভাষাতেই। যিনি তা পারিবেন না, তিনি নিজেই সেটা বুঝেন নাই, মুখস্ত করিয়াছেন মাত্র।

যে-সব অধ্যাপক বলেন যে, তাঁরা তাঁদের সাবজেক্ট ইংরাজীর বদলে বাংলায় পড়াইতে পারিবেন না, তাঁদের সম্বন্ধে একটা শক্ত কথা বলিব, আশা করি মাক্ফ করিবেন। তাঁরা বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী বই-এর নকলে নোট লিখিয়া ক্লাসে গিয়া তাই উগলাইয়া থাকেন। একই সাবজেক্টে বহুকাল ধরিয়া পুনঃ-পুনঃ একই কাজ করিতে-করিতে লোকচার-নোটগুলি তাঁদের মুখস্ত হইয়া গিয়াছে। ফলে শিক্ষকতা হইয়া গিয়াছে তাঁদের জন্য মিকানিক্যাল।

এটা হওয়া স্বাভাবিক। নিজেদের অর্জিত বিদ্যা বাসা বাঁধিয়াছে এঁদের তাঁঁটে, বড়জোর মগজে। অন্তরে প্রবেশ করে নাই। বিদ্যার ফল কাজেই এঁরা নিজেরাই পান নাই। ছাত্রদের দিবেন কোথা হইতে? পঞ্চাশতের যঁরা জানকে তাঁদের অন্তরে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁরা বুঝেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে সে জান অধিকতর ফলদায়কভাবে বিতরণ করিতে পারিবেন। সেই জন্যই তাঁরা বাংলাকে মাধ্যম করার দাবি করিতেছেন। এঁরা চিন্তা করিয়া পড়ান, মুখস্ত নোট আওড়ান না। ইংরাজী মাধ্যম থাকার ফলে এঁরা ক্লাসে লোকচার দিবার সময় আগে বাংলায় চিন্তা করেন। সে চিন্তাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তারপর তা উচ্চারিত হয় মুখে। ছাত্ররা সে লোকচার শুনে ইংরাজীতে। মনে-মনে অনুবাদ করে তা বাংলায়। তারপর বুঝে।

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে ষতদিন শিক্ষাদান চলিতেছে, ততদিন ধরিয়া এই প্রসেস চলিতেছে। শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝখানে এই অনুবাদের পর্দা খাড়া আছে ততদিন। দুইটা বাংলা মন ও মুখ ভাব বিনিময় করিতেছে দোভাষীর মাধ্যমে। শিক্ষক-ছাত্র তাই অন্তরের যোগাযোগ হইতেছে না। এই কারণেই আমাদের শিক্ষা অপূর্ণ।

যাঁটি শিক্ষকদের জন্য এই কৃত্রিম পরিবেশ অসহনীয়। কাজেই অবিলম্বে এঁরা বাংলা মাধ্যম চান। তবু যঁরা একটু দ্বিধা করেন

তঁারা দুইটা অলুবিধার ভয় করেন। এক, তঁারা ভাবেন বাংলা ভাষায় ক্লাসে যে লোকচার দিবেন সেটা সাহিত্যিক ও শুদ্ধ বাংলা হইবে না। দুই, তঁাদের বাংলা লোকচারে অনেক ইংরাজী ওয়ার্ড ইউষ করিতে হইবে। অনেক দিনের হ্যাবিটের দরুনই হোক অথবা প্রায় সব সাবজেক্টেই দরকারী পরিভাষার অভাবেই হোক, ঐ-সব শব্দ অটোমেটিক্যালি এবং মিকানিক্যালি তঁাদের মুখে আসিয়া পড়িবে। তাতে তঁাদের লোকচার শুদ্ধ সাহিত্যিক বাংলা হইবে না। এটা হইবে লজ্জার কথা।

এই দুইটি আশংকা হইতেই যে অনেক শিক্ষক বাংলা প্রচলনের বিরোধিতা করিতেছেন, তাতে আমার সন্দেহ নাই।

### অমূলক আশংকা

বর্তমান পরিবেশে এই আশংকা অন্যান্য ও অস্বাভাবিক না হইলেও একটু চিন্তা করিলেই তঁারা বুঝিবেন সে আশংকা অমূলক। আমাদের লেখক-সাহিত্যিকদের অনেকের ভাষগতিক দেখিয়া বহু পণ্ডিত ব্যক্তির মনেও এই কমপ্লেক্স বাসা বাঁধিয়াছে যে, লেখার শক্তিটা স্বভাবের দান। ইচ্ছা করিলেই লেখক হওয়া যায় না। সুতরাং লেখাটা সাহিত্যিকদেরই প্রিভিলেজ।

কথাটি পুরাপুরি সত্য নয়। সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বায়া আর্টিস্ট অর্থাৎ যাঁরা কবি-ঔপন্যাসিক শুধু তঁরাই স্বভাব-দত্ত গুণের দাবি করিতে পারেন। বাকী সব বিষয়েই যে-কোনও শিক্ষিত লোক নিজের জ্ঞান সাবজেক্টে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখিতে পারেন। শিক্ষক-অধ্যাপকরা ত নিশ্চয়ই পারেন।

লেখাটা পায়ে হাঁটার চেয়ে কঠিন নয়। কিন্তু অভ্যাস করিতে হয়। হাঁটার অভ্যাস না থাকিলে খুব সুস্থ-সবল লোকও লম্বা পথ হাঁটিতে পারে না। অভ্যাস না থাকিলে সাইকেল চালায় আরও কঠিন।



লেখার ব্যাপারটাও তেমনি। কলম হাতে নিন। কলমের মুখে যা আসে, তাই লিখুন। পছন্দ হইবে না। কাটুন। আবার লিখুন। আবার পড়ুন। আবার কাটুন। আবার-আবার। বাল্যশিক্ষায় পড়েন নাই? খোকা হাঁটিতে চাইল। মাটিতে পড়িল। আবার উঠিল। আবার পড়িল। আবার উঠিল। তারপর হাঁটিতে শিখিল। লেখার ব্যাপারটাও ঠিক তাই। আপনার ভাষা সাহিত্যিকের ভাষা হইবে না? এটাও আপনার অহেতুক ভ্রুতের ভঙ্গ। আপনি শিক্ষিত মানুষ। আপনি যে ভাষায় চিন্তা করেন, যে ভাষায় কথা বলেন, সেইটাই উদ্র ও শালীন ভাষা। সুতরাং সাহিত্যেরও ভাষা।

তবে সব সত্য ভাষার মতই বাংলা ভাষারও একটা লেখ্য একটা কথা এবং একটা ক্লাসিক্যাল রূপ আছে। এ তিনের সমন্বয়েই স্ট্যাণ্ডার্ড সাহিত্যিক ভাষা হইবে না ঠিক। কিন্তু তা হওয়ার দরকারও নাই। এই ভাষাতেই আপনি আপনার সাবজেক্ট আপনার ছাত্রদের বুঝাইতে পারিবেন। আপনার ছাত্ররা বুঝিতেও পারিবে।

তারপর আপনার লেকচারগুলি যদি প্রবন্ধ আকারে ছাপিতে চান তবে, এবং ছাত্ররা যখন পরীক্ষায় লিখিত উত্তর দিবে তখন, প্রয়োজন-মত শুদ্ধ করিলেই চলিবে। পরীক্ষার্থীদের সকলের বেলা তারও দরকার নাই। ভাষা-সাহিত্য পরীক্ষার বিষয় না হইলে ভাষার ভুলের দোষে নম্বর কাটা চলিবে না। প্রশ্নের উত্তর হইল কি-না শুধু তারই বিচার হইবে।

### শিক্ষক মনের কমপ্লেক্স

আমাদের শিক্ষকদের মনে আর একটা কমপ্লেক্স দেখা দিতে পারে। আমাদের অনেকেই পশ্চিম-বাংলার ডায়ালেক্টকে পূর্ব-বাংলার ডায়ালেক্টের চেয়ে ত বটেই, স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলার চেয়েও শালীন ও সভ্য মনে করেন। সাধারণভাবে ক্রিয়া পদে ও কিছু-কিছু বিশেষ্য পদে এই

মনোভাব প্রকট। এঁরা দর্শন-বিজ্ঞান ও ধর্ম পুস্তকের মত গুরু-গভীর লেখাতেও স্ট্যাণ্ডার্ড ক্রিয়াপদের জায়গায় পশ্চিম-বাংলার কলোকোয়াল ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। নাটকে-নভেলে-সিনেমায়, বোধ করি লোক্যাল কালার দিবার তাকিদেই, পূর্ব-বাংলার কলোকোয়াল ক্রিয়াপদও ব্যবহার করেন চাকর-বাকর কুনি-মজুর ও মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি 'ছোটলোকের' মুখ দিয়া। গল্পের ভদ্রলোক নাথক-নাথিকারা সবাই কিন্তু চমৎকার পশ্চিম-বাংলার কথা ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। চাকর-মনিবের এই ভাষাডুয়েট পূর্ব ও পশ্চিম-বাংলার 'মাতৃ-ভাষার' স্টেটা-সের নিখুত পরিমাপ এবং এ পরিমাপ করিতেছেন পূর্ব-বাংলার শিল্পী-সাহিত্যিকরাই। কারণ আমাদের সাহিত্যিকরা 'মুসলমান হইলেও ভদ্রলোক'।

এই হীনমন্যতা এঁদের এমন আর্ট-কানা করিয়া রাখিয়াছে যে, এঁদের হাতে শুদ্ধিকৃত ও রেকর্ড-করা 'রূপবানে' নাথিকা গান করে পূর্ব-বাংলার ভাষায় কিন্তু গানের ফাঁকে-ফাঁকে কথা বলে চমৎকার পশ্চিম-বাংলার ভাষায়। আর্টের ফাণ্ডামেন্টাল-বিরোধী এই অস্বাভাবিকতা এঁদের চোখেও পড়ে না, কানেও বাজে না।

যাঁদের চোখে নিজের সব-কিছু কুৎসিত, পরের সব-কিছু সুলভ ও অনুকরণযোগ্য, এঁরা সেই শ্রেণীর লোক। তবু তাঁরা সাহিত্যিক। কাজেই শিক্ষকরা ভাবিতে পারেন, ওটাই সাহিত্যের ভাষা। ঐ ভাষায় রূপে লেকচার দিতে না পারিলে ছাত্ররা হাসিবে।

কাজেই লেকচার দিবার সময় শিক্ষকরা থাকিবেন সেল্ফকন্শাস। ফলে লেকচারও ইথি হইবে না। ছাত্রদের পক্ষে তা শুনাও সোজা হইবে না, বুঝাও সহজ হইবে না।

কারণ, ভাষার দুই জোড়া রূপ। লেখা ও পড়া, রাইটিং ও রিডিং এবং বলা ও শুনা, স্পিকিং ও হিয়ারিং। এ জোড়া অবিভাজ্য। লেখার যেমন ভাষা আছে, বলারও তেমনি ইন্টোনেশন আছে। আবার ভাষার জিভও আছে কানও আছে। ভাটিয়ালি গানের 'নাও বাইয়া' ও

## শিক্ষার মিডিয়া

‘ঘাটে লাগাইয়া’র বদলে ‘নৌকো বেয়ে’ ও ‘ঘাটে লাগিয়ে’ বলিলে কেমন হয়, আপনারা তা জানেন। তবু সে চেষ্টা হইয়াছে। আক্সাসুদ্দিনের আবির্ভাবের আগ পর্যন্ত ওগুলি ছিল অসভ্য ও অশালীন। পূর্ব-বাংলার সব শব্দ ও উচ্চারণ আমাদের সাহিত্যিকদের বদৌলতে আজো তাই।

সেই কারণেই পশ্চিম-বাংলার এই ব্যর্থ অনুকরণ। ব্যর্থ এই জন্য যে, জিভের মোচড় দুই-চার জেনারেশনে ফিরে না। দুই শ’ বছর ইংরেজের অনুকরণ করিয়া তা দেখিয়াছি। এটা অস্বাভাবিক অবস্থা। এ অবস্থা চলিতে দিলে আমরা অনুবাদের রাজ্যেই থাকিয়া যাইব। এখন নিজের বাংলা চিন্তাকে ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া তারপর মুখে প্রকাশ করি। ইংরাজীর বদলে পশ্চিম-বাংলায় অনুবাদ করিব, এই যা পার্থক্য। এতে শিক্ষার মাধ্যম বদনাইবার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে।

এ বিষয়ে আমার উপদেশ এই যে, শিক্ষকরা ক্লাসে লেকচার দেওয়ার সময় প্রনানসিয়েশন ও ইণ্টোনেশনে সকল প্রকার কৃত্রিমতা বর্জন করিবেন। নিজের নিত্য-বাবহৃত সহজ কথা শব্দ ও ক্রিয়াপদ নিজস্ব স্বর-ভংগিতেই উচ্চারণ করিবেন। ছাত্রদের বিপুল মেজরিটি পূর্ব-বাংলার ছেলে। আপনার ক্লাসে তারা নিজ পরিবারের ভাষিক পরিবেশ দেখিয়া খুণী হইবে। আপনার কৃত্রিমতা বর্জনের অনুকরণে তারাও কৃত্রিমতা বর্জন করিবে। শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে বাপ-বেটার অন্তরের যোগ স্থাপিত হইবে। মাতৃভাষাকে মাধ্যম করার উদ্দেশ্য সফল হইবে।

## পরিভাষার অজুহাত

দ্বিতীয় অসুবিধা পরিভাষার অভাব। বাংলা-বিরোধীদের এটা বড় যুক্তি। বিজ্ঞান-বিষয়ক সাবজেক্টসমূহ ত বটেই, সাধারণ সাবজেক্ট-গুলিতেও প্রয়োজনীয় টার্মিনোলজির অভাব। কথায় কথায় ইংরেজী

ওয়ার্ড ইউথ করিতে হয়। এইসব ওয়ার্ডের বাংলা টামিনোলজি ডিসকভার বা কয়েন না করা পর্যন্ত ইংরেজীকেই আমাদের এডুকেশনের মিডিয়াম চালু রাখা আবশ্যিক।

এই যুক্তিতে কিন্তু বই লেখার ব্যাপারটাও পিছাইয়া যাইতেছে। এক ভিলে দুই পাখী মারা আর কি। পরিভাষা সৃষ্টির আগে ত আর বই লেখায় হাত দেওয়া যায় না। অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাংলা ঠেকাইয়া রাখিবার একটা অদ্বিতীয় অমোঘ অস্ত্র এটা।

আসলে কিন্তু পরিভাষার যুক্তিটা একটা অজুহাত মাত্র। অথচ এই প্রকটাই বহুকাল ধরিয়া কিছু লোকের মাথার বিশ হইয়া আছে। অনেক বিদ্বান পণ্ডিত এ কাজে তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়াছেন ও করিতেছেন। অভিধান ঘাঁটিয়া মস্তক আলোড়ন করিয়া কিছু 'ইংরাজী' শব্দের 'বাংলা' প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছেন।

'ইংরাজী' ও 'বাংলা' দুইটা শব্দই কোটেশন মার্ক দিলাম। কারণ যে শব্দের প্রতিশব্দ এঁরা বাহির করিয়াছেন সেটাও ইংরাজী নয়, যেটা বাহির করিয়াছেন তাও বাংলা শব্দ নয়। আসলে তাঁরা একটা ল্যাটিন শব্দের একটা সংস্কৃত প্রতিশব্দ তৈয়ার করিয়াছেন মাত্র।

ঐ ল্যাটিন শব্দটি এবং অমন হাজারো গ্রীক জার্মান ফরাসী ও ইটালিয়ান শব্দ ইংরাজী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। ইংরাজী হরফে লেখাতেই ও-সব শব্দ বেমানম ইংরাজী শব্দ হইয়া গিয়াছে। বাংলা হরফে লিখিলেই ওসব তেমনি বাংলা শব্দ হইয়া যাইবে। মস্তক ও অভিধান তখনই করিয়া ও-সবের সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভাষার প্রতিশব্দ আবিষ্কার বা তৈয়ার করিবার প্রয়োজন নাই। না-হক সে চেষ্টা যাঁরা করিবেন, তাঁরা উনিশ শতকের ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের মতই ভুল করিবেন।

তাঁরা কাগয কলম দোয়াত কলমদান ইত্যাদি আরবী-ফার্সি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার কত চেষ্টাই না করিয়াছিলেন। এ ধরনের চেষ্টা শুধু পুণ্ড্রম নয়। ভাষায় বিকাশ ও সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে দুশমনিও।

## শিক্ষার মিডিয়াম

ভাষার উদ্দেশ্যই হইল নিজের মনের ভাব অপরকে বুঝানো। যে শব্দ আমরা বলি ও বুঝি, আমাদের কথাবার্তায় যে-সব শব্দ চালু হইয়াছে, মূল যে ভাষারই হউক সে সবই-বাংলা শব্দ। সে সবেই পরিভাষা সৃষ্টির কথা এক চোটে ডিস্‌মিস্‌ করা উচিত।

### পরিভাষার জন্ম

তবে হ্যাঁ, এক দিক দিয়া আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। সেটা বড় ও দুরূহতার বিদেশী শব্দকে ছোট ও সুউচ্চার করা। খোদ ইংরাজীভাষীরাও তা করিয়াছে বিদেশী শব্দ নিবার বেলা। এমনকি ইংরাজী বড় বড় শব্দকেও তারা ছোট করিতেছে। ইউনি-ভাসিটিকে 'ভাসিটি', লেবরেটরিকে 'ল্যাব', পাবলিক রেস্টুরেন্টকে 'পাব', 'ফ্রিজিডেয়ারকে 'ফ্রিজ', একসামিনেশনকে 'একসাম' ইত্যাদি হাজারো বড় শব্দকে তারা সংক্ষিপ্ত করিয়াছে।

আমাদের জনগণও পণ্ডিতদের সাহায্য ছাড়াই অর্ডারলিকে আর্দালি, বেঞ্চকে বেঞ্চি, টেবলকে টেবিল, বটলকে বোতল, ডক্টরকে ডাক্তার, হস্পিটালকে হাসপাতাল, ম্যাজিস্ট্রেটকে মাজিস্টর, কন্ট্রোলকে কন্ট্রোলার, গভর্নমেন্টকে গবর্নমেন্ট, ট্রেয়ারিকে তেরজুরি, স্টাম্পকে ইণ্টাম্পর, স্কুলকে ইশ্কুল, স্টেশনকে ইশটিশন, টিকিটকে টিকট, ডাবলকে ডবল, গ্রেটিংকে গেরাটিন, সিমেন্টকে বিলাতী মাটি, ক্যাপ্টেনকে কাপ্তান, টার্পেন্টাইনকে তার্পিন, অফিসকে আফিস, কনিসকে কারনিশ, টর্চলাইটকে টিপ বাতি, টিউবওয়ালকে টিপকল, ব্রাশকে বুরুশ, কেটলকে কেৎলি ইত্যাদি হাজারো বিদেশী শব্দকে সহজ ও মিশ্রিত দেশী শব্দে পরিণত করিয়াছে। এই সরল রূপে সে শব্দ বেমালুম বাংলা শব্দ হইয়া গিয়াছে।

গত মহাযুদ্ধের সময় নোয়াখালির জনসাধারণের মুখে টর্পোডার শুনিয়াছিলাম তলপেড়া। গবিত বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছিলাম। প্রকৃতবে ঐ পরিভাষা মানিয়া লইয়াছিলাম।

## বাংলাদেশের কালচার

এই প্রসেস অবিরাম আজও চলিতেছে। চলিবে। দালান-ইমারতের রাজ-মন্ত্রী যোগালিয়া, জাহাজের খালাসি-সুকানি, কোবনেট ফার্মের কাঠ মিস্ত্রী, কলকারখানার মিকানিক, মিলের শ্রমিক, ছাপাখানার কম্পোজিটর মেশিনম্যান ইত্যাদি হাজার হাজার ভাষাকার আমাদের জন্য পরিভাষা রচনার কাজ করিয়া যাইতেছেন। এদের মুখে উচ্চারিত বিদেশী শব্দসমূহের যে রূপকে পণ্ডিতেরা বলেন অপভ্রংশ, আসলে সে গুলিই ঐসব শব্দের বাংলা রূপ, সুতরাং আমাদের পরিভাষা। আপনারা পরিভাষার তালাশে অভিধান লুগাত ডিকশনারি না ঘাঁটিয়া এদের কাছে যান।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার কথা বলিতেছি। ইংরাজী নভেল 'বেগ অব দি রিভার' 'এলবো অব দি রিভার' ও 'বাল্জ অব দি রিভারের' পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিয়া ওদের বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজিতে লাগিয়া গেলাম।

অনেক অভিধান ঘাঁটিলাম। অনেক বন্ধুকে ত্যক্ত করিলাম। মস্তিষ্ক আলোড়ন করিলাম। ফল হইল না। 'বেগ' এ 'এলবো' দুইটাই নদীর বাঁক, বলে অভিধানেরা। বন্ধুরাও বলেন তাই। কিন্তু শব্দ দুইটির গ্রন্থোগ তা বলে না। আর 'বাল্জের' অর্থ অভিধানের মতে কোন জিনিসের প্রশস্ত, স্ফীত বা উদগত অংশ। এর একটাও নদীর ব্যাপারে বোধগম্য নয়। কাজেই আমার মাথার বিষ নামিল না।

এমন সময় গ্রামের বাড়িতে গেলাম। ক্ষেত-খামার দেখিতে কামলাদের কাছেও যাইতে হইল। তারা নদীর ধারে কাজ করিতেছিল। ছোট নদী। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি নদীর বাল্জ দেখিলাম। বেগ এবং এলবোর পার্থক্যও বুঝিলাম। কামলাদের সাথে আলাপে বুঝিলাম গাংগের বাঁক ঠেগ ও কুনিভাংগা ওদের জন্য মামুলি শব্দ।

## শিক্ষার মিডিয়াম

বাড়ি যাওয়ার এমন আনন্দ এর আগে আর পাই নাই। কারণ গ্রামে গিয়াছিলাম জ্ঞান বিতরণের অহংকার লইয়া। ফিরিয়া আসিলাম জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে। এইভাবে ল্যাংগুয়েজ ফর্মেশনের ও ডকেবোলারি সৃষ্টির যে কাজটি আমাদের অলক্ষ্যে জনগণের মধ্যে চলিতেছে, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সাথে-সাথে এ কাজ শিক্ষিত সমাজেও শুরু হইবে। তাতে এর প্রসেস দ্রুত হইবে এবং এলাকা কুশাদা হইবে।

## চাকুরির বিপদ

সরকারী আধা-সরকারী দফতরে, বেসরকারী অফিসে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ফর্মে বাংলা প্রচলিত হওয়ার আগে বাংলার মাধ্যমে ডিগ্রি হাসিনের বিপদ আছে বলিয়া যে আশংকা করা হয় সেটা অহেতুক নয়। কিন্তু ওটা গাছ ও বীজের মতই নজিকের পিটিশিও প্রিন্সিপি-আই, বেগিং দি কোশচেন বা তর্কশাস্ত্রের আক্লা চক্রর। শিক্ষা আগে না চাকুরি আগে? ভাসিটির বলিতে পারেন: 'ডিমাণ্ড না হইলে সাপ্লাই দিব কোথায়? বাংলায় চাকুরির সংস্থান না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় শিক্ষা দিতে পারি না'।

সরকার ও অন্যান্য মনিবরা বলিতে পারেন: 'আগে বাংলায় আমাদের কাজের যোগ্য লোক তৈয়ার কর, তারপর আমরা বাংলা চলাইব'।

আসলে দুইটাই এক সংগে হইবে। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মর্মকথা তাই। বাংলাকে রাষ্ট্র-ভাষা করার দাবির মধ্যে সবই নিহিত আছে। ছাত্র-তরুণদের কাজ তারা করিয়াছে। সরকার সুধী-সমাজ ও ভাসিটির তাঁদের কাজ করেন নাই। তাই-আজও 'বাংলা প্রচলনের' 'সপ্তাহ' পালন দরকার হইতেছে। শিক্ষাদাতা ও চাকুরিদাতা উভয়েই কর্তব্যে অবহেলা করিতেছেন সমানভাবে। কাজেই আজিকার আন্দোলন আংশিক আন্দোলন নহ্ন, সামগ্রিক।

শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি স্বীকৃত হইলে চাকরির মাধ্যম করার দাবিও অটমটিক্যালি স্বীকৃত হইবে।

### শিক্ষকের অভাব

উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব যদি সত্যই থাকিয়া থাকে তবে বই-এর অভাবের মতই সেটা মিটিবে বাংলা চালাইবার পরে, আগে নয়। পশ্চিম-পাকিস্তানে উর্দু চালানোর ফলে বাঙালী শিক্ষকদের যদি চাকরি না গিয়া থাকে, তবে পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা চালাইবার ফলেও উর্দু-ওয়ালাদের চাকুরি যাইবে না। যদি যায়ও তবু কোটি-কোটি লোকের কল্যাণের জন্য তাঁদের স্যাক্রিফাইস করা উচিত। পাক-ভারতের স্বাধীনতা লাভে অনেক ইংরাজের চাকরি গিয়াছে। তবু ঐ শুল্কিতে কেউ আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে নাই।

বাংলা প্রচলনের দাবিকে কেউ-কেউ রাজনৈতিক দাবি বলিতেছেন। এঁদের মতে শিক্ষায় রাজনীতি আনা সাংঘাতিক বিপজ্জনক। এঁরা বলেন, শিক্ষা ব্যাপারটা শিক্ষাবিদদের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। পলিটিক্স চুকিলে শিক্ষার মান পড়িয়া যাইবে। শিক্ষা গোলায় যাইবে।

এঁদের কথা শুনিয়া ১৯৪১-৪২ সালের কলিকাতার কথা মনে পড়িয়া গেল।

হক মন্ত্রিসভা যখন সেকেশ্বরি এডুকেশনকে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির হাত হইতে নিয়া একটি বোর্ডের হাতে দিতে চাহিলেন, তখন হিন্দু শিক্ষাবিদদের মুখে এই ধরনের আশংকার কথাই শুনিয়াছিলাম। এঁরা আসলে শিক্ষা অর্থে বুঝেন মুষ্টিমেয় লোকের পাণ্ডিত্য, জনগণের শিক্ষা বুঝেন না।



## শিক্ষার মিডিয়াম

### শিক্ষার মান না জাতির মান

শিক্ষার মানের জন্য এঁরা জাতির মান কোরবানি করিতে পারেন। এঁরা শরৎচন্দ্রের টগর বৈষ্ণবী। জাত দিতে রাখী কিন্তু হেঁসেলের পবিত্রতা নষ্ট করিতে রাখী নন। দেশের শতকরা নব্বই জন মুর্থ থাকিলেও ক্ষতি নাই। দশ জন শুদ্ধ ইংরাজী বলিতে পারিলেই এবং দু-একজন অক্সফোর্ড হার্ভার্ড পাস করিলেই হইল। এঁরাই শিক্ষার মানের নামে কঠিন প্রলম্ব করিয়া শতকরা পঞ্চাশ-মাইট জন পরীক্ষার্থীকে ফেল করাইতে গর্ব বোধ করেন। এঁদের অহংকার : আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস পশ্চিম-পাকিস্তানের ফাস্ট ক্লাসের চেয়েও উচ্চ মানের। এই মানের অভিমানেই এঁরা আমাদের ছেলেদের ফাস্ট ক্লাস দেন না। সরকারী চাকরির বেলা কিন্তু পশ্চিমের ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট ক্লাসই এবং আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ডই। সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাসের এন্ট্রিকেশন রিজেকটেড। এইভাবে দরিদ্র দেশবাসীর সামনে বিদ্যালয়ের দরজা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিতে এঁদের বুক কাঁপিয়া উঠে না।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা কই। ১৯৫৬ সালে আমি ছয় দিনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী হইয়াছিলাম। মন্ত্রী হইয়াই প্রথম কাজটা করিলাম এই : ডাইস-চ্যাম্পেসলরসহ বড় বড় শিক্ষাবিদকে লইয়া পরামর্শ সভায় বসিলাম। আমার প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির কথা বলিলাম। আমার ইচ্ছা : এ বছর শতকরা আশি, তার পর বছর নব্বই এবং তৃতীয় বছরে শতকরা এক শ' জন পরীক্ষার্থীকে পাস করাইতে হইবে।

অনেকেই স্তম্ভিত হইলেন। বোধ হয় ভাবিলেন : এ কোন্ গজ-মুর্থ শিক্ষামন্ত্রীর পাল্লায় পড়া গেল? কেউ-কেউ বলিলেন : কেমন করিয়া তা হয়? প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলেও পাশ করাইতে হইবে?

আমি জোরের সাথেই বলিলাম : জি হ্যাঁ। উত্তর না দিলেও পাস করাইতে হইবে।

তারা বলিলেন : শিক্ষার মান যে নামিয়া পড়বে স্যার ।

আমি বলিলাম : নামুক না এক-আধটু শিক্ষার মান । আমাদের দেশে সব জিনিসের মানই ত নামিয়াছে । মন্ত্রিত্বের মান না নামিলে আমি কি শিক্ষামন্ত্রী হইতে পারিতাম ? আপনারাই কি সকলে হেড-অব-দি ডিপার্টমেন্ট হইতে পারিতেন ? কেরানী প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন, দারোগা এস. পি. হইয়াছেন, পাকিস্তান হওয়ার ফলেই । এই পাকিস্তান আনিয়াছে ছাত্ররা । তারাও এর এক-আধটু ফলভোগ করুক না ।

### পরীক্ষা নয় শিক্ষা কন্ট্রোল

এটা রাজনীতি ? শিক্ষায় পলিটিকস ? শিক্ষাবিদরা তাই মনে করেন । তাঁরা প্রমাদ গণিলেন । কিন্তু আশা ছাড়িলেন না ।

বলিলেন : কি করিয়া হইবে স্যার, পড়াশোনা ঠিকমত হয় না । বই-পুস্তক সময়মত পাওয়া যায় না । দরকারমত শিক্ষকও নাই ।

‘আপনাদের সব কথাই ঠিক ।’ আমি বলিলাম, ‘কিন্তু সেজন্য শাস্তি পাইবে কি ছাত্ররা ? শাস্তি যদি কারও পাইতে হয়, তবে পাইবেন তা শিক্ষা-বিভাগ শিক্ষা-দফতর আর মন্ত্রীরা । ছাত্ররা পাইবে কেন ? জানেন, ছেলেদের ফেল করাইয়া আপনারা কাকে শাস্তি দিতেছেন ? এটা জানেন আপনারা, যে-সব সাবজেক্টের জন্য একটা ছেলেকে ফেল করাইয়া তার জীবনের মোড় ফিরাইয়া দিলেন, বাস্তব জীবনে সে সাবজেক্টের দাম কি ? কখনও খোঁজ লইয়া দেখিয়াছেন কি, যে-ছেলেটা ফেল করিল তার বাবা জমি বন্ধক দিয়া পরীক্ষার ফিস দিয়াছিল ? ছেলেটা ম্যাট্রিক পাস করিয়া চাকুরি করিত, বাপের দেনা শোধ করিত, ছোট ভাইদের লেখাপড়ার খরচ বহন করিত । ইংরেজী আরবী ইতিহাস ভূগোলের জন্য ছেলেটাকে ফেল করাইয়া আপনারা একটা ছেলের মধ্য দিয়া একটা গোটা পরিবারের ভবিষ্যতের কপালে আগুন ধরাইয়া দিয়াছেন, সে খবর রাখেন আপনারা কেউ ?

## শিক্ষার মিডিয়াম

এ সবই হয় ইমোশন্যাল আউটবাস্ট অথবা পলিটিক্যাল স্টান্ট।  
এ-সব দিয়া শিক্ষার মত পবিত্র কাজ নিয়ন্ত্রণ চলে না।

কাজেই শিক্ষাবিদদের বেশীর ভাগই শিক্ষার উপর কালাপাহাড়ী হামলার আশংকায় চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরিলেন। বোধ হয় প্রার্থনা ট্রার্থনাও করিলেন। তাঁদের সে প্রার্থনা কবুল হইল। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কেন্দ্রের মন্ত্রী হইয়া করাচী চলিয়া গেলাম। ঢাকার শিক্ষার মানের একটা আসন্ন ফাঁড়া কাটিয়া গেল।

ফাঁড়া কাটিল। ফাঁড়ি জোরদার হইল। পুলিশের ফাঁড়ির চেয়েও প্রতাপশালী। শিক্ষার পথে আগ বাড়িতে গেলেই হংকার দিয়া উঠে :  
হ গোষ দেয়ার ? কৌন ওধার জাতা হ্যায় ?

ভীতু শিক্ষার্থী পলাইয়া প্রাণ বাঁচায়। সাকসেসফুল কনট্রোল। সব দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বাড়ে। পশ্চিম-পাকিস্তানেও। কিন্তু আমাদের দেশে কমে। সেনসাস রিপোর্ট খুলিয়া দেখুন : '৫১ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৪১,৪৮৪। '৬১ সালে ২৮,০৬৯। '৫১ সালে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৮,১১৭। '৬১ সালে তাদের সংখ্যা ৭'১৬৪। এ সবই ফাঁড়ির প্রতাপে। অপর দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ছিল '৫১ সালে ৪৪,৫০৪। '৬১ সালে ৮৪,০০০। সেখানে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছিল '৫১ সালে ১৪,৪২৯। '৬১ সালে হইয়াছে ২৪'৩৫৪। ম্যাট্রিকের কথা শুনিবেন ? '৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ২,৮২,১৫৮। পশ্চিম-পাকিস্তানের ছিল ২,৩৯,৬৯৮। '৬১ সালে পূর্বে হইয়াছে ২,৮৯,৯৫৭ আর পশ্চিমে হইয়াছে ৫,৮৪,১৮১।

এইভাবে আমরা শিক্ষিতের সংখ্যা কমাইয়া শিক্ষার মান বজায় রাখিয়াছি। পশ্চিমা ভাইরা রাখেন নাই। তাই তাঁরা উর্দুকে মিডিয়াম করিতেও পারিরাছেন। আমরা পারি নাই।

আমরা আরও ত্রিশ বছর ইংরেজী রাখিতে চাই। ত্রিশ বছর সময় গণিয়া-গাঁথিয়াই চাওয়া হইয়াছে। '৫১ সাল হইতে '৬১ সাল

দশ বছরে আমরা গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৪১ হাজার হইতে ২৮ হাজারে নামাইতে পারিয়াছি। দশ বছরে ১৩ হাজার। ২৮ হাজারকে 'মিরো'তে নামাইতে বিশ বছরের বেশী লাগিবার কথা নয়। তবু ত্রিশ বছর চাহিলাম। সাবধানের মার নাই।

### শিক্ষায় রাজনীতি

এ অবস্থায় শিক্ষাকে রাজনীতি হইতে অর্থাৎ সরকারী প্রভাব হইতে দূরে রাখিবেন? শুধু শিক্ষাবিদেদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন?

এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে কয়েক মাস আগের 'টাইম-ম্যাগাজিন'। আপনাদের অনেকেই নিশ্চয়ই তা পড়িয়াছেন। ঐ সংখ্যার কভার ফিচার : 'এডুকেশন ইয় টু ইম্পোর্টেন্ট টু বি লেফট সোল্‌লি উইথ দি এডুকটর' অর্থাৎ শিক্ষা জাতীয় জীবনের এত বড় মরুরী ব্যাপার যে, এর দায়িত্ব শুধু শিক্ষাবিদেদের হাতে ফেলিয়া রাখা যায় না।

কথাটা অতীব সত্য। যেমন : জনস্বাস্থ্যকে শুধু ডাক্তারদের হাতে ফেলিয়া রাখা যায় না। ঐ প্রবন্ধে আপনারা দেখিয়াছেন, বর্তমানে সাড়ে উনিশ কোটি মার্কিনীর মধ্যে সাড়ে পাঁচ কোটি ছাত্র-ছাত্রী স্কুল-কলেজে পড়িতেছে। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষা-তরীর যিনি হাল ধরিয়া আছেন, তাঁর ইশারায় বিশ লক্ষ শিক্ষক সে তরীর বৈঠা বাহিতেন, তাঁর নাম ফ্রান্সিস কেপেল। তিনি আগারগ্র্যাজুয়েট। বয়স তাঁর ৪৯। বিশ লক্ষ শিক্ষকের সবাই ডিগ্রিতে তাঁর উপরে। বয়সেও অনেকেই তাঁর বড়।

কিন্তু কারও মনে সে অভিমান নাই। কারণ, কেবল সরকারের গন্ধে জাতির গাজিয়ান। শিক্ষাটা দিবেন নিশ্চয়ই শিক্ষকরাই। কিন্তু কি শিক্ষা দিবেন, সেটা ঠিক করিবেন ছাত্রের বাপ। জাতির বাপ সরকার। গণতন্ত্রের সরকার মানেই রাজনীতি।

## শিক্ষার মিডিয়াম

এটাই স্বাভাবিক। বিদ্যালয় এখন আর কতিপয় বড় লোকের বিশেষ অধিকার নয়। শিক্ষার মানেই এখন জনগণের শিক্ষা। শিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড মানে জ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড, মিডিয়ামের স্ট্যান্ডার্ড নয়। ইংরাজীতে শিক্ষা দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হয় না। স্বারা কিশোর গার্টেন স্কুলে ইংরাজী মিডিয়ামে ছেলেমেয়েদের বাল্য শিক্ষা শুরু করিয়া ভাবিতেছেন সন্তানদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁরা আসলে ওদের জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতেছেন। স্বারা ছেলেদের সি. এস. পি. ও মিলিটারী সার্ভিসের উপযোগী স্মার্ট করিবার আশায় তাদের তথাকথিত ক্যাডেট কলেজে ইংরাজীর মাধ্যমে ম্যাট্রিক আই. এ. পড়াইতেছেন, তাঁরাও তাই করিতেছেন। অধিকন্তু মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার সার্বজনীন দাবির প্রতিবাদ করিতেছেন তাঁরা নিজেদের কাজের দ্বারা।

এঁরা ভুলিয়া যান, চল্লিশ বছরের যে শিক্ষ-লব্ধ জ্ঞানের বলে রুশ জাতি চাঁদের বুকে রুশ নিশান গাড়িয়াছে, সে শিক্ষা তারা পাইয়াছে রুশ ভাষার মাধ্যমে, ইংরাজীর মাধ্যমে নয়। আর মিলিটারী শক্তির কথা? হিটলার জার্মান জাতির যে অজেয় ও দুর্বীর মিলিটারী শক্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেটা তিনি করিয়াছিলেন, জার্মানদের মাতৃভাষাতেই। সেই অজেয় শক্তিকে চুরমার করিয়া স্ট্যালিনগ্রাড রক্ষা করিয়াছিলেন যে রুশ বীরেরা তাঁরাও মিলিটারী স্মার্টনেস অর্জন করিয়াছিলেন নিজেদের মাতৃভাষাতেই। আসলে জ্ঞানের মধ্যই ভাষা নিহিত, ভাষার মধ্যে জ্ঞান নিহিত নাই।

বিদেশী শিক্ষার আমি বিরোধিতা করিতেছি না। বিদেশী ভাষা শিক্ষা নিশ্চয় দরকার। সব সত্য জাতিই তা করিতেছে। জ্ঞান বিজ্ঞান ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতিতে দুনিয়া-জাহান আর আগের মত বিচ্ছিন্ন নাই। আকারেও অনেক ছোট হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জাতিক মিলামিশা অনেক ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। আরও হইবে। রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ও কৃষিক কারণে সবাইকে সবার ভাষা

## বাংলাদেশের কালচার

শিখিতে হইবে। আমরাও শিখিব। কিন্তু সেটা হইবে অন্যান্য সভ্যজাতির মতই। বিদেশী ভাষা শিখিব আমরা মাতৃভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়। একজন শিক্ষিত লোক মাত্র তিন বছরে যে কোনও বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, কোনও অবস্থাতেই গোটা জাতিকে বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে না।

অতএব, কোনও যুক্তিতেই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার মত জাতীয় জীবনের যরুরী কাজে একদিনের জন্যও বিলম্ব করা যায় না।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬

আনন্দের জোয়ার ঈদুল-ফিতর





## রোযা ও ঈদ

ঈদ অর্থ আনন্দ-উৎসব। ঈদুল-ফিতর অর্থ উপাস ভাংগার আনন্দ-উৎসব। এ উৎসবের আনন্দ যা-তা গামুলি আনন্দ নয়। এটা উল্লাস। যাকে বলে পুলকানন্দে ফাটিয়া পড়া। এ ঈদ আসে অনেক দিনের সাধনার পর। কি কঠোর কৃচ্ছ ও সংযম সাধনা তা। একটানা ত্রিশ দিনের নিরন্তর উপবাস। দিনে রোযা ও রাতে এবাদত। ইম্লিয়েরা সবাই শৃংখলিত বন্দী। এক মাস করে পায় তারা মুক্তি। কি পুলক সে মুক্তিতে। সেই মুক্তির আনন্দেই এই উল্লাস। যেন বাঁধ-ভাংগা স্রোত। সেই বেগ সেই তেজ। আনন্দ-উৎসবকে গলা-ফাটানো উল্লাসের উন্নততায় উদযাপন করা যদি কখনো প্রয়োজন ও সংগত হয়, তবে তা এই দিনে। এই কারণেই এই উৎসবের এই নাম। এ নাম তাৎপর্যপূর্ণ।

কিন্তু আমরা তা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রতি বছর আমরা সে ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেছি, সে ভুল দোহরাইতেছি। প্রতি বছর আমরা এই উপলক্ষে অনেক কিছু বলিতেছি বক্তৃতায়, লিখিতেছি বিশেষ সংখ্যার সাময়িকীতে। সবই ভক্তি গদগদ কর্তের কথা। ভক্তিরসাপ্লুত লেখা। সে-সব কথার যতটুকু আন্তরিক, যতটুকু অর্থপূর্ণ, তার সবটুকু রোযার কথা, ঈদের কথা নয়। রোযার আধ্যাত্মিক দিক নিশ্চয় আছে। রমযানের রোযার আরও বেশী আছে : রোযা সংযম। রমযানের রোযা সমবেত সামাজিক সংযম। এর শিক্ষা ও কল্যাণের একাধিক দিক আছে। তা বুঝিবার ও বলিবার দরকারও আছে খুবই।

রোযা কিন্তু ঈদ নয়। ঈদও রোযা নয়। ঈদুল-ফিতর রমযানের রোযা নয়। কিন্তু ঈদ-সংখ্যা কাগজে আমরা ঈদের মহিমা কীর্তনে যে বিদ্যাবুদ্ধি খরচ ও পাণ্ডিত্য যাহির করি, তার সব কথা সত্য হইলেও এগুলি ঈদের কথা নয়, রমযানের রোযারই কথা। রোযা ও ঈদ ত্যাগ ও ভোগের মতই দুইটা অ্যান্টিথেসিস, বিপরীত গুণাত্মক কাজ। রমযানের বেলা একটা শর্ত আর একটা পুরস্কার, একটা ক্রিয়া আর

একটা ফল। শ্রমের পুরস্কার যেমন বিশ্রাম, অধ্যয়নের পুরস্কার যেমন প্রমোশন, ত্যাগের পুরস্কার যেমন ভোগ, রমযানের রোযার পুরস্কার তেমনি ঈদুল-ফিতর।

কিন্তু আমরা দুইটাকে এক করিয়া ফেলিয়াছি। আমাদের আনন্দোৎসব হইয়া উঠিয়াছে এবাদতের উৎসব। এবাদত ও উৎসব একত্রে চলিতে পারে না। ফলে আমাদের ঈদের আনন্দের স্থান দখল করিয়াছে এককভাবে এবাদত। ঈদের দিন হইয়াছে এবাদতের দিন। ঈদের সমাবেশ হইয়াছে প্রার্থনা সভা। আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এই দুর্ঘটনা ঘটে শুধুই পাক-ভারত উপমহাদেশে, বিশেষতঃ পাক-বাংলায়। এমন হইবার ঐতিহাসিক কারণ আছে।

### নিরানন্দের জন্ম

ছয় শ' বছরের শাসক জাতি মুসলমানরা ইংরাজের যুলুমে এক রাতে পথের ফকির হইয়া যায়। লুপ্ত রাজ্য ও স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে তারা প্রায় এক শ' বছর ধরিয়া। এই সময়ে প্রাণ ধারণই মুসলমানদের জন্য কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দ উৎসব করিবার সামর্থ্য-সুযোগ তাদের ছিল না।

ইংরাজ শাসকদের সর্বাঙ্গক যুলুমবাঘি চলে বাংলার মুসলমানদের উপরই বেশী। ওহাবী আন্দোলন ও সিপাহি বিদ্রোহ গণ-বিপ্লবের আকার ধারণ করে বাংলাতেই। ওদের যুলুম নিপীড়ন যত বাড়়ে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের সংকল্প হয় তত দৃঢ়। তাঁরা নিজেরা সকল প্রকার ভোগ-বিলাস ও আমোদ-উল্লাস বর্জন করেন এবং মুসলিম জনসাধারণকে করিতে বলেন। সাময়িক বিপদেই মানুষ উৎসব-আনন্দ বাতিল করে। বিপদ দীর্ঘস্থায়ী হইলে ত কথাই নাই।

কাজেই মুসলমানরা জাতীয় সংকটের দিনে অস্টারিটির নীতি হিসাবেই ঈদের দিনের উৎসবও যথা-সম্ভব সংক্ষিপ্ত করিয়াছিল।

## আনন্দের জোয়ার ঈদুল-ফিতর

আমোদ-প্রমোদ বাতিল করিগাছিল। ধর্মীয় অনুষ্ঠানটুকু না করিলেই নয় বলিগা অনাড়ম্বর গুরু-গভীর পরিবেশে তা সম্পন্ন করিত।

বিপদের দিনে সকল দিক হইতে বঞ্চিত ও নিরুপায় হইলে মানুষ বেশী ধামিক হয়। বিপদ-তারগ আল্পার দরগায় মোনাজাত করে। কাজেই আনন্দ-উৎসবের স্থান এবাদত-মোনাজাতে দখল করে জাতির জীবনে এমনি দুঃসময়ে। এই কৃচ্ছ সাধনা শতাব্দী কাল স্থায়ী হওয়ায় মুসলমানদের সামাজিক জীবন হইতে সকল প্রকার আনন্দ-উৎসব এবাদতের উৎসবে পরিণত হয় এই যুগে।

### প্রতিষেধকের আবশ্যিকতা

আসলে ঈদ ঈদই, এবাদত নয়। ঈদের জমাতে দুই রাকাত নমাযের বিধান আছে বলিগাই ঈদের সমাবেশ প্রার্থনা-সভা হইগা যায় নাই। নমাযের বিধান করা হইগাছে বিশেষ এক উদ্দেশ্যে, অভিনব এক ধরনে। এই নমাযের ধরন ও শরিয়তী বিধান একটু তলাইগা বিচার করিলেই সেই বিশেষ উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যাইবে। সে উদ্দেশ্য সাবধানতা; প্রতিষেধকের ব্যবস্থা। দীর্ঘ সংযমের শেষে যখন মানুষকে ভোগের অধিকার দেওয়া হয়, তখন এই সাবধানতাটুকুর দরকার হয়। মানুষের মনের অবস্থা হয় তখন সদ্যমুক্ত দীর্ঘ দিনের কয়েদীর মত। তার ভোগ-স্পৃহা হয় ঝাঁচাছাড়া পাখীর মত উদ্দাম। লাল-সাল আসে তার প্রবল বন্যা, বিপুল জোয়ার। মানুষ ভাসিগা যাইতে পারে সে বন্যায়।

সে ইন্দ্রিয় সেবায় উন্নত হইতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অতীতে অমন অনেক হইগাছে। ধর্মীয় আনন্দোৎসব বীভৎস অনা-চালের তৈরবী চক্রে রূপান্তরিত হইগাছে, তীর্থস্থান ব্যাভিচারের আড্ডায় পরিণত হইগাছে, এমন নযিরে ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভতি। প্রতিষেধকের সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই বলিগাই এ সব ঘটিগাছে।

তাই ইসলামে এই প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা হইয়াছে দুই রাকাত নমাযের বিধান করিয়া। ঈদের উৎসবের সাথে দুই রাকাত নমায জুড়িয়া দিয়া শরিয়ত মুসলমানদেরে শুধু এই কথাটাই স্মরণ করাইয়া দিয়াছে যে, উল্লাসের আতিশয্যে তারা যেন খোদাকে ভুলিয়া না যায়। তাই বলিয়া ঐ দুই রাকাত নমাযে আনন্দোৎসবকে এবাদতের পরব করিয়া ফেলে নাই।

দুই রাকাত নমাযের বিধান করিতে গিয়াও শরিয়ত যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে। নমায ধর্মীয় অনুষ্ঠান। ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুরু-গভীর ব্যাপার। সে অনুষ্ঠানে আমোদ-প্রমোদ করিলে ধর্মকে লঘু করা হয়। তাকে অসম্মান করা হয়। এই বিশ্বাসে মুসলমানরা ঈদের দিনে আমোদ-উল্লাস হইতে বিরত না থাকে সেই উদ্দেশ্যেই ঈদের নমাযে জুমা ও ওয়াকতিয়া নমাযের আহকাম-আরকান পুরাপুরি প্রয়োগ করা হয় নাই। এটা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য।

### ঈদের নমায বনাম সলাত

এক, ঈদের জমাতের মত বড় জনসমাবেশের জন্য মাত্র দুই রাকাত নমাযের বিধান করা হইয়াছে। মুসলমান মাত্রই জানেন যে, দুই রাকাতের কমে নমায হয় না। কাজেই ঈদের নমায স্পষ্টতঃই সংক্ষেপতম করা হইয়াছে। ঈদ অনুষ্ঠানকে এবাদতের অনুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা থাকিলে অস্তুতঃ জুমার নমাযের মত বার রাকাত নমাযের ব্যবস্থা করা হইত।

জুমার নমায হয় সপ্তাহে একবার। ঈদুল-ফিতরের নমায হয় বছরে একবার। বহু জামে-মসজিদের মুসল্লীদের এবং আরও অনেকের সমাবেশ হয় ঈদের ময়দানে! বড় জমাতে এবাদত করিবার এমন সুযোগেও শরিয়তে ফরশ নমাযের ব্যবস্থা করা হইল না ঈদের জমাতে। এই বিধান হইতে এটা পরিষ্কার বোঝা যায় ঈদ পর্বকে এবাদতের অনুষ্ঠান করা শরিয়তের অভিপ্ৰায় নয়। তাড়াতাড়ি ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি

## আনন্দের জোয়ার ঈদুল-ফিতর

সারিয়া মুসলমানরা যাতে আনন্দ-উল্লাসে শরিক হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই সংক্ষিপ্ততম মিনিমাম নমাযের বিধান করা হইয়াছে।

দুই, এই মুখ্‌তসর নমাযটুকুকেও ফরয করা হয় নাই। বড়জোর সুলত-মোয়াজ্জেদা করা হইয়াছে। এটা লক্ষ করার বিষয় যে, ধর্মানুষ্ঠান হিসাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ও সাপ্তাহিক এক ওয়াক্ত জুমার নমাযের যে বিধান করা হইয়াছে তার একটিও ফরয-ছাড়া নয়। শুধু ঈদের নমাযই ফরয-ছাড়া।

তিন, ঈদের দুই রাকাত নমাযকেও সালাতের পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় নাই। সালাতের অনেক বাধ্যতামূলক আরকান ঈদের নমাযে নাই। যথা :

(ক) জমাতের নমাযের শুরুতে আযান ও একামত অবশ্যই দিতে হইবে। ঈদের নমাযে আযান ও একামত নিষিদ্ধ।

(খ) ফরয নমায ছাড়া আর কোনো নমায জমাতে অর্থাৎ সম-বেতভাবে ইমামের পিছে পড়ার বিধান নাই। কিন্তু ঈদের নমাযটুকু জমাতে ইমামের পিছে পড়িতে হয়।

(গ) সুলত নমাযে জোরে কেরাআত পড়া নিষিদ্ধ। কিন্তু ঈদের নমাযে জোরে কেরাআত পড়িতে হয়।

(ঘ) ঈদের নির্দিষ্ট দুই রাকাত সুলতের অতিরিক্ত কোনও নফল নমায পড়া নিষিদ্ধ।

(ঙ) হায়েযওয়ালী স্ত্রীলোকের জন্য নমায নিষিদ্ধ। অথচ তাদের ঈদের জমাতে শামিল হইবার জন্য তাগিদ করা হইয়াছে।

(চ) জুমার নমাযের খোৎবা খোৎবায়-আউয়াল ও খোৎবায়-সানি দুই ভাগে ভাগ করিয়া পড়িতে হয় এবং খোৎবার মাঝখানে বসিতে হয়। কিন্তু ঈদের খোৎবা একটানে পড়িয়া ফেলা যায়।

চার, ঈদের দিনে রোযা রাখা হারাম করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই আনন্দের দিনে কোনও মুসলমান আনন্দ-উল্লাস হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না, ধর্মের নামেও না। তার মানে এই দিনে আনন্দ-উল্লাস করা বাধ্যতামূলক।

আনন্দের আবিষ্কৃত্য

অতএব দেখা গেল, ঈদের দিনকে শরিফত ঈদের দিন হিসাবেই নির্ধারিত করিয়াছে, এবাদতের দিন নির্ধারিত করে নাই। তবু যে আমরা এ দেশে আনন্দের উৎসবকে এবাদতের অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছি, তার কারণ ঐতিহাসিক। ইতিহাসের গতির অমোঘ আইন অনুসারেই তা ঘটিয়াছে।

ফলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণামও আমাদের ভুগিতে হইয়াছে। আনন্দোৎসবকে এবাদতের অনুষ্ঠানে পরিণত করায় আমাদের জাতির ঘোরতর লোকসান হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমন, অতিরিক্ত ধার্মিক হওয়া অধর্ম। সব ব্যাপারের মতই ধর্ম কার্যেও অতিরিক্ত খারাপ। খেলার সময় খেলা পড়ার সময় পড়ার মতই এবাদতের সময় এবাদত আমাদের সময় আমোদ, এটা খাঁটি সত্য কথা এবং জীবনের অলংঘনীয় কানুন। এ কানুন অমান্য করিলে শাস্তি পাইতে হইবে। মানুষের সকল ইন্দ্রিয়-বৃত্তিই আল্লাহ দেওয়া। ও-গুলির অসদ্ব্যবহার করা যেমন পাপ, ব্যবহার না করাও তেমন পাপ। সে পাপ শুধু পরকালের পাপ নয়, ইহকালের জন্যও।

মানুষের চেতনার কল তিনটি : মন অন্তর ও আত্মা। এর একটি-কেও বিকল করা চলে না। তিনটিরই উন্মেষ ও বিকাশ দরকার। তা না হইলে মানব পূর্ণাংগ মানুষ হয় না। আনন্দ এই তিনটি কলের উন্মেষ ও বিকাশের জন্য সমান প্রয়োজন। মানুষের আনন্দের ক্ষুধা তার পেটের ক্ষুধা ও যৌন-ক্ষুধার মতই বাস্তব ও তীব্র। এ ক্ষুধা মানুষের জৈবগুণ। সূতরাং প্রকৃতি। এই ক্ষুধা মানুষের চেতনার তিনটি যন্ত্রেই পরিব্যাপ্ত।

ছোদার সৃষ্টি-কৌশলই এমন যে, মানুষের মনে অন্তরে ও আত্মায় এমন কোনও ঘটনা ঘটে না যা তার দেহে স্পন্দিত হয় না। এ অবস্থায় মানুষের আনন্দের ক্ষুধাকে দমাইয়া রাখা পেটের ক্ষুধা ও যৌন-ক্ষুধা দমাইয়া রাখার মতই প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। অধিক খাওয়াও যেমন

## আনন্দের জোয়ার ঈদুজ-ফিতর

স্বাস্থ্য-হানিকর, উপাস থাকাও তেমনি স্বাস্থ্য-নাশক। আনন্দ-ক্ষুধা সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য।

এই কারণেই কোনও ধর্মই আনন্দ-উল্লাস নিষিদ্ধ করে নাই। ইসলাম ত করে নাই-ই। আল্লার-দেওয়া সমস্ত নিয়ামত উপভোগ করা তাঁরই নির্দেশ। জীবনের আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখার নামই বৈরাগ্য। ইসলামে বৈরাগ্য হারাম।

### সীমা লংঘন

কিন্তু আমাদের সমাজ-সংস্কারকরা এক হৃদ ঠেকাইতে গিয়া আর এক হৃদে চলিয়া গিয়াছেন। এক সীমা রাখিতে গিয়া আরেক সীমা ভাংগিয়াছেন। আমোদ-প্রমোদের মধ্য দিয়া পাপাচার আসে বলিয়া তাঁরা আমোদ-প্রমোদই নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এ যেন আংগুরে মদ তৈয়ার বলিয়া আংগুর খাওয়া ও আংগুরের আবাদ বন্ধ করিয়া দেওয়া। আমাদের সমাজপতিরা কিন্তু তাই করিয়াছেন।

এইভাবেই আমাদের উপাস-ভাংগা উল্লাসের উৎসবটা হইয়া পড়িয়াছে প্রার্থনা-সভা। রোযা শেষে ঈদের আনন্দে যেখানে প্রাণ-প্রাচুর্যে আমাদের জীবনের দুকূল ছাপাইয়া পড়া উচিত ছিল সেখানে সেদিনেও আমরা ধর্ম-ভারে নুইয়া গুরু-গান্ধীর মধ্যে দিন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছি।

ধর্মোৎসবের ধর্মটুকু উৎসবের উল্লাস-ধ্বনির নিচে চাপা পড়ার নখির দুনিয়াতে মাত্র একটি। সেটি আমাদের ঈদ। ঈদের দিনে আমরা মাঠে গিয়া দুই রাকাত নমাজ পড়ি। রোদে পড়িয়া খোৎবা শুনি। কিছু বুঝি, বেশির ভাগই বুঝি না। যা বুঝি তার সবই বহবার শোনা কথা। মন বসে না।

খোৎবা শেষ হইলে দাঁড়াইয়া আশে-পাশের চিনা-জানা দু'চার-জনকে কোলাকুলি করি। ঘামে ভিজিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসি। ভিজা কাপড় হাড়ি। বাস্! ঈদ শেষ।

অঞ্চল মনোযোগে আমরা খেৎবা শুনিয়াছিলাম বলা চলে না। নমায়ে আনন্দ পাইবার মত সুফী-দরবেশে আমাদের দেশ ভর্তি, একথাও বলা চলে না। কাজেই নিরস ধর্ম-কাজ করিয়াই বাড়ি ফিরিলাম।

এবার খাওয়ার পালা। ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকল মুসলমানই ঈদের দিনে যার-তার সাধ্যমত ভাল-ভাল খায়, ভাল-ভাল পরে। এটা অবশ্য ছোট-বড় সব জাতিই করে তাদের উৎসবে। আমরাও করি।

কিন্তু মন ও মস্তিষ্কের আনন্দ দিবার মত কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমাদের ঈদে নাই। আমাদের আনন্দ খাওয়া-পরার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যান্য জাতি হইতে আমাদের পার্থক্য শুধু এইখানে।

এই পার্থক্য কল্যাণকর নয়। আগম-নির্গমে আসা-যাওয়ায় জাতির মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে বাস্তবিক ধর্মীয় উৎসবের আত্মিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য শুধু নেইটুকু। সারা বছর ধরিয়া গণ-মন অধীর আগ্রহে এই উৎসবের অপেক্ষা করে। উৎসব-দিবসের নৈকট্যে মানুষের আগমন সম্ভাবনায় আশেকের বৃকের মতই জাতির বৃকে পূজক-স্পন্দন হয়। উৎসব আরম্ভে জাতির দেহের আনন্দ-শিহরণ ও মনের উল্লাস উন্মত্ততায় ফাটিয়া পড়ে। উৎসবের অবসান গণ-মনে জাতীয় চেতনার ছাপ, সংকল্পের রেখা ও কল্পনার রেশ রাখিয়া যায়। আসলে বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবের মূল স্পিরিচুয়াল উদ্দেশ্য ইহাই।

### আনন্দোৎসবের তাৎপর্য

যে ধর্মীয় উৎসব জাতির মনে যতবেশী স্পন্দন সৃষ্টি ও যত গভীর রেখাপাত করিতে পারে, জাতীয় উৎসব হিসাবে তা তত বেশী সার্থক। ধর্মোৎসবই সকল জাতির কৃষ্টি-জীবনের বৃহত্তম উর্বর ক্ষেত্র। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্কেলিটনের চার পাশ ঘিরিয়া সামাজিক আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের যে লহ-গোশত ও রূপ-রেশা গড়িয়া উঠে তারই নাম ধর্মোৎসব। এই ধর্মোৎসবের বিকাশ-বিস্তৃতিই সব জাতির কাল-



## আনন্দের জোয়ার ঈদুল-ফিতর

চারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার। বস্তুতঃ স্বপতি-ভাক্ষম শিল্প-সংগীত কাব্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে এই ধর্মেৎসবকে জিত্তি করিয়াই।

ধর্মেৎসবের বিশেষ গুণ এই যে, এ উৎসবের আয়োজন করে মুষ্টিমেয় ধনীলোকে, কিন্তু তার আনন্দ উপভোগ করে ধনী-নির্ধন সকলে। অন্য ধর্মের লোকও আকৃষ্ট হয় সে উৎসবে এবং শরিক হয় সে আনন্দে। এইভাবে উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। এই কারণেই যে ধর্মীয় উৎসব গির্জা-মসজিদ-মন্দিরের বাহিরে যত বেশী বিস্তৃত ও প্রসারিত হয় জাতীয় রূপ পাইবার সম্ভাবনা হয় তার তত বেশী।

এই মাপকাঠিতে বিচার করিলে আমাদের আজিকার ঈদ সাংস্কৃতিক আনন্দেৎসব হিসাবে প্রাণহীন এবং জাতীয় উৎসব হিসাবে সম্ভাবনাহীন। আমাদের ঈদে আনন্দ নাই, আছে বেদনা। সংস্কৃতি নাই, আছে বিকৃতি। উল্লাস নাই, আছে আর্তনাদ। সুস্থ স্বাভাবিকরূপে নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে না পারিয়া আনন্দ-পাগল জনসাধারণ তাই পাপের পথে আনন্দ কুড়াইতেছে।

সাংস্কৃতিক আনন্দেৎসবের অভাবে তারা কুস্থানে গিয়া ও ক্লাবে-পার্টিতে 'ঈদ বল' ড্যান্স করিয়া মুসলিম কৃষ্টিকে বুড়া আংগুল দেখাইতেছে। বিকলাংগ কুঠরোগী ও বেকার ডিক্কাজীবী ছেলে-বুড়া নারী-পুরুষ ঈদের মাঠে ও রাস্তাঘাটে ডিড় ও আর্তনাদ করিয়া আমাদের আর্থিক সমাজ-ব্যবস্থাকে ও কৃষ্টিক দারিদ্র্যকে ধিক্কার দিতেছে। যে সমাজে আনন্দের ব্যবস্থা নাই, সেখানেই পাপ ও অপরাধ বেশী। জেলখানার কয়েদীর সংখ্যাই তার প্রমাণ।

আমাদের সুখী সমাজ ও তরুণরা এটা তীব্রভাবে অনুভব করিতে-ছেন। তাই তাঁরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে ইদানীং ঈদ-রিইউনিয়নের আয়োজন করিয়া থাকেন। খুবই শুভ সূচনা। কিন্তু এই অনুষ্ঠান আজও খানা-গিনাতেই সীমাবদ্ধ। একে সাংস্কৃতিক অলংকার পরাইয়া তরুণদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, আমাদের আনন্দ-উৎসবের চৌহদ্দি পেট নয়।

## সাংস্কৃতিক আন্দোলনসব

অতএব ঈদ উৎসবকে আমাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনসব ও পাকিস্তানের জাতীয় উৎসবে পরিণত করা নিতান্ত প্রয়োজন। মুসলমানদের সামাজিক ও আর্থিক কল্যাণের জন্যই এটা দরকার। কাজটা তেমন কঠিনও নয়। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুধীজনের উদ্যমে আর্ট-সাহিত্যের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাংস্কৃতিক রূপায়ণ সম্ভব। অতীতে তা হইয়াছে। আমাদের বেলায়ও তা হইতে পারে।

ধর্মের বিধান রদ-বদল করার মত একতেলাফী কাজে হাত দিবার কোনও দরকার হইবে না। মিলাদ অনুষ্ঠানের মত কিছু-কিছু বেদ-আতুল-হাসানার প্রবর্তন করিলেই চলিবে। প্রগতিবাদী ওলামাসহ সুধী-সমাজ সহজেই এটা করিতে পারেন। হযরত ইব্রাহিমের কোরবানির স্বপ্ন, হযরত মোহাম্মদের নবুওত হিজরত মেয়াজ জংগে-বদর মক্কা-বিজয় বিদায়ী হজ ইত্যাদি স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনাকে আর্টের অলংকারে ভূষিত করিয়া দুই ঈদের উপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানরূপে প্রবর্তন করা যাইতে পারে। ঈদ-উৎসব দুইটিকে একদিন সমাপ্ত না করিয়া আমাদের মোহল্লরম, হিন্দুদের দুর্গোৎসব, খৃষ্টানদের বড়দিন ও বৌদ্ধদের মাঘী পূণিমার মত একাধিক দিনে ব্যাপ্ত করা যায়।

শুধু এইভাবেই আমরা ধর্মীয় ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে নির্মল আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণে পরিণত করিতে পারি এবং সে আনন্দ-রসের আবেহায়াতে গণমনকে সঞ্জীবিত এবং সমাজকে অপরাধ-মুক্ত রাখিতে পারি। ঈদ-রিইউনিয়ন, ঈদ-মেলা, ঈদ-জ্ঞান, ঈদ-যিলাফত, ঈদ-মিছিল এই ধরনের যে কোনও নামে আমরা দুইটি ঈদকে প্রাণ-প্রাচুর্যের সাংস্কৃতিক আন্দোলনসব রূপায়িত করিয়া পাক-বাংলার আসমান-জমিন উল্লাস-মুখর ও জনগণের জীবন পুলকোজ্জ্বল করিতে পারি। আমাদের তরুণ চিন্তাবিদরা, লেখক-সাহিত্যিকরা এদিকে মনোযোগ দিবেন কি?

১লা শওয়াল, ১৩৮৪ হিজরি।

**আম্মার স্বপ্নের শহীদ মিনার**



## প্রতীকের মিনার

আজ একুইশা ফেব্রুয়ারি। শহীদ দিবস। আমাদের জাতীয় জীবনের স্মরণীয় দিন। ইতিহাসের পাতায় এই দিন অমলিন থাকিবে চিরকাল। কারণ এটা শুধু স্মৃতির দিন নয়। প্রতীকেরও দিন।

শহীদ মিনার তার স্থপতি রূপ। শহীদদের মুখে ধ্বনিত যে জীবনের বাণী প্রতিফলিত হইবার কথা আমাদের জাতীয় জীবনে, স্থপতি রূপে তাই প্রতিকৃত হইবার কথা শহীদ মিনারে। আমার দুঃখ, তা হয় নাই। জাতীয় জীবনে সে বাণী অংশত রূপান্তিত হইয়াছে। শাসনতন্ত্রে আমাদের মাতৃভাষা রাষ্ট্র ভাষারূপে স্বীকৃত হইয়াছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে আজও বাংলা চালু হয় নাই সত্য। কিন্তু আজ বাদে কাল তা হইবেই।

কিন্তু শহীদ মিনারে যে স্থপতি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তার সংশোধনের কোনও উপায় আছে কি? সে দিন খবরের কাগজে পড়িলাম, জনৈক লেখক দুঃখ-বেদনার ভাষায় শহীদ মিনারকে 'এপলজি ফর এ মেমোরিয়াল' বা দায়সারা স্মৃতি-স্তম্ভ বলিয়াছেন। লেখক আফসোস করিয়া বলিয়াছেন, শহীদ-মিনার প্ল্যান-মোতাবেক নির্মিত হয় নাই। যাও হইয়াছে, মেরামত ও হেফাজতের অভাবে তাও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেওয়ান-চিহ্নগুলি ছাতাইয়া যাইতেছে। পলস্তরা খসিয়া পড়িতেছে। গোটা স্মৃতি-স্তম্ভটাই ধ্বংসস্থাপে পরিণত হইতেছে ইত্যাদি।

কিন্তু এটাই কি সব কথা? অভিযোগ কি শুধু ঐটুকু? আমার মতে তা নয়। আমার দুঃখও ওখানে নয়। আমার অভিযোগ আরও গভীর, আরও মৌলিক। সে কথাটাই আজ বলিব।

ছাত্র-তরুণদের দাবির মধ্যে শহীদ মিনারের কোনও স্থাপত্য রূপ বা আর্কিটেকচারেল কাঠামো ছিল না, একথা সত্য। একথাও ঠিক যে, যুক্তফ্রন্টের একুইশ দফা দাবির মধ্যে যে শহীদ মিনারের ওয়াদা ছিল, তাতেও মিনারের কোনও নির্দিষ্ট রূপ ও আকার ছিল না।

কিন্তু একুইশ দক্ষা ম্যানিফেস্টো রচনার সময় আমার মনের আয়নার শহীদ মিনারের একটা সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ছিল, সেটা না বলিয়া পারিতেছি না। কারণ ওটা আমার মন হইতে কিছুতেই মুছিয়া যাইতেছে না। বরঞ্চ প্রায়ই, বিশেষতঃ শহীদ দিবসে, ওটা আরও স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া উঠে। সেটা প্রতীকের ছবি, স্মৃতি-স্তম্ভের ছবি নয়।

### শহীদ মিনারের বৈশিষ্ট্য

আমার কল্পনায় প্রস্তাবিত শহীদ মিনার অতীতের স্মৃতি-বাহক ছিল না, ছিল জাতির ভবিষ্যতের পথ-প্রদর্শক আসমান-ছোওয়া অংশুলি নির্দেশ। এর নাম দেওয়া হইয়াছে মিনার, স্তম্ভ মেমোরিয়াল বা মনুমেন্ট দেওয়া হয় নাই, সে কথা আমি এক মুহূর্তের তরেও ভুলি নাই। মিনার উচ্চতা-জাপক। আসমানের দিকেই হাতছানি মিনারের। মুসলিম স্থপতির বিজয়-কেতন সারা দুনিয়ার আসমানে উড়াইতেছে এই মিনার। কুতুব মিনার তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

কাজেই উচ্চতায় শহীদ মিনারের নয়র থাকিবে কুতুবের দিকে। কিন্তু ঐ পর্ষস্ত। শহীদ মিনারের প্রটোটাইপ হিসাবে কুতুবের স্থান ওর বেশি না। কারণ এ মিনারের ফাংশান হইবে কুতুব হইতে ভিন্ন। কুতুব মিনারের মত পথের ধারে দাঁড়াইয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করিবে না শহীদ মিনার। পথের উপর দাঁড়াইয়া ভবিষ্যৎ গৌরবের পথ নির্দেশ করিবে সে।

এই দিক দিয়া প্যারিসের আইফেল টাওয়ার হইবে শহীদ মিনারের মডেল। এই শহীদ মিনার হইবে ঢাকা শহরের ল্যাণ্ড মার্ক। তার পূর্ণ ছবি এই :

প্রশস্ত চৌরাস্তার উপর সগৌরবে দাঁড়াইয়া আকাশচুম্বী মিনার। এই মিনারের নিচে দিয়া সুদূর প্রসারিত চারটা কুশাদা রাস্তা। সে সব রাস্তায় অবিরাম চলিয়াছে জনপ্রোত ও যানবাহনের মিছিল।

## আমার খপ্পের শহীদ মিনার

উপরের দিকে মিনার-চূড়ার চারদিক মুখ করিয়া চারটা বিশাল-কায় টাওয়ার ক্লক । লণ্ডন শহরের বিগবেনের চারটার একত্র সমাবেশ । চূড়ার অভ্যন্তরে এনারাম বেল । ঘন্টায়-ঘন্টায় ঘন্টাধ্বনি । সারা শহরে প্রতিধ্বনি । নিওনলাইট-মোড়া বিজলী-আলোকিত ঘড়ি । বিজলীতে চলে । রাতেও আলোকে ঝলমল ।

দেখা যায় সারা শহর হইতে, দূর-দূরান্ত হইতে । করাচী-কলিকাতা হইতে ব্যাংকক-হংকং টোকিওর পথে হাওয়াই জাহাজের যাত্রীরা শূন্য হইতে দেখে সে মিনার । বিস্ময়ে তাকাইয়া থাকে সে ল্যাণ্ড মার্কেসর দিকে । শাহাদত আংগুলে দিক নির্দেশ করিয়া একজন আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করে : ‘বলিতে পারেন ওটা কি এবং কোথায় ।’ ‘ওটাই পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা শহরের বিখ্যাত মিনার ।’ আবার প্রশ্ন হয় : ‘ওটার নাম শহীদ মিনার কেন ? উত্তর হয় : ‘মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ও-দেশের ছাত্র-তরুণরা জান দিয়াছিল । ওটা তাদেরই স্মৃতি-স্তম্ভ ।’

হাওয়াই যাত্রীদের মধ্যে রোজ এই ধরনের আলাপ হয় । একদিন নয়, দুইদিন নয়, চিরদিন ।

### মিনার নয় চাতাল

আমার এ স্বপ্ন ফলে নাই, এটা সবাই জানেন । সেজন্য আমার নৈরাশ্য সীমাহীন । সে নৈরাশ্য আফসোসে পরিণত হয়, যখন দেখি মিনার অবনমিত হইয়াছে একটি অনুচ্চ চত্বরে । না বলিয়া দিলে কে বুঝিবে ওটা একটা মিনার ?

মিনারের এই চাতালী রূপ কার কল্পনায় ধরা দিয়াছিল, আমি আজও তা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই । মিনার আরবী শব্দ । মূল ‘নার’ হইতে উহার উৎপত্তি । নার মানে আশ্রয় । সমুদ্র উপকূলবর্তী লাইট হাউসকেই আগে মিনার বলা হইত । পরবর্তীকালে মসজিদ-

দালান-ইমারতে মিনারের প্রবর্তন হয় নির্দেশক হিসাবে। সেই জন্যই সর্ব অবস্থায় আকাশচুম্বিতাই মিনারের বৈশিষ্ট্য। শহীদ মিনারেই সর্বপ্রথম মিনারের এই বৈশিষ্ট্য বর্জিত হইয়াছে।

ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, নির্মাণ করা হইয়াছে যাকে স্মৃতি-স্তম্ভরূপে সে নিজেই বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়িতেছে। চারুশিল্প-জানহীন পথিকের স্বতঃই যা মনে হয় তা এইরূপ :

ওখানে বোধ হয় কোনও ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজ শুরু হইয়াছিল। টিনশেড করিবার জন্য খাম-খিলাও কিছু গাড়া হইয়াছিল। এমন সময় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তরফ হইতে ইনজাংশন জারি করাইয়া ফ্যাক্টরি নির্মাণের কাজ বন্ধ করা হইয়াছে। পার্মানেন্ট ইনজাংশন নিশ্চয়ই। নইলে ত্রুতকাল পড়িয়া থাকিবে কেন? খাম-খিলাগুলি যে আজও উঠাইয়া নিতেছে না, তার কারণ বোধ হয় ফ্যাক্টরির মালিক দেউলিয়া হইয়াছেন।

এটা অঙ্ক পথিকদের ভুল ধারণা? পথিকদের মধ্যে আবার ডি. এম. সি. হাসপাতালের আউট প্যাশেন্টই বেশি। কাজেই ওদের মতামতের মূল্যই বা কত!

### গোড়ায় গলদ

কিন্তু ঐ চত্বরটিকে শহীদ মিনার জানিয়া যারা দেখিতে এবং শহীদদের প্রতি প্রীতি-শ্রদ্ধা জানাইতে যায়, তারা কি দেখে? সরকার শহীদ মিনারের জন্য যে তিন লাখ টাকা খরচ করিয়াছেন তা অপব্যয়িত হইয়াছে শুধু ডিযাইনার আর্কিটেক্টের দোষে।

এইসব শিল্পী কার পরামর্শে জানি না, একটা ফাণ্ডামেন্টাল ভুল করিয়াছেন। তাঁরা চারুশিল্পের কাছে বিরাটত্ব, বিউটির কাছে ম্যাজেস্টি, ফাইননেসের কাছে গ্র্যাণ্ডার স্যক্রিফাইস করিয়াছেন। যে কাজে প্রয়োজন ছিল গ্র্যাণ্ড আর্টের, সে কাজে প্রয়োগ করিয়াছেন এঁরা



## আমার স্বপ্নের শহীদ মিনার

ফাইন আর্ট। স্থপতির হাতুড়ি-বাটালির কাজে লাগাইয়াছেন এঁর। চিত্র-শিল্পীর তুলি।

এটা আর্টের অপপ্রয়োগ। বেজায়গায় আর্ট প্রয়োগ করিলে তা আর আর্ট থাকে না, হইয়া পড়ে তা ডার্ট—আবর্জনা। অপপ্রয়োগে বিষ্টি পরিণত হয় আগলিনেসে। তাতে রূপ শুধু অরূপ হয় না, হয় কুরূপ। দুর্ভাগ্যবশতঃ শহীদ মিনারে ঠিক তাই ঘটিয়াছে।

আর্টের বেলায় যা, বিদ্যার বেলায়ও তাই। ঠিক একই বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে। স্থান-কাল-ভেদ না বুঝিয়া বিদ্যা-প্রীতি দেখাইতে গেলে তাতে বিদ্যার মর্যাদা হয় না, হয় অমর্যাদা। মিনারের পাদদেশে লাইব্রেরি-রিডিং রুম করার প্রস্তাবও এমনি বিদ্যা-প্রীতির অপপ্রয়োগ।

ঢাকা শহরে এত-এত জায়গা থাকিতে মিনারের তলে লাইব্রেরি-রিডিং রুম করার পরিকল্পনা যিনি করিয়াছিলেন তিনি না দেখাইয়াছেন শহীদদের সম্মান, না দিয়াছেন বিদ্যার মর্যাদা, না বুঝিয়াছেন লাইব্রেরি-রিডিং রুমের স্থান-কাল-ভেদ। ঐ পরিকল্পনা ছিল সত্যই উদ্ভট। ওটা যে কার্যে পরিণত হয় নাই, এটা সুসংবাদ। ১৯৬২ সালের পূর্ব-পাক সরকার-নিয়োজিত বোর্ড ঐ অকাজ হইতে বিরত থাকিয়া অন্ততঃ একটা ভাল কাজ করিয়াছেন।

অথচ সরকারের-দেওয়া তিন-লাখ টাকায় আমার স্বপ্নের শহীদ মিনারের কাজ প্রায় হইয়া যাইত। ঘাটতি পড়িলে জনসাধারণ সোৎসাহে সরকারী তহবিলে চাঁদা দিত। ব্যয়-বহুল ফাইন আর্টের চিকন কাজে হাত না দিয়া সম্ভা মোটা গ্র্যাণ্ড আর্টে টাকা খরচ করিলে ঐ টাকাতেই অন্ততঃ অষ্টার্লিনি মনুমেন্টের মত উচ্চ শহীদ মিনার নিমিত্ত হইয়া যাইত। মুরাল মোষাইকের অপপ্রয়োগ না করিয়া শহীদ মিনারের স্থানে-স্থানে টাকাইয়া স্থপতির বিশেষত্ব পোস্‌সেলিন নকশা করিলে 'মডার্ন' আর্ট হইত না বটে, কিন্তু তাতে আমাদের কৃষ্টি ঐতিহ্যও প্রতিবিম্বিত হইত; আর্ট মজবুতও হইত।

এটা কি এখন অসম্ভব ?

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬।

১৪—



# আমাদের ভাষা



## আমাদের বাংলা

আমাদের নিজস্ব কালচার বিকাশের ও নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই আমাদের নিজস্ব ভাষা। আমাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা, এ কথা আজ যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় দুই কারণে। এক কারণ ঐতিহাসিক। অপর কারণ রাজনৈতিক।

ঐতিহাসিক কারণ বাংলা ভাষার ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষার স্রষ্টা ও বাংলা সাহিত্যের পিতা আসলে বাংলার নবাব-বাদশারাই। সে হিসাবে বাংলা বাংগালী মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু প্রায় দুইশ' বছরের ইংরাজ শাসনে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সে পরিবর্তন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে যেমন উন্নত করিয়াছে, তেমনি মুসলমানদের নিকট হইতে অনেক—অনেক দূরে নিয়াও গিয়াছে। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা একটি আধুনিক উন্নতিশীল ভাষা হইয়াছে।

অন্যান্য আধুনিক ভাষার মত বাংলাও জীবন্ত ও প্রাণবন্ত ভাষা। কাজেই অনবরত তার প্রসার বৃদ্ধি ও পরিবর্তন ঘটিতেছে এবং ঘটিতে থাকিবে।

উনিশ শতকের গোড়া হইতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা ভাষা ছিল পণ্ডিতী ভাষা। উনিশ শতকের শেষদিক হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর দ্বিজেনঠাকুর ও রবিঠাকুরের শক্তিশালী কলমের জোরে ভদ্রলোকের পণ্ডিতী বাংলা জনগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইবার চেষ্টা করে। এমন কি স্বয়ং বংকিমচন্দ্রের লেখাতেও এ চেষ্টা প্রতিফলিত হয়। বংকিমচন্দ্রের প্রথম জীবনের 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা এবং শেষ দিককার 'দেবী চৌধুরানী'র ভাষার পার্থক্যই এর প্রমাণ।

## পশ্চিম বাংলার বাংলা

যা হউক দ্বিজেনঠাকুর রবিঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভাষা হইতে পারিমা-ছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরাও এবং তাদের ভাষাও যে জনগণের ভাষা, এ সত্য হয়ত ঐ মনীষীদের নিকট ধরাই পড়ে নাই।

তারপর নযরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিম্না ধুমকেতুর মত বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আকাশে উদিত হন এবং মুসলিম-বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার সফল চেষ্টা করেন। নযরুলের এই চেষ্টার যে বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হইতে, তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার কালচারের পার্থক্যও তাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বাংলা ভাগ হইয়া দুই দেশ না হইলে অতঃপর বাংলা ভাষা কি রূপ নিত, আজ সে আলোচনা করিমা লাভ নাই।

কিন্তু তার ইশারা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

## বিপ্লবী পরিবর্তন

রাজনৈতিক কারণ একেবারে আধুনিক। আজ বাংলা ভাগ হইয়াছে। এক বাংলা দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ নিয়াছে। এতে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার কি পরিবর্তন হইয়াছে, এইটাই আমাদের ভাল করিমা বিচার করিতে হইবে। এ বিচার সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে করিতে গেলে আমাদের আগে বিবেচনা করিতে হইবে দুইটা কথা :

এক, বাংলা ভাগ হওয়ার আগেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-বাংলার ভাষা ও হিন্দু-বাংলার ভাষায় একটা পার্থক্য ছিল। মুসলমান লেখকরা সামাজিক ও সাহিত্যিক প্রয়োজনের খাতিরে প্রচলিত বহু-সংখ্যক মুসলমানী শব্দ সাহিত্যে চালু করিমাছিলেন। হিন্দু লেখকরা তা মানিমা লন নাই।

## আমাদের ভাষা

দুই, বাটোয়ারার আগে বাংলার রাজধানী সুতরাং সাহিত্যিক কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখন সে জায়গা দখল করিয়াছে ঢাকা।

### পরিবর্তনের তাৎপর্য

এই দুইটা কথার তাৎপর্য আমাদের বুদ্ধিতে হইবে। অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলতঃ এবং প্রধানতঃ হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সাহিত্যে গোটা-কতক মুসলমানী শব্দ ঢুকাইয়া দিলেই তা মুসলিম কালচারের বাহক সাহিত্য হইয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাল-ভাল বই-এর হিন্দু চরিত্রগুলির জায়গায় মুসলমান নাম বসাইয়া দিলেই ওগুলি মুসলিম চরিত্র হইয়া যাইবে না। তাতে মুসলিম-সাহিত্যও হইবে না। বরং রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি-প্রতিভার তাতে অপমানই করা হইবে।

পক্ষান্তরে 'বাংগাল' বা 'মুসলমান' বলিয়া নিজেদের বাপ-দাদার আমলের মুখের লক্ষ্মণগুলি বাদ দিলেই আমরা 'আধুনিক' ও 'প্রগতি-শীল' হইয়া যাইব না। গোশতের বদলে 'মাংস', আণ্ডার বদলে 'ডিম', জ্ঞাবের বদলে 'সুধী', আরয়ের বদলে 'নিবেদন', তসলিমবাদ-এর বদলে 'সবিনয়', দাওয়াত-নামার বদলে 'নিমন্ত্রণ-পত্র', শাদি-মোবারকের বদলে 'শুভ বিবাহ' ব্যবহার করিলেই আমরা 'সভ্য' 'কৃষ্টিবান' ও 'সুধী বিদগ্ধ' হইলাম, নইলে হইলাম না, এমন ধারণা হীনমন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টিক চেতনা ও রেনেসাঁর জন্য এটা অশুভ ইংগিত। আমাদের তরুণ 'প্রগতি'-বাদীদের মধ্যে ইদানীং এই বাতিক খুব জোরসে দেখা দিয়াছে। এটা আশংকার কথা।

আমি বলি না যে, গোশতের বদলে 'মাংস' আণ্ডার বদলে 'ডিম' এমন কি পানির বদলে 'জল' বলা চলিবে না। বরঞ্চ আমার মত এই যে, এইগুলি সমার্থ-বোধক বাংলা প্রতিশব্দ। সাহিত্যে উভয়

শব্দই ব্যবহার করা হইবে প্রয়োজনমত। কিন্তু এর একটা 'ছাড়িয়া' আরেকটা 'ধরিতে' যাওয়াতেই আমার যত আপত্তি। পাক-বাংলার বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় ভাষা-বিজ্ঞানের যে কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে, সে-সব কথা আমি একটু পরে বলিতেছি। এখানে শুধু সেই গঠন-রূপায়ণের কৃত্তিক বুনিন্মাদ সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিব।

প্রথমতঃ 'ছাড়া' 'ধরার' মধ্যে একটা হীনমন্যতা ও পরাজিতের মনোভাব লুকাইয়া আছে। উপরের শব্দ-জোড়াগুলির মধ্যে একটা আরেকটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ একথাও যেমন বলা যায় না, একটা মুসলমানের অপরাটা হিন্দুর একথাও বলা যায় না। আসলে কোনও শব্দেরই ধর্মীয় কোনও রূপ নাই। উপরের শব্দগুলির ত নাই-ই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'গোশত' 'আশা' ও 'পানি' এই তিনটা শব্দের কথাই ধরা যাক। এর একটাও আরবী নয়, ইসলামীও নয়। জোড়ার প্রতিশব্দগুলিও তেমনি ইসলাম-বিরোধী বা হিন্দুয়ানীও নয়।

### শব্দের কৃত্তিক ইমেজ

তথাপি বাংলাদেশে এইসব শব্দের কৃত্তিক রূপ বা ইমেজ আছে। সব ভাষাতেই অনেক শব্দের, এমন কি বেশির ভাগ শব্দেরই, এক-একটা ইমেজ থাকে। সে-সব শব্দের সাথে কালচারের অন্তর্নিহিত গভীর ও ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। তেমনি আমাদের বিচার্য তিনটি শব্দের জোড়ার মধ্যেও কালচারের ইমেজ আছে। তার ফলে গোশত আশা ও পানির মধ্যে 'ইসলামত্ব' নাই বটে, কিন্তু 'মুসলমানত্ব' আছে। অর্থাৎ জোড়ার এক কাতারের শব্দগুলি এক কালচারের লোকেরা অর্থাৎ হিন্দুরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। জোড়ার অপর কাতারের শব্দগুলি অপর কালচারের লোকেরা অর্থাৎ মুসলমানেরা বহু যুগ ধরিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। বহু যুগের ব্যবহারে শব্দগুলি তাই এক-একটা কালচারের আইডেনটিটি



বা কৃষ্টিক শেনাখ্তি পাইয়া গিয়াছে। সোজা কথায় একটা হিন্দুর মুখের কথা অপরটা মুসলমানের মুখের কথা, এই তাদের পরিচয়। সুতরাং আমরা যদি 'পানি' 'ছাড়িয়া' 'জল' 'ধরি' তবে আমরা ধর্মচ্যুত হইব না সত্য কিন্তু ঐতিহ্যচ্যুত হইব নিশ্চয়ই। এর পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী হইবে। সমাজ-বিজ্ঞানের ছাত্ররা তা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ ঐ-সব 'মুসলমানী' শব্দ এবং ঐ ধরনের আরও অনেক শব্দ এক দিক হইতে হিন্দুদের মুখের ভাষার চেয়ে সত্য-সত্যই শ্রেষ্ঠ বাংলা। এই শ্রেষ্ঠত্ব বোধগম্যতার ভাষিক প্রয়োজন ও প্রসারতার জাতীয় প্রয়োজন উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। সে প্রয়োজনীয়তা পাকিস্তান হওয়ার আগেও ছিল। এখন আরও বাড়িয়াছে।

### আমাদের ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব

'শোশত' 'আপ্তা' ও 'পানি' ইত্যাদি 'মুসলমানী' বাংলা শব্দগুলি বাংলার বাইরের গোটা পাক-ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বুঝে, ব্যবহারও করে। ঐ তিনটি শব্দ এবং চাচা-চাচী ফুফা-ফুফু খালু-খালা ইত্যাদি সম্বন্ধবাচক, লহ রগ রেশা নাশতা বদনা ইত্যাদি হাজারো বস্তু-বাচক শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। এই বিচারে পাক-বাংলার মুসলমানের মুখের বাংলাকে একরূপ নিখিল পাক-ভারতের ভাষা বলা যাইতে পারে। উনিশশ' তেতাল্লিশ সালে কলিকাতার এক সাহিত্য-সভার ভাষণে আমি হিন্দু সাহিত্যিক বন্ধুদের মুসলমানদের মুখের বাংলাকে সাহিত্যে বর্জন না করিয়া বরঞ্চ উহাকে স্ট্যাণ্ডার্ড বাংলা ভাষা রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের বাংলা হিন্দুর মুখের বাংলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমি দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। মুসলমান বাংগালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল এইরূপ : 'ফযরের আউয়াল ওয়াকতে উস্তিয়া

ফুফু-আশমা চাচীজীকে कहিলেন : আমাকে জলদি এক বদনা পানি দাও । আমি পায়খানা ফিরিয়া গোসল করিয়া নমাজ পড়িয়া নাশতা খাইব ।’ হিন্দু বাংগালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল এইরূপ : ‘অতি ভোর বেলা উঠিয়া পিসিমা খুড়া মশায়কে বলিলেন : আমাকে শীগ্গির এক গাড়ু জল দাও । আমি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া চ্যান করার পর সন্ধ্যা করিয়া মাধাম্নি খাইব ।’

আমি বলিয়াছিলাম, মুসলমানের মুখের ঐ বাংলা ভাষা বিহার হইতে পেশওয়ার এবং অযোধ্যা হইতে কুমারিকা পর্যন্ত জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকল ভারতবাসী বুঝিবে । পঞ্চাশতের হিন্দুর মুখের ঐ বাংলা বাংলাদেশের বাইরের হিন্দুরাও বুঝিবে না, অন্যরা পরের কথা ।

আমি জোরের সাথেই বলিতে পারি আমার পচিশ বছরের আগের ঐ কথা আজও তেমনি সত্য রহিয়াছে । পাক-বাংলার তরুণরা আত্মসম্মানী হইলে চিরকাল তা সত্য থাকিবে ।

### ভাষা সমস্তার অপূর দিক

তৃতীয়তঃ এর আরেকটা দিক আছে । পাকিস্তান হওয়ার পর আমাদের জাতীয় কর্তব্য দাঁড়াইয়াছে দুইটি । এক, পাক-বাংলায় পাকিস্তানী নেশন গড়া । দুই, পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যথা-সম্ভব সাদৃশ্য আনয়ন করা । প্রায় পঞ্চাশ লাখ ভারতীয় মুসলমান মোহাজের পাক-বাংলার—স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছে । কালক্রমে ভাষিক ও কৃষ্টিক সমাজ জীবনে এরা আমাদের মধ্যে মিশিয়া যাইবে । আমাদের ভাষিক ঐতিহ্য এ কাজ সহজ করিবে । কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঐতিহ্য ‘ছাড়িয়া’ শান্তিনিকেতনী ঐতিহ্য ‘ধরিতে’ যাই তবে আমরা পাক-বাংলার জাতীয়তা গঠনের কাজেই বাধা জন্মাইব ।

চতুর্থতঃ পাক-জাতীয়তার সংহতির কথা । আমরা বাংলাকে আমাদের রাষ্ট্রভাষা করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষিক ও কৃষ্টিক

স্বকীয়তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু বাংলা ভাষাকে মুসলিম-ঐতিহ্যহীন শান্তিনিকেতনী উৎকলী বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভাষিক ব্যবধান আরও না বাড়াই, সেদিকে আমাদের সচেতন থাকিতে হইবে। আমাদের আধুনিক প্রগতিবাদীরা আমাদের ভাষাকে 'স্নাতকোত্তর, করাইয়া যে গতিকে প্রগতির দিকে নিতেছেন, তাতে আমরা পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের নৈকট্য লাভ করিতেছি সত্য, কিন্তু অবাংলা পূর্ব-পাকিস্তানীদের নিকট হইতে আমরা বহুদূরে সরিয়া যাইতেছি।

### রাজধানীর পরিবর্তন

তারপর ধরুন রাজধানী পরিবর্তনের কথা। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকেন্দ্র ছিল যেমন কলিকাতা, পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য-কেন্দ্র হইবে তেমনি ঢাকা। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথা ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথা ভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই। তাতে ভুল পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিল না। জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-বাংলার জিলাসমূহের কথা ভাষার মিশ্রণে ও সমন্বয়ে যেমন একটি 'কোলকাতায়' কথা ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কলিকাতার কথা ভাষা পশ্চিম-বাংলার তথা গোটা বাংলার সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল, পূর্ব-বাংলার সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় তেমনি ঢাকায় পূর্ব-বাংলার বিভিন্ন জিলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি 'ঢাকাইয়া' কথা বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের ভাষা

হইবে। পশ্চিম-বাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়ালেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুত্রী ডায়ালেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইয়াছিল, আমাদের বিক্রমপুরী ডায়ালেক্টও তেমনি ঢাকাইয়া বাংলার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।

### আমাদের দুইটি কাজ

আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা-নায়ক হিসাবে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের তাই করিতে হইবে দুইটি কাজ। প্রথমতঃ পূর্ব-বাংলার প্রাচীন সভ্য মানুষের নয়া রাষ্ট্র ও নয়া জাতি গঠনে সাহায্য করার জন্য তাদের নয়া মিন্দগির ও নয়া কালচারের ধারক ও বাহক নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেই সাহিত্যের মিডিয়াম রূপে পূর্ব-পাকিস্তানের সমস্ত অঞ্চলের বোধগম্য ও ব্যবহারোপযোগী একটি ঢাকাইয়া কথা বাংলা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এ উভয় কাজ চলিবে স্বভাবতঃই এক সাথে।

এ কাজটি খুবই সোজা, আবার খুবই কঠিন। সোজা এই জন্য যে, এ কাজের নঘির আছে। পশ্চিম-বাংলার সাহিত্যিকরা যেমন পশ্চিম-বাংলার মধ্যবিন্দু শ্রেণীর সাধারণ কথা ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করিয়াছেন, আমরাও যদি তেমনি পূর্ব-পাকিস্তানী মধ্যবিন্দুর সাধারণ কথা ভাষাকেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিতে পারি, তবেই আমাদের কাজ সারা হইল। মধ্যবিন্দুর ভাষা মানে শিক্ষিত সমাজের সফিসটিকেটেড উচ্চারণ-ভংগি। কথা ভাষাকে দেশের সর্বত্র জনগণের বোধগম্য করার জন্যই এটা দরকার।

পক্ষান্তরে এই কাজটিই কঠিন এই জন্য যে, সাহিত্যিকরাও সাধারণ মানুষের মতই অভ্যাসের দাস। এঁরাও অনুকরণে গৌরব বোধ করেন। এঁরাও হীনমন্যতার ব্যারামে ভুগিতেছেন। কথাটা একটু খোলাখুলিই বলা যাক। বাংলাদেশ অঞ্চল থাকিতে কলিকাতা রাজ-

ধানী থাকাকালে আমরা কথায় ও লেখায় পশ্চিম-বাংলার ভালমন্দ সবই অনুকরণ করিতাম। এটা ছিল স্বাভাবিক। এই কারণে তত-দিন আমরা 'খাইছি'র বদলে 'খেয়েছি' খাইতেছি'র বদলে 'খাচ্ছি' 'করি নাই'র বদলে 'করি নি' লিখিতাম এবং বলিবার চেষ্টা করিতাম। তার উপর ক্রিয়াপদ ছাড়াও বিশেষ্যের বেলাতে তা করিতে গিয়া 'ইচ্ছা'র বদলে 'ইচ্ছে' 'হিসাবে'র বদলে 'হিসেব', 'নিকাশে'র স্থলে 'নিকেশ' 'মিঠা'র জায়গায় 'মিঠে', 'তুলো'র জায়গায় 'তুলো', 'সূতা'র জায়গায় 'সূতো' লিখিতাম ও বলিবার চেষ্টা করিতাম।

এটা তখন দোষের ছিল না। কিন্তু এখন দোষের। লজ্জা ও পরি-  
তাপের বিষয় এই যে, আজো আমরা তাই করি। আমরা ডুলিয়া  
যাই যে, যে-স্বাভাবিকতা সাহিত্যের প্রাণ, আমাদের এই বিবেক-বুদ্ধিহীন  
অন্ধ অনুকরণ-প্রিয়তা সেই স্বাভাবিকতাকেই বিদূষিত করিয়া থাকে।  
রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের তখনকার ভাষা ছিল কলিকাতার বাংলা।  
সেই কারণেই এখনকার ভাষা আমাদের ঢাকাইয়া বাংলা।

### ঢাকাইয়া বাংলা

পশ্চিম ও পূর্ব-বাংলার কথা ভাষার পার্থক্যের অনেকখানিই  
ক্রিয়াপদে সীমাবদ্ধ। তবে ক্রিয়াপদ ছাড়াও অনেক বিশেষ্য প্রভৃতি  
পদেও আঞ্চলিক পার্থক্য আছে। আবার মুসলমানী শব্দ ছাড়াও নিছক  
দেশী শব্দেও বেশ কিছু পার্থক্য বিদ্যমান। উচ্চারণেই সে পার্থক্য  
বেশী প্রকট। 'তুলো' 'ইচ্ছে' প্রভৃতি শব্দের কথা আগেই কহিয়াছি।  
এগুলি একান্তই উচ্চারণ-বিকৃতি এবং স্থানিক। এগুলির অনুকরণ  
শুধু অনাবশ্যক নয়, অবৈজ্ঞানিকও। পশ্চিম-বাংলার যে-সব ভাই  
হিজরত করিয়া পূর্ব-পাকিস্তানে আসিয়াছেন, তাঁরা এক পুরুষ বা  
আরও কিছুকাল এই বিকৃত উচ্চারণ করিয়া যাইবেন। কিন্তু তাই  
বলিয়া আমরা বাংগালরাও তাঁদের অনুকরণ করিয়া শব্দ বিকৃত করিব,  
এর কোন মানে নাই। সুতরাং আমাদের সাহিত্যকে স্বাভাবিক ও

আমাদের জনগণের সাহিত্য করিতে হইলে জনগণের স্বাভাবিক ভাষায় লিখিতে হইবে। স্বাভাবিক ভাষা কি, কিভাবে তা গঠিত হইবে, কি তার রূপ হইবে, এসব কথার নিভুল বিচার করিতে গেলে আমাদের এই কয়টা কথা মনে রাখিতে হইবে :

(১) ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভাব কলিকাতার বদলে এখন ঢাকা হইতে হইবে।

(২) পদ্মার পশ্চিম পারের আমাদের যে-সব জিলা এতদিন রাষ্ট্রীয় কারণে নিজেদের 'বাংলা' হইতে স্বতন্ত্র ভাবিত, 'অধিকতর উন্নত' পশ্চিম-বাংলার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া গৌরব বোধ করিত এবং প্রেরণার জন্য স্বভাবতঃই কলিকাতার দিকে চাহিয়া থাকিত, তারা এখন ঢাকার দিকে নবর দিনে শুরু করিয়াছে স্বাভাবিক কারণেই।

(৩) প্রায় চল্লিশ লাখের মত পশ্চিম-বাংলায় মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। সমাজ সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থান দখল করিয়া আছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথ্য ভাষায়, সূত্রাং সাহিত্যে, এঁদের প্রভাবের ছাপ থাকিবেই।

(৪) কথা ভাষার দিক হইতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক বাংলার মধ্যে যে প্রকট পার্থক্য দেখা যায়, তার বেশীর ভাগই উচ্চারণে সীমাবদ্ধ।

(৫) প্রায় দশ লাখের মত উর্দু-ভাষী অবাংলায় পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাসিন্দা বনিয়া গিয়াছেন। তাঁদেরও প্রভাব আমাদের কথ্য ভাষায় পড়িবে।

(৬) রাজধানী ঢাকায় বাটোয়ারার আগের মুদতে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মত বাংলা-ভাষী কোন প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।

(৭) ঢাকা শহরে বাটোয়ারার প্রাক্কালের যুগের বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-বাংলাবাসী প্রভাবশালী কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল না।

## আমাদের ভাষা

সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যেমন হইবে স্বাভাবিক কথ্য ভাষা তেমনই সেটা হইবে উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের সৃষ্টি ও হরেক ভাষার সংমিশ্রণের ফল এক নয়া ভাষা। সে ভাষার সৃষ্টিকার্য ইতিমধ্যেই শুরু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধু আমাদের সাহিত্যিকদের নযরই সে বিপুল নির্মাণ-কার্য আজো ধরা পড়ে নাই।

### ফর্মেটিভ স্তর

অথচ সাহিত্যিকদেরই কাজ এই সৃষ্টি-কার্যে এই গ্রোথে সকল শক্তি ও মনীষা দিয়া সাহায্য করা। আমাদের পাড়াগাঁয়ে প্রচলিত হাজার-হাজার শব্দ অবহেলিত এবং অজ্ঞাত অবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সব শব্দ আমাদের সাহিত্যের সম্পদ হইতে পারে। এই সমস্ত শব্দের সংযোগে আমাদের ভাষা হইবে সম্পদশালী। তার গতি হইবে চঞ্চল ও বেগবান। তার প্রাণ-শক্তি হইবে প্রচুর। জীবন্ত ভাষার গ্রোথ ও প্রসারের শেষ নাই। শুনা যায়, গত পঞ্চাশ বছরে ইংরাজী ভাষায় প্রায় পঁচিশ হাজার নতুন শব্দ প্রবেশ করিয়াছে। ইংরেজ লেখক ও সাহিত্যিকরা দুই বাহু মেলাইয়া ঐসব শব্দ নিজের ভাষায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী ভাষার এই ইলাস্ট্রিসিটি এই প্রসারণ-ক্ষমতা আছে বলিয়াই ইংরাজের সাম্রাজ্যের অবসান হওয়ার পরেও দুনিয়ায় ইংরেজী ভাষার সাম্রাজ্য একটুকুও সংকীর্ণ হয় নাই।

আমাদের নয়া ভাষা গঠনে অমনি উদার বাস্তববাদী হইতে হইবে আমাদের। আমি আগেই বলিয়াছি আমাদের রাজধানী তথা অন্যান্য শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাংগালী ভদ্রলোকের কথা ভাষাই হইবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। তাঁর তাঁদের আফিসে-আদালতে, ক্লাবে-বৈঠকখানায় ক্ষুদ্রে-কলেজে যে ভাষায় কথা কন, যে-সব শব্দ ও ক্রিয়াপদ যে স্বর-ভংগিতে যে বাক-প্রণালীতে ব্যবহার করেন সেইটাই হইবে আমাদের সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা এখনও ফর্মেটিভ স্তরে। একটা মডেল বাক্য নেওয়া যাক।

কেতাবী বাংলা—তুলার বাজার এমন মহার্ঘ আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হইতেছে না। পালের অভাবে নৌকার ক্ষেপ দেওয়া যাইতেছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কিনা বন্ধ। কুমারদের তাতে বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। দুই মুঠা ভাতের জন্য তারা পৈল্লিক জীবিকা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। তবে ভিক্ষা করিয়া খাইবার ইচ্ছা তাদের নাই। স্ত্রী-পুত্রকে খাওয়াইয়া-পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরিয়াছে। কাঠ কুড়াইবার উদ্দেশ্যে তারা কুড়াল-হাতে নদী পার হইয়া সুন্দরবনে যায় খুব সকাল বেলা। সারাদিন পরে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে।

পশ্চিম বাংলার বাংলা—তুলোর বাজার এমন মাগ্গি আর দেখি নি। তুলোর অভাবে সূতার কলগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হচ্ছে না। পাল ছাড়া নৌকার ক্ষেপ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে হাঁড়ি-পাতিল বেচা-কেনা বন্ধ। কুমোরদের তাতে বড় অসুবিধে হয়েছে। দুমুঠো ভাতের আশায় তারা পৈল্লিক ব্যবসা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষে করে খাবার ইচ্ছে তাদের নেই। মাগ-ছেলেকে ঞাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তারা লাকড়ির ব্যবসা ধরেছে। কাঠ কুড়োবার উদ্দেশ্যে তারা কুড়াল-হাতে নদী পেরিয়ে সুন্দরবনে যায় খুব সকালে। সারাদিন পরে বিকেল-সন্ধ্যায় কাঠ নিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

পূর্ব-বাংলার বাংলা—তুলার বাজার এমন মংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে সূতার কলগুলি বন্ধ হইয়া গেছে। সূতার অভাবে পাল বোনা হইতেছে না। পাল ছাড়া নৌকার ক্ষেপ দেওয়া যাইতেছে না। ফলে হাড়ি-পাতিল বেচা-কিনা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হইছে। দুই মুঠা ভাতের আশায় তারা খাম্বানী পেশা খনে বার হইয়া আসছে। তবে ভিক্ষা কৈরা খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরুর-কবিলানে খাওয়া-পরা-মা বাঁচা-মা রাখবার লাগি তারা লাকড়ির ব্যবসা ধনছে।



কাঠ কুড়া'বার মতভাবে তারা নদী পার হৈয়া সুন্দরবনে যায় খুব সকালে। সারাদিন পরে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ গৈয়া ঘরে ফি'রা আসে।

### ক্রিয়াপদে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব

এই মডেল বাক্যটিতে আপনারা লক্ষ্য করিবেন 'তুলা' 'সূতা' 'নৌকা' 'মুঠা' 'দেওয়ান' 'অসুবিধা' 'কুড়াইবার' 'বিকাল' 'সন্ধ্যা' 'ইচ্ছা' 'কুড়াল' 'গুলি' 'নাই' ইত্যাদি শব্দগুলির ব্যাপারে কেতাবী বাংলা ও পূর্ব-বাংলার বাংলার মধ্যে হুবহু মিল আছে। পশ্চিম-বাংলা এখানে অনর্থক শব্দগুলিকে বিকৃত করিয়াছে। সুতরাং এই শব্দগুলির বেলায় এবং অনুরূপ আরও অনেক শব্দের বেলায় পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত ভাষা অধিকতর 'সাদু' সত্য ও সাহিত্যে গ্রহণযোগ্য। এ-সব শব্দের ব্যবহারে পশ্চিম-বাংলার অনুকরণ করা অর্থহীন নকল-নবিসি মাত্র।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়াছে ক্রিয়াপদ নিয়া। 'ছাইড়া' ও 'ছেড়ে', 'হৈয়া', ও 'হয়ে', 'খাইছি' ও 'খেয়েছি', ও 'খাইতেছি' 'খাচ্ছি' ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ও অনুরূপ হাজারো ক্রিয়াপদের কোনটা লেখায় ইস্তেমালা করিব, সেটা ঠিক করা বাস্তবিকই কঠিন কাজ। কারণ শুধু 'হৈয়া' 'কৈরা'ই পূর্ব-পাকিস্তানের শব্দ, 'হয়ে' 'করে' পূর্ব-পাকিস্তানের শব্দ নয়, এ কথা কওয়া চলে না। পদ্মার পশ্চিম পারের, বিশেষতঃ খুলনা যশোর ও কুষ্টিয়ার, লোকেরা ঐ-সব ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথা ভাষায় এঁদের প্রভাব ও প্রাক-পাকিস্তানী বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য এই দুই-এর সমন্বয় আমাদের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের কথা ভাষায় যে শক্ত মোচড় দিতেছে এবং আরও দিবে, তাতে সন্দেহ নাই। তাতে আমাদের কথা ভাষা, সুতরাং সাহিত্যের ভাষা, যে একটা খিচুড়ি হইবে, তাতেও সন্দেহ নাই। আপত্তি থাকিবার কারণও নাই। শুধু সেটা জগা-খিচুড়ি না হইলেই হইল। সে ভাষা নিশ্চয়ই জগা-খিচুড়ি না হইয়া বরঞ্চ ডুনি-খিচুড়ি হইবে যদি আমরা নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করি :

জগা বনাম জুনি খিচুড়ি

(১) ভাষায় নতুন জটিলতার আমদানি না করা, যথা :

‘করিতেছি’ অর্থে ‘করতেছি’ না বলিয়া ‘করছি’ বা ‘কচ্ছি’ বলা, ‘দেখিতেছি’ অর্থে ‘দেখতেছি’ না বলিয়া ‘দেখছি’ বলা, ‘বলিতেছি’ অর্থে ‘বলতেছি’ না বলিয়া ‘বলছি’ বলা ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে ভাষায় অনাবশ্যক জটিলতা বাড়িতেছে। কারণ ‘করছি’ ‘দেখছি’ পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ জিলায় ‘সম্পন্ন বর্তমান কালে’র ক্রিয়া বুঝায় অর্থাৎ কাজগুলি হইয়া গিয়াছে। যদিও ঐ প্রকার ব্যবহারে পশ্চিম বাংলায় শব্দের প্রথম হরফে এবং পূর্ব-বাংলায় শেষ হরফে জোর বা এক্সল্ট্ দেওয়া হয়, তবু ওধু এ এক্সল্টের পার্থক্য দিয়া পূর্ব-বাংলার জনগণকে অর্থের পার্থক্য বুঝান যাইবে না। সে চেষ্টাও অনাবশ্যক। কারণ পূর্ব-বাংলার প্রচলিত ‘করতেছি’ ‘দেখতেছি’ শব্দগুলি পশ্চিম-বাংলার লোকেরাও বলিতে ও বুঝিতে পারে।

(২) বিভিন্ন আঞ্চলিক উচ্চারণকে হুবহু ভাষায় ফুটাইবার চেষ্টা না করা, যথা :

শুনাকে ‘শোনা’, ‘ইচ্ছকে ‘ইচ্ছে’, করবেনকে ‘কোরবেন’। করবকে ‘কোরবো’, হনকে ‘হলো’, দেইকে ‘দি’, নাইকে ‘নি’, করতেকে ‘কত্তে’, পারতেকে ‘পাত্তে’, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও বলিবার সময় আমরা অনেকেই ঐ রকমই উচ্চারণ করিয়া থাকি, তবু বানানের সময় ঐ উচ্চারণকে হরফে ফুটাইয়া তুলিবার দরকার নাই। ওটা উচ্চারণের উপরই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যেমন ধরুন কোন-কোন অঞ্চলের লোক লেখে ‘প্রথম’ ‘প্রস্তাব’, কিন্তু বলিবার সময় বলে ‘পেরথম’ ‘পেরেস্তাব’ ইত্যাদি। এইভাবে উচ্চারণের ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া নিলে আমরা ‘করব’ লিখিয়াও ‘করবো’ বা ‘কোরবো’ ‘করে’ লিখিয়াও ‘কোরে’ বা ‘কৈরা’, ‘হয়ে’ লিখিয়াও ‘হোয়ে’ বা ‘হৈয়া’ উচ্চারণ করিতে পারিব এবং জটিলতা এড়াইয়াও আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ কথা ভাষা সৃষ্টি করিতে পারিব।

(৩) পশ্চিম-বাংলার অনুকরণে ‘ইয়া’ মূল ক্রিয়াপদকে অতি-  
রিঙা মোচড়াইবার চেষ্টা না করা যথাঃ

সরাইয়া স্থলে ‘সরায়ে’র বদলে ‘সরিয়ে’, পরাইয়া স্থলে ‘পরায়ের’  
বদলে ‘পরিয়ে’, পড়াইয়া স্থলে ‘পড়ায়ের’ বদলে ‘পড়িয়ে’, বেড়াইয়া  
স্থলে ‘বেড়ায়ের’ বদলে ‘বেড়িয়ে’, বাহির হইয়া স্থলে ‘বার হয়ের’  
বদলে ‘বেরিয়ে’, পার হইয়া স্থলে ‘পার হয়ের’ বদলে ‘পেরিয়ে,  
ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব বিকৃতিতে ক্রিয়া পদকে অনাবশ্যকভাবে  
মূল ধাতু হইতে এতদূরে সরাইয়া দেওয়া হয় যে, চিনিবার উপায়  
থাকে না।

পক্ষান্তরে উক্ত ‘সরায়ে’ ‘পড়ায়ের’ ‘বেড়ায়ের’ ‘খাওয়ায়ের’ ‘পরায়ের’  
বলিলে পূর্ব-ও পশ্চিম-বাংলার কথ্য ভাষার মধ্যে একটু সুন্দর আপোস-  
রক্ষা হয়। অবশ্য পূর্ব-বাংলায় ‘সরায়ে’ ‘বাড়ায়ের’ ইত্যাদি বলা  
হয় না। এখানে ‘সরাইয়া’ ‘বাড়াইয়া’ ইত্যাদি কেশাবী শব্দই  
উচ্চারণ করা হয়, শুধু হ্রস্ব ‘ই’ কে আরও একটু খাট করা হয়  
মাত্র। যেমন সরাইয়া বাড়ায় ইত্যাদি। শেষের ‘য়া’কে এখানে ‘য়ে’  
করা হয় না। তবে পূর্ব- ও পশ্চিম-বাংলা-ভাষাভাষীদের নয়া মিশ্রণে  
পূর্ব-পাকিস্তানে যে নয়া যবান গড়িয়া উঠিবে, তাতে পূর্ব- ও পশ্চিম-  
বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের এই ভাষিক আপোস আমাদের ভাষার  
উন্নতি বিধান করিবে বলিয়াই মনে হয়।

### আপোস কল্পনা

এই আপোস-ফরমুলা গ্রহণ করিলে উপরের ঐ মডেল বাক্যাটি  
এইরূপ ধারণ করিবে :

তুলার বাজার এমন মংগা আর দেখি নাই। তুলার অভাবে  
সুতার কলগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। সুতার অভাবে পাল বোনা হচ্ছে  
না। পাল ছাড়া নৌকায় ফ্রেপ দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে হাঁড়ি-  
পাতিল বেচা-কেনা বন্ধ। কুমারদের তাতে খুবই অসুবিধা হয়েছে।

দু'মুঠা ভাতের আশায় তারা খান্দানী পেশা খনে বার হয়ে এসেছে। তবে ভিক্ষা করে খাবার ইচ্ছা তাদের নাই। জরুরু-কবিলারে খাওয়ান্নে-পরান্নে বাঁচান্নে রাখবার জন্য তারা লাকড়ির পেশা ধরেছে। কাঠ কুড়ান্নে মতলবে তারা কুড়াল-হাতে নদী পার হয়ে সুন্দর বনে যায় খুব সকালে। সারাদিন বাদে বিকাল-সন্ধ্যায় কাঠ নিয়া ঘরে ফিরে আসে।

বলা বাহুল্য উপরের মডেল বাক্যটি আমার সাজেসশান মাত্র। এ সাজেসশানের আসল মতলব এই যে, সাধারণ শব্দই হউক আর ক্রিয়া পদই হউক কথা বলিবার সময় শিক্ষিত বক্তার মুখে সহজে বিনা-চেচটায় বিনা-কৃত্রিমতায় আপনা-আপনি যা আসিন্না পড়ে তাই শুদ্ধ ভাষা। বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে যা সত্য, পশ্চিম-বাংলার ক্রিয়াপদ সম্বন্ধেও অবিকল তাই সত্য। আমি অনেক শিক্ষিত লোক ও কবি-সাহিত্যিকের মুখে একই বাক্যে একবার 'খেয়েছি' আবার 'খাইছি' ইত্যাদি দুমিশালী ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখিয়াছি। এটাকে আমি দোষের মনে করি না। আমাদের মুখের কথা বাংলা বোধ হয় এই-ভাবেই তার ফর্মেটিঙ মৃদুত পার হইবে এবং হয়ত এই রূপেই স্ট্যান্ডার্ডাইজড হইবে।

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এই যে, রাজধানীর বাংলা শিক্ত সম্প্রদায় তাঁদের বৈঠকখানায় স্কুলে-কলেজে ও অফিস-আদালতে মোটামুটি এই ধরনের দুমিশালী ভাষাতেই কথা বলেন এবং চট্টগ্রাম হইতে রাজশাহী ও সিলেট হইতে খুলনা পর্যন্ত সারা পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ত-অশিক্ত-নিবিশেষে সকলে এই ভাষা বুঝেন।

### পরিভাষা-সমস্যা

আমাদের ভাষা-সমস্যার আরেক দিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমাদের সুধী সমাজের একাংশের ধারণা। আমরা জানে-বিজ্ঞানে উন্নত হইবার চেচটা করিতেছি। মাতৃভাষার মারফতে ছাত্রদেরে আশ্রয়

## আমাদের ভাষা

সকল শাখার জ্ঞান-বিজ্ঞান শিখাইবার সংকল্প নিয়াছি। তা করিতে গেলে ক্লাসে বাংলায় ঐ ঐ বিষয়ে লেকচার দিতে হইবে এবং বই-পুস্তক লিখিতে হইবে। কাজেই প্রথম উষ্ণিয়াছে আমাদের পরিভাষা সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহাই তাঁদের অভিমত। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। কিছু-কিছু পরিভাষা তাঁরা সৃষ্টিও করিয়াছেন।

আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, পরিভাষার প্রথম আসলে একটা সমস্যাই নয়। আমাদের ভাষায় ইংরাজী বা বিদেশী যে-সব শব্দ চালু হইয়া গিয়াছে, ওগুলির বাংলা প্রতিশব্দ বাহির করিবার চেষ্টা নিছক পাগলামি। এমন শব্দ কথা বলার অপরাধ আমার মাফ করিবেন আপনারা। কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন শব্দও আমি খুঁজিয়া পাই না। ‘কাগয’ ‘কলম’ ‘দোয়াত’ ইত্যাদি শব্দ আরবী এই অজুহাতে এক সময়ে হিন্দু পণ্ডিতরা এ-সব শব্দ বাংলায় ব্যবহার করিবেন না বলিয়া যিদ করিয়াছিলেন এবং পরিভাষা সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় ‘ভূর্জ-পত্র’ ‘লেখনী’ ও ‘মস্যাধার’ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আপনারা কি সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিতে চান? আপনারা কি ট্রেন স্টিমার টিকেট রেল ইউনিয়ন বোর্ড ইলেকশন ভোট প্রেসি-ডেন্ট মেম্বর জজ কোর্ট ম্যাজিস্ট্রেট ইত্যাদি শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিতে চান? নিশ্চয়ই চান না! তবে আবার পরিভাষা কি? যা আমাদের ভাষায় চলিয়া গিয়াছে, যে-সব শব্দ আমরা দিনরাত নিজেদের কথাবার্তায় ব্যবহার করি বুঝি এবং বুঝাই, সে সবই বাংলা শব্দ। একটি দৃষ্টান্ত দেই :

‘আগামী মার্চ মাসে আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের জেনারেল ইলেক-শন হইবে। আমার বাবা প্রেসিডেন্টের ক্যানডিডেট হইয়াছেন। কাজেই ভোটারদের ক্যানভাস করিতে আমাকে কয়েকটা মিটিং করিতে হইবে। সেজন্য আমি কুলে কয়েক দিনের ছুটি চাহিন্মা হেডমাস্টারের নিকট এপ্লাই করিয়াছি।’

এটা কি বাংলা ভাষা না? পূর্ব-পাকিস্তানে এমন কোনো শিক্ষিত-  
অশিক্ষিত লোক আছে কি যে এটা বলে না বুঝে, না?

চলতি শব্দই বাংলা শব্দ

স্কুল-কলেজের বাহিরে যেটা চলে ভিতরে তা চলবে না কেন?  
কলেজের ভিতরের একটা দৃষ্টান্ত নেন।

‘আমাদের কলেজের ইকনমিকসের প্রফেসর গতকাল ক্লাসে খুব  
ভাল লেকচার দিয়াছিলেন। লেকচারটা তিনি খুব স্টাডি করিয়াই  
দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ওটা এত ইন্টারেস্টিং হইয়াছিল যে,  
আমরা সবাই তার ডিটেলড নোট নিয়াছি। তাতে প্রিটেস্টে পাস করা  
আমাদের অনেকের পক্ষেই খুব ইম্বি হইবে।’

এটা কি বাংলা ভাষা নয়? এই ভাষায় যদি প্রফেসররা লেকচার,  
দেন, তবে কার কি অসুবিধা হইবে? যেমন করিয়া কলেজ ক্লাস  
হসপিটাল প্রেসক্রিপশন অপারেশন মেডিসিন ট্রিটমেন্ট ইন্সট্রুমেন্ট  
এক্সরে রেডিওলজি কাডিওগ্রাফ থার্মোমিটার স্টেথিসকোপ ইত্যাদি  
টার্ম আমাদের কথাবার্তায় ও লেখাপড়ায় ইস্তেমালা করি, তেমনি করিয়া  
আমরা যদি সমস্ত মেডিক্যাল লজিক্যাল বোটানিক্যাল ফিজিওলজি-  
ক্যাল ও সাইকলজিক্যাল টার্ম লেখায় ও কথায় ব্যবহার করি, তবে  
তাতে দোষ কি? অসুবিধা কোথায়?

দেশী ভাষায় প্রতিশব্দের তালাসে মানুষ গোড়ামির কোন স্তরে  
যাইতে পারে, তা দেখিয়াছিলাম আমি কলিকাতায়। আপনাদের হয়ত  
অনেকেই জানেন যে, ‘ইত্তেহাদ’ সম্পাদন উপলক্ষে পাকিস্তান হওয়ার  
পরেও প্রায় তিন বৎসর কাল আমার কলিকাতায় থাকিতে হইয়াছিল।  
সেই সময় পশ্চিম-বাংলা সরকার ডাক্তার সুনীতি চাট্টাঙ্গীর নেতৃত্বে  
একটি পরিভাষা কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির রিপোর্ট  
বিবেচনার জন্য সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদগণের এক সভা হইয়াছিল।

## আমাদের ভাষা

তাতে আমরাও ডাকা হইয়াছিল। কমিটি রিপোর্ট শুনিয়া আমাদের চক্ষু একদম চড়ক গাছ। তাঁরা মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন হাইকোর্ট এডভোকেট সেক্রেটারিয়েট মিনিস্টার সেক্রেটারি মিলিটারি ক্যাবিনেট এসেসম্বলি হোস্টেল রেস্টুরেন্ট টুর্নামেন্ট ভ্যানিটি ব্যাগ ইত্যাদি সুপ্রচলিত শব্দগুলির সংস্কৃত প্রতিশব্দ বাহির করিয়াছিলেন। আমিই ঐ রিপোর্টের প্রতিবাদে বক্তৃতা করি প্রথম। সভায় সমবেত শিক্ষাবিদগণ ঐ রিপোর্টের বিরুদ্ধে এত চটিয়া গিয়াছিলেন যে, আমার মত পাকিস্তানী বাংলাদেশীর সমর্থনে অধিকাংশ বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ঐ রিপোর্ট সে সভায় গৃহীত হইতে পারে নাই।

কিন্তু দেশ-প্রেমের উদ্দীপনা ও কৃত্রিম জাতীয়তা-বোধের গোড়ামি সেখানে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, জনমতের রাজনৈতিক চাপে পশ্চিম-বাংলায় এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ঐ রিপোর্ট বা অনুরূপ অন্যান্য রিপোর্ট গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলে আজ ভারতে কাগজে-কলমে চীফ মিনিস্টারকে মুখ্যমন্ত্রী, আইন পরিষদকে বিধান সভা, কর্পোরেশনকে পৌরসভা, ভ্যানিটি ব্যাগকে 'ফুটানি কি ডিবিয়া', অল-ইণ্ডিয়া রেডিওকে 'অখিল ভারত আকাশবাণী', অল-ইণ্ডিয়া টেনিস টুর্নামেন্টকে 'অখিল ভারত ঘেচুগেণ্ডু ঝাপট' বলিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু এসব অস্বাভাবিকতা কিছুতেই স্থায়ী হইতে পারে না। ভারতের জনগণ তাদের কথায় এবং লেখায় কিছুতেই এসব কণ্ট-কল্লিত কৃত্রিমতা মানিয়া নিতে পারে নাই।

আমাদের ভাষায়ও যদি আমরা অমন কোন কৃত্রিমতার আমদানি করি, তবে কালের স্রোতে তা ধুইয়া-মুছিয়া এবং জনমতের চাপে তা গিষিয়া যাইবেই। সুতরাং আমাদের কর্তব্য অতি সোজা। পরিভাষা সৃষ্টির চেষ্টায় সাহিত্যিকদের প্রতিভার অপচয় না করিয়া যে-সব বিদেশী শব্দ আমাদের কথাবার্তায় চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি অকাতরে বই-পুস্তকে ও গোটা সাহিত্যে চালু করিয়া দেওয়া উচিত। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা এবং অফিস-আদালতের অফিসাররা তাঁদের য়ার-

ভাঁর এলাকায় কথা বলিবার সময় যে-সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেন, লিখিবার সময়ও বাংলা হরফে সেইসব শব্দ ব্যবহার করিবেন। এতে গৌরব হানি হইবে না। ভাষার বিস্ময়জনক অবনতি ঘটিবে না। বরঞ্চ তাতে আমাদের ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িয়া যাইবে। এই ইলাস্টিসিটি ভাষাকে দ্রুত আধুনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় পরিণত করিবে।

আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে। আমি উপসংহারে এই আরম্ভ করিব যে, আপনারা বিশাল ঐতিহ্যের অধিকারী এক নয়া জাতির কালচারেল রিনেসাঁর আর্কিষ্টেক্ট ও ইন্‌জিনিয়ার। আপনাদের দৃষ্টির স্বচ্ছতা, বুদ্ধির বল, প্রাণের সাহস, মনের উদারতা ও চিন্তার সবলতা আপনাদের দায়িত্বের উপযোগী হইতে হইবে। অতীতের ভুল শুধরাইবার সংকল্পে দৃঢ়তা, নয়া পথে পা বাড়াইবার বিপদকে বরণ করিয়া নিবার দুর্বার ষিদ, ব্যক্তিগত সুখ-সম্পদ ও আরাম-আয়াসে উপেক্ষা, যদি আমরা আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে নয়া জাতি গড়িবার অধিকারী আমরা নই, নাথা হেঁট করিয়া সে সত্য আমাদের মানিয়া নেওয়া উচিত। নয়া কালচার ও নয়া ভাষা উভয় ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

আপনারা দৃষ্টির সেই স্বচ্ছতা, চিন্তার সেই সবলতা এবং প্রাণের সেই সাহস নিয়া আশ্রয় হন, আপনাদের হাতে নয়া কৃষ্টি ফলে-ফুলে মঞ্জরিত হইয়া উঠুক, আমাদের রাষ্ট্র দুনিয়ার সভ্য রাষ্ট্র-পুঞ্জের দর-বারে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হউক, আমাদের মাতৃভাষা সম্পদশালী ইলাস্টিক ও বৈজ্ঞানিক ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া একদিকে আমাদের জন-গণের মুখের কথা ও মনের ভাবের বাহক হউক, অপরদিকে সে ভাষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশ ও প্রসারের উপযোগী মিডিয়াম হউক, সে ভাষা আধুনিক ও উন্নত পাক-বাংলা সাহিত্যকে বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী করুক, আল্লাহ দরগায় এই মুনাজাত করিয়া আমি বক্তৃতার উপসংহার করিলাম।\*

\*১৯৫৮ সালের ৩রা মে চাটগাঁয় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণের ( বর্ধিত ও সংশোধিত ) অংশ।



বাংলাদেশের কৃষিক পটভূমি



আগেকার দিনে জাতি অর্থে যাই বোঝা গিয়া থাকুক বর্তমান দুনিয়ান্ন জাতি অর্থ নেশন। নেশন রাজনৈতিক পরিচিতি। কোনও এক বিশেষ রাষ্ট্রের আনুগত্যে যে মানব-গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ, তারাই এক নেশন। সে আনুগত্যের বুনিয়াদ রেস্ গোল্ড খর্ম-বিশ্বাস ও জন্মস্থান যাই হোক না কেন। আধুনিক জাতি গঠনে রেস্, এথনো, ধর্ম, কালচার ও ভাষা রাজনৈতিক আনুগত্যের নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। একই ধর্মের জনগণ ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্র-জাতিতে সংগঠিত হইয়া আসিতেছে তিন শ বছরের অধিক কাল হইতেই। ইউরোপ ও আরব ভূমি তার প্রমাণ। ইদানীং এই রাষ্ট্রীয় জাতি গঠনে রেস্, গোল্ড, ভাষা ও কৃষ্টিও উপেক্ষিত হইতেছে। অথচ রেস্ গোল্ড ও ভাষাই ছিল এতদিন জাতীয়তার প্রধান, এমন কি একমাত্র, বুনিয়াদ। অবশ্য ভাষা আজও জাতীয়তার প্রধান বুনিয়াদ রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তার মধ্যেও একটা বিরাট পার্থক্য সূচিত হইয়া গিয়াছে। একদিকে ভাষার ঐক্য ছাড়াইয়া কানাডা ও সুইয়ারল্যান্ডের মত রাষ্ট্র-জাতি হইয়াছে, অপর দিকে শুধু ভাষা মানব-গোষ্ঠীকে এক রাষ্ট্র-জাতি রাখিতে পারিতেছে না। একই ভাষা-ভাষীরা আজ ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্র-জাতিতে পরিণত হইতেছে। আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকা তার প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ। বাংলাদেশ তার আধুনিক প্রমাণ।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইবে ইতিহাসের বাংলা ভাগ হইয়া আজ পূর্বাংশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ হইয়াছে, আর পশ্চিমাংশ স্বেচ্ছায় ভোট দিয়া বৃহত্তর গণতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্য হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া বিচার করিলেই বুঝা যাইবে ইংরাজ আমলের বাংলাই ভাগ হইয়াছে, ইতিহাসের বাংলা ভাগ হয় নাই। সীমা-সরহদ রদ-বদল হইয়াছে মাত্র। ঠিক তেমনি

বাংলা বিভাগে বাংলার কালচারও ভাগ হয় নাই। তা হয় নাই এই সহজ কারণে যে, ইংরাজ আমলের আধুনিক বাংলার জাতীয় কৃষ্টি বলিয়া কিছু ছিল না। ইংরাজী শিক্ষিত কোট-টাই-হ্যাটওয়ানা বাংগালী-দের একটা পোশাকী কালচার ছিল বটে এবং সে কালচারে তাঁদের মধ্যে একটা ঐক্য দেখা গেলেও সে পোশাকী কালচারের সাথে জনগণের কোনও যোগ ছিল না। জনগণের স্তরে বাংলায় দুইটি কৃষ্টি ছিল : একটা বাংগালী হিন্দু কালচার, অপরটা বাংগালী মুসলিম কালচার। বাংগালী হিন্দু কালচারটার সংগে যেমন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুদের কালচারের কোনও মিল ছিল না, বাংলার মুসলিম কালচারের সাথে তেমনি বাংলার বাহিরের ভারতীয় বা অন্য দেশের মুসলমানদের কালচারের কোনও মিল বা সম্পর্ক ছিল না। বাংলার অভ্যন্তরে কালচারের ভেদাভেদটা ধর্ম-ভিত্তিক ছিল বটে, কিন্তু বাংলার বাহিরের সাথে এই দুই বাংগালী কালচারের ধর্ম-ভিত্তিক কোন মিল বা সম্পর্ক ছিল না। এখানেই কালচারের স্বকীয়তা ও নিজস্ব শক্তি। কালচার একই ভূ-খণ্ডে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে, কিন্তু ভৌগোলিক এলাকার বাহিরে কালচারকে টানিয়া নিবার কোনও শক্তি ধর্মের নাই।

বাংলাদেশের কৃষ্টিগত গটভূমির সন্ধান করিতে হইলে তাই আমাদের এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টাইতে হইবে। বাংলাদেশ একটা মুসলিম-মেজরিটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। কিন্তু এটা রাজনীতির দিক। কালচারের দিক হইতেও আমরা এদেশের জনগণের মধ্যে ধর্মীয় গণতন্ত্র দেখিতে পাই। এটা কি বাংলাদেশের বাগিন্দাদের মেজরিটি মুসলমান বলিয়া? বাংলাদেশে মুসলিম মেজরিটি হইল কেমন করিয়া? স্পষ্টতঃই এই মেজরিটি আরব পারস্য হইতে আসে নাই। এই দেশেরই দীক্ষিত মুসলমান তারা। এই খানেই বাংলাদেশের কৃষ্টিগত গটভূমির সন্ধান করিতে হইবে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয়নেশন হিসাবে নতুন হইলেও সত্য মানব-গোষ্ঠী-অধুষিত জনপদ হিসাবে পুরাতন। বস্তুতঃ প্রাচীন সত্য মানব-গোষ্ঠী

হিসাবে বাংগালী জাতির বনস প্রায় চার হাজার বছর। প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য এই যে, খৃষ্টের জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে আজকার পাকিস্তানে দ্রাবিড় নামক এক প্রাচীন সভ্য জাতির অধিবাস ছিল। ভারত উপমহাদেশে আর্য জাতির আগমনের প্রায় দুই হাজার বছর আগে হইতেই এঁরা তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন। দ্রাবিড়রা সেমিটিক গোষ্ঠীর একটি সম্প্রদায়। আর্যদের বহু আগে এঁরা ভারতে আসেন। ভারতে আগমনের আগে এঁরা ব্যাবিলন অঞ্চলে বাস করিতেন। প্রথমে তাঁরা সিন্ধুদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। মহেঞ্জোদারো ও হরোপ্পা এঁদেরই দ্বারা স্থাপিত রাজধানী। এই দুই সুপ্রাচীন নগরীর স্থপতি ও কারুকার্য হইতেই দ্রাবিড় জাতির সভ্যতার পরিমাপ করা যায়। এঁরা শুধু স্থপতি-বিদ্যায়ই উন্নত ছিলেন না। উন্নত ভাষা ও বর্ণমালাও এদের ছিল। ভারতে বৌদ্ধ যুগেও যে এই দ্রাবিড়ী বর্ণমালার প্রাধান্য ছিল, তার বড় প্রমাণ এই যে অশোক স্তম্ভগুলির স্মারক লিপিগুলি এই দ্রাবিড়ী সেমিটিক বর্ণমালাতেই লেখা। এ বিষয়ে যঁরা বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চান, তাঁদের অধ্যাপক নাথিকুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের গবেষণা-ভিত্তিক বিশাল গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস' পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

খৃষ্ট-পূর্ব দুই হাজার সালে আর্যরা ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া দ্রাবিড়দের এক অংশ দক্ষিণ ভারতের পথে ছড়াইয়া পড়েন। সেখান হইতে একদল বাংলাদেশের মাটির উর্বরতায় আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসেন এবং স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা মহেঞ্জোদারো-হরোপ্পার মত সুন্দর নগরী বাংলাদেশেও নিশ্চয়ই নির্মাণ করিয়াছিলেন। অবশ্য স্থানীয় নির্মাণ-উপকরণের পার্থক্যহেতু সে-সব স্থপতিতেও নিশ্চয় পার্থক্য ছিল। কিন্তু আজ সে সবেব কোনও চিহ্ন নাই। প্রাকৃতিক কারণে বাংলাদেশে চিরস্থায়ী প্রাসাদ-দুর্গ-অট্টালিকা

নির্মাণের উপযোগী মাল-মশলাও যেমন দুস্প্রাপ্য, নির্মিত দালান-কোঠা ইমারত রক্ষা করাও তেমনি কঠিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের এরা নিশ্চিত শিকার। ময়নামতী, মহাস্থানগড় ইত্যাদিই তার প্রমাণ। ময়নামতী ও মহাস্থানগড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বাংলাদেশের সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও স্থপতির চমৎকারিত্ব আন্দাষ করা যায় মাত্র, বিচার করা যায় না। এগুলি সে স্থপতির আসল ও সম্পূর্ণ রূপ নয়। ঐতিহাসিক ও স্থপতি-বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের বহু প্রাচীন স্থপতি-নিদর্শন কীতিনাশা, পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনা, সুর্মা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, কপোতাক্ষ নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটি শুধু হাজার-হাজার বছরের প্রাচীন কীতিই গ্রাস করে নাই, অপেক্ষাকৃত আধুনিক পাঠান মোগল যুগের কীতিগুলিও ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। ছয় শ বছরের পাঠান-মোগল আমলে এবং তারও আগে চার হাজার বছরের দ্রাবিড়ী ও বৌদ্ধ-হিন্দু শাসন আমলে বাংলাদেশে নিশ্চয়ই অসংখ্য নগর-বন্দর ও রাজধানী-শহর স্থাপিত হইয়াছিল এবং সেখানে অগণিত দুর্গ-প্রাসাদ ও হাবিলি-ইমারত নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলি গেল কোথায়? কোনও চিহ্ন নাই তাদের কি কারণে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন সার চার্লস ডইলি ও তাঁর মত বহু বিশেষজ্ঞ। সার চার্লস তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'এন্টিকস্-অব-তাকা'য় লিখিয়াছেনঃ 'যে জায়গায় চার শ মাইলের মধ্যে পাথর পাওয়া যায় না, যে দেশের মাটিতে শক্ত কাঠ জন্মে না, যে স্থানে এবং যে যুগে সিমেন্ট আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই যুগে স্বভাবতঃই ইট-সুরকি-চুন দিয়াই দালান-ইমারত নির্মিত হইত। যে দেশের আবহাওয়ার বার্ষিক আর্দ্রতা ৯২ ডিগ্রি, যে দেশে বন্যা লাগিয়াই আছে, যে দেশের প্রবল স্রোত-স্বিনী নদী দু'কূল ছাপাইয়া ও ভাংগিয়া পথ চলে, সে দেশে দালান-ইমারতের হায়াত লম্বা হইতে পারে না।' কিভাবে পাথর তাঁটে বা বাতাসের সাথে বটের বীজ দালান-ইমারতে ছড়াইয়া পড়ে, কিভাবে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সে বটের বীজ চারায় পরিণত হয়,

কিভাবে সে চারার শিকড় দালানের পরতে-পরতে প্রবেশ করিবার পর তাতে পাতা হয় এবং মানুষের নঘরে ধরা পড়ে, কিভাবে ততদিনে সে বটের শিকড় তেমন মজবুত ও পাথরের মত শক্ত ইট-সুরকির গাঁথনি হইতে রস সংগ্রহ করিয়া দূরপনেন্ন গাছে পরিণত হয়, কিভাবে সেইসব শিকড় অক্টোপাসের মত অসংখ্য হাত-পা ছড়াইয়া দালানের লাইনে-লাইনে বিরাট ও মারাত্মক চিড় ও ফাটল সৃষ্টি করিয়া অমন শক্ত দালান-ইমারতের হায়াত কমাইয়া দেয়, সুক্কদশী বিশেষজ্ঞের মতই সার চার্লস তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়াছেন। তারপর বহু নঘির-প্রমাণ দিয়া সার চার্লস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পাব-বাংলায় অগণিত নগর-বন্দর ও দুর্গ-শহর তাদের প্রাসাদ-ইমারতসহ হয় নদীগর্ভে বিলীন হইয়াছে, নয় ত নদী-তীরের বালু-কণায় পর্যবসিত হইয়াছে। অন্যান্য নঘিরের মধ্যে দুলাই নালার মোহনায় অবস্থিত ঢাকা বন্দরের অতীত গৌরবের বর্ণনাই তিনি বিশেষভাবে দিয়াছেন। তিনি তাঁর বিশাল পুস্তকের অন্যতম প্রধান সূচিস্থিত সুলিখিত অধ্যায় 'রিফ্লেকশন্স অন তাঁতিবাজার ব্রিজ'এ বলিয়াছেন :

“অসংখ্য নাবিক ও জাহাজ-মিস্ত্রীদের হৈ-হল্লা একদা এই বন্দরে দিবানিশি প্রতিধ্বনিত হইত। দুলাই নালার দুই পাড় ও তৎসংলগ্ন বিশাল এলাকা একদা বাণিজ্যিক কর্ম-ব্যস্ততায় সদা-চঞ্চল ও কর্ম-তৎপরতায় সদামুখরিত থাকিত। মূল বন্দর রাজকীয় রণতরীর সাজ-সরঞ্জামে সদা-সমৃদ্ধ ও সম্ভারপূর্ণ থাকিত। অসংখ্য আলোক-মালায় গোটা বন্দর এলাকা দিন-রাত আলোকে উদ্ভাসিত থাকিত। সেই বন্দরই আজ নিস্কন্ধ জন-শূন্যতায় খা-খা করিতেছে। আজও এখানে সেই বৃড়িগংগা তার নীরব ম্যাজেস্টি লইয়া আগের মতই বহিয়া যাইতেছে। মানুষের তৈয়ারী যে-সব আর্ট ও ইণ্ডাস্ট্রি বৃড়ি-গংগার তীর ও পাশ্চবর্তী এলাকা সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময় করিয়াছিল, সে সবেক সকল নিদর্শন আজ তারই গর্ভে বিলীন হইয়াছে। অথবা

তীরবর্তী বালুকারাশিতে পরিণত হইয়াছে। পদ্মার পাড়ের ইতিহাসও অবিকল তাই। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে পদ্মাকে কীত্তিনাশা নাম দেওয়া ঠিকই হইয়াছে।”

( ২ )

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী-নালা তার অতীত গৌরবের আর্ট-ইন্ডাস্ট্রি ও স্থপতিকে এমনিভাবে বিধ্বস্ত ও তছনছ করিয়াছে। কিন্তু একটিমাত্র ব্যাপারে এসব নৈসর্গিক প্রতিকূলতা বাংলাদেশের জীবনে কোন ধ্বংস ও পরিবর্তন সাধিতে পারে নাই। সেটা বাংলাদেশের কৃষ্টি। পাক-বাংলার মজবুত শক্ত দুর্গ-প্রাসাদ ও দালান-ইমারত যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীর ডাংগনের সামনে টিকিতে পারে নাই, সেই কীত্তিনাশা সর্বনাশা ঝড়-ঝন্ঝা-প্রলয়েই সামনে যে একটিমাত্র বস্তু অটল স্থায়িত্ব লইয়া নিজের গৌরবে উচ্চ শিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিয়াছে, তা বাংলাদেশের কালচার। তার কারণ এই যে, বাংলাদেশের কালচার তার মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। সে কালচারের শিকড় দেশের মাটির গহিনে বিস্তৃত। বাংলাদেশের কৃষ্টি বাংলাদেশের দালান-ইমারতের মত ইট-সুরকি দিয়া নির্মিত হয় নাই। তার বদলে এ কালচার নির্মিত হইয়াছে তার রুগ-শিরাম, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বাংলাদেশের আত্মায়। ফলে বৈদেশিক ভাবধারা ও পরকীয় কালচারের বন্যার পলিমাটি ও ঝড়-তুফানের ধূলি-বালুতে মাঝে-মাঝে সে কালচার চাপা পড়িয়া থাকিলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার অবসান হওয়া মাত্র স্বাভাবিকতার মলয় হাওয়ায় সে কালচার তার আপন ঔজ্জ্বল্যে বল্মন্ করিয়া উঠিয়াছে।

অতি প্রাচীন বাংলাদেশের ঐ কালচারেরই নব-রূপ নব-পর্যায়ে আমাদের বর্তমান কালচার। নব-পর্যায়ের এই কালচার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রী ধর্ম ইসলামেরই অবদান। ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশ ও তার



জনগণের সামনে দিগ্বিজয়ীর বেশে আসে নাই। এখানে সে ধর্ম আসিয়াছে জনগণের ধর্ম হিসাবেই। বাংলাদেশে, ভারতে ও পাকিস্তানে ইসলামের আবির্ভাবের ইহাই মৌলিক পার্থক্য। ইতিহাসের অসাবধান লেখক ও পাঠকরা এইখানেই মস্তবড় ভুল করিয়া থাকেন। তাঁরা দিগ্বিজয়ী বীর বখ্তিয়ার খিলজীর বাংলাদেশে আগমনকেই এদেশে ইসলামের আগমন মনে করিয়া থাকেন। এটা নিতান্তই ভুল ধারণা। বখ্তিয়ার খিলজী বাংলাদেশ জয় করেন ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে। বার শতকের শেষ-বছরে। এই ঘটনার প্রায় তিন শ' বছর আগে হইতেই বাংলাদেশে শুধু ইসলামের আবির্ভাবই হয় নাই, ততদিনে ইসলাম বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে জনগণের ধর্মে পরিণত হইয়াছে। বাংলাদেশে ইসলামের প্রথম আবির্ভাব হয় পশ্চিম ভারতের স্থলপথ দিয়া নম্ব, দক্ষিণ দিক দিয়া জল-পথে। চাটগাঁ বন্দর হইয়াই ইসলাম বাংলায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম। প্রথমেই আসে সুফী সুলতান বায়ম্বিদ বোস্তামীর কথা। ইনি ৭৭৭ খৃষ্টাব্দ সালে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭৪ খৃঃ ইষ্টকাল করেন। তিনি ইরান ইরাক ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করিতে-করিতে সত্তবতঃ আরব বণিকদের সাথে চাটগাঁয়ে আসেন। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করিয়া ইসলাম প্রচার করেন। চাটগাঁর নাসিরাবাদে অবস্থিত তাঁর নামীয় আস্তানা ও চিল্লার প্রতি স্মরণগাতীত কাল হইতে সকল সম্প্রদায়ের জনগণ, বিশেষতঃ মুসলমানরা যে ভক্তি ও সজ্জম দেখাইয়া এবং পবিত্র স্থানের মর্যাদা দিয়া আসিতেছে, তাতে বিনা-দ্বিধায় এটা ধরিয়া লওয়া যায় যে, সুফী সাহেব এই স্থানে ধর্ম সাধনা ও ইসলাম প্রচার করিয়া অগণিত ভক্ত ও শাগরেদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছিলেন। সুলতান বায়ম্বিদের পরেই মীর সৈয়দ সুলতান মাহমুদ শাহ মাহিসোওয়ার (মৃত্যু ১০৪৭ খৃঃ), শাহ মোহাম্মদ সুলতান রুমী (মৃত্যু ১০৫৩ খৃঃ), বাবা আদম শহীদ (মৃত্যু ১১১৯ খৃঃ), শাহ নিয়ামতুল্লাহ বংশিকান প্রমুখ ইতিহাস-বিখ্যাত ওয়ালি-আল্লাগণ বাংলার বিভিন্নস্থানে দীর্ঘদিন ইসলাম প্রচার করিয়া হাজার হাজার মুরিদান রাখিয়া গিয়াছেন। এঁরা সকলেই বখ্তিয়ার

খিলজীর বাংলা বিজয়ের এক হইতে তিন শ' বছর আগে বাংলাদেশে লক্ষ-লক্ষ লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ বখতিয়ার খিলজীর আমল (১১৯৯) হইতে ইলিয়াস শাহী আমল (১৩৪২) পর্যন্ত এই প্রায় দেড় শ' বছর কালকেই বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার প্রাথমিক অধ্যায় বলা যাইতে পারে। এই মুহুর্তেই মুসলমান শাসকরা সর্বপ্রথম গোটা বাংলায় নিজেদের আধিপত্য স্থাপনে সফল হন। কিন্তু এই মুহুর্তকে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার লাভ করার প্রথম যুগ বলা ভুল হইবে। উপরে উল্লিখিত ওয়ালি-আল্লাদের প্রচার ফল কি হইয়াছিল, তা অনুমান করিতে পারি আমরা কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে।

ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন, ১৩০৩ সালে বিখ্যাত পীর দরবেশ বীরযোদ্ধা শাহ জালাল সাহেব সিলেটের রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করিয়া সিলেট জয় করেন। পীর সাহেব নিশ্চয়ই বিনাকারণে পররাজ্য দখল করিতে আসেন নাই। মুসলমান প্রজাদের উপর রাজা গৌরগোবিন্দ অমানুষিক যুলুম করিতেছিলেন বলিয়াই শাহ জালাল সাহেব শুধু মুসলমানদের রক্ষার জন্যই সিলেট আক্রমণ করিয়াছিলেন। এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে, রাজা গৌরগোবিন্দ তাঁর মুসলিম প্রজাদের ধর্ম-কাজে বাধা দিতেন। তাদের উপর সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতমূলক বিধি-নিষেধ আরোপ করিতেন। মুসলিম প্রজারা আবেদন-নিবেদন করিলে রাজা তাতে কর্ণপাত করিতেন না। বিধি-নিষেধ অমান্য করিলে প্রজাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার-উৎপীড়ন করিতেন। মসজিদে আযান দিতে না দেওয়া, জমাতে ঈদের নমায পড়িতে না দেওয়া, গরু কোরবানি নিষেধ করা, টুপি পরিতে না দেওয়া, মুসলমানদের দাড়ি কাটিয়া দেওয়া ইত্যাদি ছিল রাজা গৌরগোবিন্দের অসংখ্য যুলুমের কয়েকটি নমুনা মাত্র। রাজার অত্যাচার মুসলমানদের পক্ষে অসহ্য হইলেই তারা বাধ্য হইয়া দিল্লীর বাদশাহ সুলতান ফিরোয শাহের দরবারে একদল প্রতিনিধি পাঠায়। এই প্রতিনিধি দলের মুখে রাজা গৌরগোবিন্দের মুসলিম-প্রজা-নির্ষাতনের

## বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি

কাহিনী শুনিয়াই দিল্লীর বাদশাহ শাহ জালালকে মুসলিম নির্মাতন নিবারণ করিতে পাঠান। শাহ জালাল সিলেটে পৌঁছিবার আগেই ফিরোয শাহ গুপ্ত ঘাতকের হাতে নিহত হন এবং সুলতান আলাউ-উদ্দিন তখতে আরোহণ করেন। আলাউদ্দিন খিলজিও শাহজালালকে সাহায্য করেন। রাজা গৌরগোবিন্দ কোন প্রতিকার না করাতেই শাহজালাল সিলেট আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। যুদ্ধে রাজা গৌরগোবিন্দ পরাজিত হন। শাহ জালাল সিলেট দখল করেন।

( ৩ )

এই ঘটনা হইতে আমরা কি বুঝি? বুঝি এই যে, ঐ সময়ে সিলেটে এত বেশী মুসলমান ছিল যে, হিন্দু রাজার পক্ষে অত্যাচার করা দরকার হইয়াছিল। মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী ও দলে ভাবি না হইলে রাজার আদেশের প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে পারিত না, আইন অমান্য করিতে পারিত না, টুপি পরিয়া দাড়ি রাখিয়া প্রকাশ্যে চলাফিরা করার, মসজিদ নির্মাণ করিয়া তাতে উচ্চস্বরে আযান দিবার ও জামাতে ঈদের নমায পড়িবার সাহস পাইত না। অবশেষে দিল্লীর দরবারে প্রতিনিধি পাঠাইবার সাহসও তাদের হইত না। অতএব ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ঐ সময়ে সিলেটে বহু সংখ্যক মুসলমান বিদ্যমান ছিল।

এই একটিমাত্র ঘটনা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বখতিয়ার খিলজী বাংলা দখল করিবার বহু আগে হইতেই বাংলার জনগণের এক বিপুল অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। অন্য কথায় বলা যায়, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তি বাংলা জয় করিবার বহু আগেই ইসলামের কৃষ্টিক শক্তি বাংলা জয় করিয়াছিল।

প্রশ্ন এই যে, এটা কি করিয়া সম্ভব হইয়াছিল এবং কবে হইয়াছিল? প্রথম প্রশ্নটার ঐতিহাসিক জবাব এই যে, চাটগাঁ বন্দরের মধ্য দিয়া বাংলাদেশে ইসলামের শুভাগমন হয়। এই হিসাবে পাক-বাংলার কৃষ্টি পটভূমি রচনায় চাটগাঁ বন্দরের ভূমিকা ঐতিহাসিক

গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে দুইটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার। বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি প্রবেশ করে পশ্চিম সীমান্ত-পথে, উত্তর ভারত হইতে। পঞ্চাশতরে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করে দক্ষিণ দিক হইতে, সমুদ্রপথে চাটগাঁ বন্দর দিয়া। বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির রূপ তুর্কী, পাঠানী ও মোগলাই রূপ। পঞ্চাশতরে বাংলার ইসলাম ধর্মীয় রূপ খাঁটি আরবী রূপ। পাক-ভারতে অপরাপর অঞ্চলের মুসলমানদের তুলনায় বাঙালী মুসলমানদের আড়ম্বরহীন, অপ্রদর্শনবাদী, সতেজ ধর্মীয় চেতনাই বাঙালী মুসলমানদের এই ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর বহন করিতেছে। বাঙালী মুসলিম জনসাধারণের কথ্য ভাষায়, মুখের যবানে ফারসী-উর্দুর চেয়ে আরবী শব্দের প্রাচুর্য দেখা যায় বেশি। তার কারণও এইখানে নিহিত। কিন্তু সে কথা একটু পরে বলিতেছি।

চাটগাঁ বন্দরের মধ্যে দিয়া পাক-বাংলায় ইসলামের আগমনের এবং পাক-বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তি কয়েকের বহু আগে হইতেই ধর্ম হিসাবে স্থানীয়ভাবে এখানে ইসলামের প্রতিষ্ঠার কথাটাই আগে বলিয়া নিতেছি। এতে দেখা যাইবে যে, যেদিন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বাধীনে বাংলায় মুসলিম রাষ্ট্র-শক্তির প্রথম পদার্পণ হয়, সেদিন তাঁকে অভ্যর্থনা করিবার মত যথেষ্ট মুসলিম জন-শক্তি বাংলায় বিদ্যমান ছিল। কেমন করিয়া এটা ঘটিয়াছিল, সংক্ষেপে এখানে তার উল্লেখ করিতেছি।

প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সবগুলি প্রাচীন সভ্যতার জন্ম নদী-উপত্যকায় এবং তাদের বিকাশ ঐ-সবনদীর মোহনাস্থ বন্দরসমূহে। ঐতিহাসিক গিবন, গারগিটিন ও টলেনবি বহু তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে দেখাইয়াছেন যে মিসরীয়, বাবিলনীয়, চীনা ও ভারতীয় ইত্যাদি সবগুলি প্রাচীনসভ্যতার আদি জন্ম যথাক্রমে আদি জন্ম যথাক্রমে নীল নদী, দজলা, ফোরাভ, ইয়াং হো ও সিন্ধু নদীর উপত্যকা ও তাদের প্রকাশ ও বিস্তৃতি ঐ-সব নদীর মোহনা

দিয়া সমুদ্র-পথে। অধ্যাপক টয়েনবি বলিয়াছেন, চীনের পীত নদীর সাথে তিব্বতে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্র নদীর যোগাযোগ ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনা বংগোপসাগরে। কিন্তু সাগরে পড়িবার আগেই পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদীর এক শাখা (বর্তমানে গংগা-যমুনা) আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হয়। এই সশিমিলিত নদীর বর্তমান নাম যদিও পদ্মা, আগের নাম গংগা। নদী-মোহনার নাম গংগা মোহনা।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই আরব জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। উত্তরে ভূমধ্য সাগর, দক্ষিণে আরব সাগরসহ ভারত মহাসাগরের সর্বত্র এবং পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরেও দ্বীপপুঞ্জ আরব বাণিজ্য-তিরির একাধিপত্য ছিল। খৃষ্টপূর্ব দুই শতকেও আরব বণিকরা উত্তর গ্রীস মেসিডোনিয়া, পূর্বে ভারতবর্ষ, মালয়, জাভা, সুমাত্রা ও চীন পর্যন্ত দেশ-বিদেশে বিশাল-বিশাল জাহাজে সওদাগরি করিতেন। এই উপলক্ষে আরববণিকরা ভারতীয় উপকূলের সুরাট, কোচিন, কালিকট, তাম্রলিপ্ত ও চাটর্গা ইত্যাদি বন্দর ব্যবহার করিতেন। এইসব বন্দরের মধ্যে চাটর্গা বন্দরই আরবদের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। আরব বণিকরাই এই বন্দরের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। এই বন্দরকে ক্রমে নগরে পরিণত করেন তাঁরাই। এই বন্দরের নামও আরব বণিকরাই রাখিয়াছিলেন শাতিল-গংগা। শাতিল-গংগা নামই যে কালক্রমে পরিবর্তন হইতে-হইতেই চাটিগাং হইয়াছিল, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে। খৃষ্টীয় দুই শতকে মিসরীয় ঐতিহাসিক টলেমি জাভা সুমাত্রা ইত্যাদি বন্দরের নামোন্মেষ করার সাথে-সাথে পাট-ডি-গংগা নামে গংগা নদীর মোহনাস্থ বন্দরের নাম করিয়াছেন। এ বন্দর বর্তমানের চিটাগাং ছাড়া আর কোনও স্থান নয়। চাটিগাং বা শাতিল-গংগা নাম আরব বণিকদের দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি এই কারণে যে, এইসব আরব বণিক তাঁদের দেশের দজলা-ফোৱাত (বর্তমানের টাইগ্রিস ইউফ্রেটিস) নদীর মোহনাস্থ বন্দর শাতিল-আরবের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তৎকালে সমগ্র আরব ভূমিতে শাতিল-আরব বন্দরই ছিল সাগর-পথের বাণিজ্যের

শ্রেষ্ঠ বন্দর। নিজেদের দেশের শ্রেষ্ঠ বন্দরের প্রিয় নাম অনুসারে বিদেশের একটি বন্দরের নাম রাখা খুবই স্বাভাবিক। নব-আবিষ্কৃত মার্কিন মুল্লকের ইংরাজ ঔপনিবেশিকরা আমেরিকার বহু শহরের নাম ইংল্যান্ডের স্থানের নাম অনুসারে রাখিয়াছেন।

তৎকালে গংগা নদীর মোহনা এত প্রশস্ত ছিল যে, সুন্দরবন হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত সবটুকু স্থানেই গংগানদীর মোহনা বিস্তারিত ছিল। এই প্রশস্ত মোহনায় আর কোনও স্থান চাটগাঁর মত বন্দর হইবার উপযোগী ছিল না। বংগোপসাগরের উপকূলে পাহাড়-পরিবেষ্টিত এমন সুন্দর ও নিরাপদ জায়গা আর ছিল না।

অতএব দেখা গেল, চাটগাঁ প্রাচীন বন্দর। কত প্রাচীন তা বলা অবশ্য কঠিন। তবে এ বন্দর যে বাংলাদেশের সমবয়সী, সে কথা নির্ভয়ে বলা চলে। বয়স ও সমৃদ্ধির দিক দিয়া চাটগাঁ দুনিয়ার অভিজাত বন্দরসমূহের অন্যতম, এটাও ইতিহাসেরই কথা। আগেই বলিয়াছি ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত রায় এই যে, খৃষ্টপূর্ব দুই শতক হইতেই এয়মন ও বাবিলনীয় অঞ্চলের আরবরা চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারী ছিল। সিংহল, মালাবার, কালিকট, চাটগাঁ, জাভা, সুমাত্রা, মালয় ও ক্যান্টনে ইহাদের বাণিজ্যিক একাধিপত্য ছিল। সেই সময় হইতে পনের শতকে ওলন্দাজদের আগমন পর্যন্ত সে একাধিপত্য অটুট ছিল। চাটগাঁ এই-ভাবে দুই হাজার বছরের অধিককাল পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দররূপে পরিগণিত ছিল এবং পশ্চিমে আরব, আবেসিনিয়া, এয়মন, আসিরিয়া, গ্রীস ও রোম এবং পূর্বে চীনের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা করিত। এই দুই হাজার বছরের সুদীর্ঘ মুদতে চাটগাঁ অনেকবার হাত বদল হইয়াছে। হিন্দুদের হাত হইতে বৌদ্ধদের হাতে, বৌদ্ধদের হাত হইতে আবার হিন্দুদের হাতে, হিন্দুদের হাত হইতে মুসলমানদের হাতে, মুসলমানদের হাত হইতে আবার বৌদ্ধদের হাতে, বৌদ্ধদের হাত হইতে দ্বিতীয়বার মুসলমানদের হাতে আসিয়াছে। হিন্দুদের আমলে এর নাম ছিল চাটিগ্রাম। বৌদ্ধদের আমলে

## বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি

এর নাম হয় চিট্‌সি-গং। মুসলমানদের হাতে এর নাম প্রথমে হয় সাতগাঁও, পরে ফতেহাবাদ এবং অবশেষে ইসলামাবাদ। তার পরে ১৭৬৬ সালে বাংলার শেষ নবাব মীর কাসিম আক্‌বী খাঁ ইংরাজদেরে এই বন্দর উপহার দেন। ইংরাজরা এর নাম রাখে চিটাগাং। কিন্তু এইসব পরিবর্তন ও হাত বদলের মধ্যেও চাটগাঁ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে তার পূর্ব গৌরব বরাবর অটুট-অক্ষুণ্ন রাখে। ষোল শতকের শেষ দিকে সম্রাট আকবরের সনদ লইয়া ওলন্দাযরা যেদিন চাটগাঁ বন্দরে প্রবেশ করে, সেদিন এই বছ বন্দর দশী ওলন্দাযরাও চাটগাঁকে 'পোর্টা গ্র্যাণ্ড', মহান বন্দর, বলিয়া উচ্ছসিত অভিনন্দন জানাইয়াছিল।

কিন্তু বাণিজ্য-কেন্দ্র বন্দর হিসাবে চাটগাঁর গৌরব আলোচনা আমার এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমার আলোচ্য আরও গভীর। পাক-বাংলার ধর্ম-কৃষ্টিক জাতীয় জীবনের উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে চাটগাঁর যে বিপুল অবদান, সে কথা বলাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমার প্রতিপাদ্য এই যে, পাক-বাংলার কৃষ্টিক পটভূমি হিসাবে চাটগাঁর ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি অবিস্মরণীয়।

( ৪ )

দুনিয়ার যে-সব বন্দর শহর রাজধানী না হইয়াও, সোজা কথায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী না হইয়াও, জাতির জীবনে রাজধানীর চেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, চাটগাঁ তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান। বস্তুতঃ চাটগাঁ বন্দর শুধু চাটগাঁ শহর ও জিলাকে নয়, তার নিকট ও দূরবর্তী সমস্ত হিণ্টারল্যাণ্ড যথা : আরাকান, বাংলা স্রিপুরা, কাছাড় ও আসামকে ধর্ম-কৃষ্টিতে প্রভাবিত করিয়াছে। কিভাবে, সে কথাই এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি :

প্রধানতঃ দুইদিক হইতে এই প্রভাব ব্যাপ্ত ও বিস্তৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ চাটগাঁ বন্দর-পথে ইসলাম বাংলায় প্রবেশ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চাটগাঁর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে।

ধর্ম বিস্তারের কথাটাই আগে বলি। উপরে বলা হইয়াছে চাটগাঁ বন্দর ইসলামের আবির্ভাবের বহু যুগ আগে হইতেই আরবদের বাণিজ্যিক কলোনী ছিল। চাটগাঁ হইতে সমুদ্র-পথে তারা উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিতই, তার উপর নদী-পথে মেইনল্যান্ডের ভিতরেও বহুদূর পর্যন্ত উজাইয়া যাইত। কর্ণফুলী, মেঘনা, সূর্মা, গংগা ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি মূলনদী এবং ধলেশ্বরী, করতোয়া, তিস্তা, কংস, ইছামতী, শীতলক্ষ্যা ইত্যাদি শাখানদী-পথে যে-সব শহর-নগরে যাওয়া সম্ভব ছিল, সে-সব জায়গাতেও আরবরা নৌকাযোগে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। চাটগাঁ বন্দর-শহর প্রায় সম্পূর্ণরূপে আরব সওদাগরদের বসতি স্থান ছিল। শহরের নাগরিক ও মিউনিসিপ্যাল কর্তৃক তাদের হাতেই ছিল এবং তারা তা যোগ্যতার সহিত পালনও করিত। দেশের ভিতরে বড়-বড় নগর-শহরেও বহু আরব সওদাগর একরূপ স্থায়ীভাবেই বসবাস করিতেন। স্বাধীনতার আগে আমাদের দেশে রাজপুতনার মাড়োয়ারী ও কচ্ছ-সুরাটের মল্লমনরা যেমন আমাদের ঘিলা শহর হইতে গুরুর করিয়া সমস্ত বড়-বড় বাজার-বন্দরগুলিতে ছড়াইয়া ছিলেন, খৃষ্টীয় সাতই শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত বাংলার শহর-নগরের আরব সওদাগরদের অবস্থাও তাই ছিল। সাতই শতকের গোড়ার দিকে আরবের মক্কা নগরীতে ইসলামের আবির্ভাব হয়। এই শতকের প্রথমার্ধেই ইসলাম আরব দেশে জনপ্রিয় ধর্মে পরিগণিত হয়। আরব জাতির মধ্যে ইসলাম জনপ্রিয় হওয়ার সাথে-সাথেই বিদেশে ব্যবসা-রত সমস্ত আরবরাই স্বভাবতঃই নিজের দেশের এই নয়া ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এইভাবে সাত শতক শেষ হইবার আগেই বাংলায়, বিশেষতঃ চাটগাঁ বন্দরে, ব্যবসা-রত সমস্ত আরবরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। এটা ত গেল আরব ব্যবসায়ীদের কথা। বাংলার জনগণের অবস্থা তখন কি?

আগেই বলিয়াছি, বাংলার জনসাধারণ প্রধানতঃ প্রাবিড় জাতীয়। প্রাবিড়রা আদিতে সেমিটিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা বাবিলন অঞ্চল হইতে ইরান, মাকরান ও সিন্ধু হইয়া দক্ষিণ ভারতের মালা-



বার অঞ্চল দিয়া বাংলায় আসে, এ কথাও আগেই বলিয়াছি। এদের মধ্যে সেমিটিকদের রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। মনের দিক দিয়া কাজেই এরা স্বাধীনতা-প্রিয় সাম্যবাদী। এই কারণেই বাংলার হিন্দুরা ধর্ম-বিশ্বাসে ওয়ারিসী আইনে ও পূজা-পার্বনে উত্তর ভারতীয় আর্ষহিন্দু হইতে অনেকখানি স্বতন্ত্র। এরা বর্ণাশ্রমী আর্ষ ধর্মের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রভাবিত হয় নাই। এরা এই সময়ের বৌদ্ধ ধর্মের সাম্য ও গণতান্ত্রিক মতে প্রভাবিত ছিল। ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্মের মতই সাম্যবাদী, কিন্তু তার চেয়েও সহজ ও বাস্তববাদী। কাজেই সেমিটিক বংশজাত-বাংলার জনসাধারণ অতি সহজেই ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আরব জাতি যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দক্ষ প্রচারক। ফলে আরবদের নয়া ধর্ম-প্রচার-কৌশল ও স্থানীয় জনসাধারণের উর্বর মনোভাব ইসলাম প্রসারের অনুকূল হইল। সাত শতক শেষ হইবার আগেই বাংলার বহু অধিবাসী মুসলমান হইয়া গেল। আট শতকে ইসলাম যে উত্তরবঙ্গে প্রসারিত ছিল তার আরেকটি প্রমাণ এই যে, রাজশাহী জিলার পাহাড়পুরে খলিফা হারুনর রশিদের আমলের (৭৮৪-৮০৯ সাল) একটি মূদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং এতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল, বার শতকের শেষ সালে (১১৯৯) বখতিয়ার খিলজীর আগমনের বহু আগেই ইসলাম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ও তিন শ বছরের পুরাতন ধর্ম হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাই নয়, মোহাম্মদ-বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের (৭০৮-৭১১) সময়েও ইসলাম বাংলায় কমসেকম পঞ্চাশ বছরের পুরান ধর্ম হইয়া গিয়াছে। তাছাড়া মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের সময়েই সিন্ধুদেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, এটা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। কারণ মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের রাজত্ব মাত্র তিন বছর স্থায়ী হইয়াছিল। ৭১১ সালে খলিফা ওয়ালিদের মৃত্যুতে সোলেমান সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্বশত্রুতাবশতঃ তিনি মোহাম্মদ-বিন-কাসিমকে দামেশ্কে ফিরাইয়া নিয়া নানা প্রকার মূল্য করিয়া হত্যা করেন। মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের সিন্ধু

## বাংলাদেশের কালচার

ত্যাগের পরে-পরেই রাজপুতেরা পুনরায় সিদ্ধু জয় করিয়া নেন। দুই শ বছর রাজপুত শাসন চলার পর ১০২৭ সালে সুলতান মাহমুদ সিদ্ধু আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে জিতিয়াও তিনি স্থায়ীভাবে সিদ্ধু দখল করেন নাই। তারপর সুলতান মইয়ুদ্দিন মাহমুদ ১১৮২ সালে সিদ্ধু আক্রমণ করিয়া সিদ্ধুর রাজধানী দাইবুল দখল করেন। এই সময় হইতে সুলতানা রাষিয়ার আমল ( ১২৩৬-৪০ ) পর্যন্ত এই পঞ্চাশ-ষাট বছরে সিদ্ধুতে মুসলিম রাজ কায়েম হয়। কাজেই মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের শাসন হইতেই সিদ্ধু দেশে ইসলাম প্রচারিত হইয়াছিল, এ কথা ঠিক নয়। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার মানে এই যে, পাক-ভারতের পশ্চিম-মধ্য উভয় অঞ্চলেই রাষ্ট্র-শক্তির প্রতিষ্ঠার সাথে যেরূপে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাক-বাংলায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার গোড়ার কথা তা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাক-বাংলায় ইসলামের আগমন হইয়াছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম প্রচারের প্রায় তিন শ বছর আগে।

এটা ঘটিয়াছিল চাটগাঁ বন্দরের দওলতে এবং তার মধ্য দিয়া। চাটগাঁর এই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ ১৫২১ সালে চাটগাঁর নাম রাখেন ফতেহাবাদ অর্থাৎ ইসলামের দরজা। ঠিক দেড় শ বছর পরে ১৬৭০ সালে নবাব শায়েস্তা খাঁ চাটগাঁকে আরও বেশী সম্মান দেন এর নাম ইসলামাবাদ রাখেন।

( ৫ )

এটা ত গেল ধর্মের দিক। কৃষ্টি-সাহিত্যের বেলাতেও এই কথাই সত্য। পাক-বাংলার ভাষা-কৃষ্টি-সাহিত্য রাঢ়-বাংলা ও পশ্চিম ভারতীয় অন্যান্য অঞ্চল হইতে স্বতন্ত্র দুই কারণে। এক, এখানকার ভাষা-সাহিত্যে দ্রাবিড়ী ছাপ। দুই, এখানকার ভাষা-সাহিত্যে আরব ও ইসলামের প্রভাব। প্রথমে দ্রাবিড়ী ছাপের কথাটাই বলা যাক। পাক-বাংলার বিশেষতঃ চাটগাঁ, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ভাষা, শব্দ-প্রকরণ উচ্চারণ-ভংগি ও নাচে-গানের গোটা

## বাংলাদেশের কৃষ্টিক পটভূমি

সাংস্কৃতিক পরিবেশে দ্রাবিড়ী ছাপ ও নিদর্শন আজও উজ্জ্বল হইয়া আছে। এই-সব অঞ্চল হইতে সংগৃহীত যে-সব গীতিকা 'পূর্ব-বঙ্গ গীতিকা' নামক গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, ঐ-সব গানের মধ্যে প্রেমের খনে দুঃসাহসিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনীরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায় বেশী। এ-সব গীতিকার ভাষায়ও প্রচুর দ্রাবিড়ী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ঐ-সব অঞ্চলের লোক সংস্কৃতিতে যে-সব নৃত্য-গীত প্রচলিত রহিয়াছে, তাতেও প্রচুর দ্রাবিড়ী ছাপ রহিয়াছে। অনেক ভাষা-তাত্ত্বিকের মতে খোদ বঙ্গ শব্দটাও মূল দ্রাবিড় হইতেই উদ্ভূত। পূর্বে আরাকান উত্তরে দ্বিপুত্রা ও পশ্চিমে বাকেরগঞ্জ ধরিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, চাটগাঁই এইসব কৃষ্টি-সংস্কৃতির কেন্দ্র ভূমি ছিল।

তারপরে আসা যাক আরব ও ইসলামের প্রভাবের কথায়। আধুনিক যুগের আলোচনাতেও দেখা যাইবে যে, পাক-বাংলার কৃষ্টি-সাহিত্যের ব্যাপারে চাটগাঁয়ের অবদানের তুলনা নাই। এ বিষয়েও চাটগাঁই পাক-বাংলার পটভূমি। অবশ্য সব সত্য জাতির কৃষ্টির মতই আমাদের কৃষ্টিও ধর্মভিত্তিক। কাজেই যেদিন বাংলার জনগণের মেজরিটি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই দিন হইতে সারা মুসলিম-বাংলাই ভাবী পাক-বাংলার কালচারের নার্সারি হইয়া উঠিয়াছে। তবু এ ব্যাপারে আমাদের কৃষ্টি-সাহিত্যের দিশারী ও পটভূমি একমাত্র চাটগাঁই। এর প্রমাণও সুস্পষ্ট।

প্রথমতঃ, পাঠান আমলের সব কয়জন বাংলা কবি যথা : মোহাম্মদ সগীর, দওলত উষির, বাহরাম খাঁ, সৈয়দ সুলতান, খুরশিদ খাঁ, মোহাম্মদ খাঁ, মোহাম্মেল, মোহাম্মদ কবির প্রমুখ সকলের জন্ম-স্থান ও কর্মস্থান চাটগাঁ।

দ্বিতীয়তঃ, আরাকানের রাজদরবারের বাংলা বড়-বড় কবিরা যথা : দৌলত কাশী, আলাওল, মাগনঠাকুর ও আবদুল করিম আসলে চাটগাঁরই লোক।

তৃতীয়তঃ, আরাকান ও ছিপুরা রাজ দরবারের অন্যান্য কবির মথা : দুনা গায়ী, শেখ সাদি, আবদুল হাকিম এবং শেরবায় প্রমুখ চাটগাঁর লোক না হইলেও চাটগাঁয় কবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হইয়াছিলেন ।

চতুর্থতঃ, যদিও আরাকানের রাজারা মুসলমান ছিলেন না, ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মান্বলম্বী, তথাপি ঐ রাজাদের প্রধানমন্ত্রীরা, যুদ্ধমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতিরা, এমন কি ধর্মীয় বিভাগের মন্ত্রীরা (নবরাজ) সকলেই চাটগাঁয়ের মুসলমান ছিলেন । কোরায়েশী মাগন, সোলেমান, মজলিশ খাঁ এবং আশরাফ খাঁর নাম ঐদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আরাকান রাজাদের উপর ঐদের এত প্রভাব ও প্রতাপ ছিল যে, ঐ-সব রাজার দরবারী কবি ও পারিষদবর্গ সকলেই মুসলমান ছিলেন । ঐদের প্রভাবে স্মরণ রাজারাও ধর্মে বৌদ্ধ হইয়াও সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় তাঁরা মুসলিম নাম গ্রহণে গৌরব বোধ করিতেন । রাজা মেং ফালাং সিকান্দার শাহ, মেং বাদিয়াগ্লি সেলিম শাহ, মেং খামাউং হোসেন শাহ উপাধি ধারণ করেন উঁহাদেরই প্রভাবে । নিজেদের ভাষা বাদ দিয়া রাজারা যে বাঙ্গালী কবি ও বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন, এটাও সন্দেহ হইয়াছিল চাটগাঁবাসী ঐসব মুসলমান রাজকর্মচারী ও কবিদের অসাধারণ প্রভাবেই ।

পঞ্চমতঃ, তৎকালীন ঐ-সব বড়-বড় কবির ব্যবহৃত বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য ছিল স্বাভাবিক কারণেই । সাধারণভাবে পাক-বাংলার, বিশেষভাবে চাটগাঁ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের, কথা বাংলাতেও আরবী শব্দের প্রাচুর্য বলিয়াই কাব্য-সাহিত্যের ভাষাতেও তাই হইয়াছিল । আরবী ও ফারসী ভাষা তৎকালীন দুনিয়ার সমৃদ্ধিশালী ভাষা-সমূহের অন্যতম প্রধান ভাষা ছিল । কাজেই আরবী-ফারসীর প্রভাবে আমাদের সাহিত্যও উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল । পাক-বাংলার ভাষায় কি শব্দ-সম্পদে, কি বাক-রীতিতে, কি শব্দ-প্রকরণে, কি পদ-বিন্যাসে, কি ছন্দ-প্রকরণে, কি সঙ্গী-সমাসে, কি

## বাংলাদেশের কৃষ্টিচিহ্ন পটভূমি

উপমা-অলংকারে, কি ধাতু-প্রত্যয়ে, কি মুখরোজ-তালফ্‌ফুযে এবং ব্যাকরণ ও ভাষা-রীতিতে আরবী-ফারসীর এই প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া পাক-বাংলার সাথে সংস্কৃত-প্রভাবিত পশ্চিম-বাংলার ভাষার এত পার্থক্য দেখা যায়।

এই পার্থক্যটুকুই আমাদের ভাষিক নিজস্বতা, কৃষ্টিচিহ্ন স্বকীয়তা। পরাধীন আমলে বাংলা ভাষার ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু ধ্বংস করা হয়। তারই ফলে পশ্চিম-বাংলার বাক-বিন্যাস ও উচ্চারণ-ভঙ্গিকে অজ্ঞাত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিয়াছি। স্বাধীন জাতীয় পুনর্জাগরণে বাংলা-দেশের সে স্বকীয়তার উদ্ধার আমরা করিব না কি ?

ঈদুল-ফেতর, ১৯৭২,









## জাতীয় আত্মার স্বরূপ

বাংলাদেশ আজ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই হিসাবে তার একটা জাতীয় ব্যক্তিত্ব ও সত্তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই সংগে তার একটা জাতীয় আত্মাও আছে কি? রাষ্ট্রীয় সত্তায় আমরা একটা নেশন। আমাদের রাষ্ট্র নেশন-স্টেট। কিন্তু এটা আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয়, দৈহিক বর্ণনা, বস্তুগত পরিচিতি। এই পরিচয়ের বাহিরে, এই পরিচিতির উর্ধ্বে ও এই সত্তার গভীরে আমাদের একটা আধ্যাত্মিক, স্পিরিচুয়াল, অস্তিত্ব আছে কি? তার মানে আমাদের একটা জাতীয় আত্মা আছে কি?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ও পাওয়া খুবই আবশ্যিক। খুবই কঠিনও। যে যুগে পণ্ডিতেরা মানুষের আত্মাতেই বিশ্বাস করিতে চান না, সে যুগে জাতীয় আত্মার কথা বলিতে যাওয়া নিঃসন্দেহে দুঃসাহসিক কঠিন কাজ। তবে ভরসা এই যে, অনেক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর মতে ন্যাশনালিযম একটা স্পিরিচুয়াল কনসেপশন। এই হিসাবে প্রত্যেক নেশনের একটা স্পিরিচুয়াল অস্তিত্ব বা আত্মা থাকার কথা। এই ধারণা যেমন স্বাভাবিক তেমনই বস্তু-নিষ্ঠ। ইণ্ডিজুয়াল বা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বা পার্সন্যালিটি ও জাতীয় স্বকীয়তা বা ন্যাশনাল আইডেন্টিটি আছে। এটা মানিয়া নিতে কারও আপত্তি নাই। কারণ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-জাতি একটা অর্গানিযম, এ সত্য সবাই মানিয়া লইয়াছেন। অর্গানিযম হইলেই যান্ত্রিক ও জৈবিক কারণে তার ইণ্ডিজুয়ালিটি বা স্বাতন্ত্র্য থাকিবেই, এটাও প্রায় সর্ব-স্বীকৃত কথা। কিন্তু আত্মার কথাটা তেমন সহজও নয়, সর্ব-স্বীকৃতও নয়। কথাটা মেটাফিজিক্যাল বলিয়াই এই দ্বিমত। কিন্তু আমি এই বিতণ্ডায় অবতীর্ণ হইব না। বরঞ্চ আমি ধরিয়া লইব ব্যক্তির জন্য যেমন একটা আত্মার অস্তিত্ব-স্বীকৃতি কল্যাণকর, জাতির জন্যও তাই।

কিন্তু তাতেও আলোচ্য বিষয়টির সংকট মিটে না। বাংলাদেশী জাতির আত্মার সজ্ঞান পাওয়া তাতেই সহজ হইয়া যায় না। কারণ দুই শ বছরের চিনা বাংলা ছাব্বিশ বছর আগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। সেই বিভক্ত বাংলার আজিকার সাড়ে সাত কোটি বাংলাদেশীর জন্যই আমরা নেশনহুডের দাবি করিতেছি। দৃশ্যতঃই এই সাড়ে সাত কোটি ঐতিহাসিক বাংলাদেশীর অংশ মাত্র, যদিও আমরা বড় অংশ। রেস, গোত্র, এথনোলজি, নৃতত্ত্ব, ভাষা, খোরাক, পোশাক ও বর্ষগণনা ইত্যাদি দিগ্নাশ্বে জাতিত্বের বিচার হয়, সে সবার মাপকাঠিতে বাংলাদেশীর সংখ্যা আজ বার কোটি। তবু আমরা বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দা লইয়াই বাংলাদেশী জাতিত্বের দাবি করিতেছি কেন? এ দাবির তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। তা বুঝিতে পারিলেই আমরা এই জাতির আত্মার সজ্ঞান করিতে পারিব।

ব্যাপারটা স্পিরিচুয়াল। তাই বুঝিতে বেগ পাইতে হইবে। স্পিরিচুয়াল হইলেও এটা মেটাফিজিক্স নয়। তাই এটা বোঝা কঠিন হইলেও অসাধ্য নয়। স্পিরিচুয়াল হইলেও জাতীয় আত্মা ধর্মীয় আত্মা হইতে পৃথক। ধর্মীয় আত্মা ও জাতীয় আত্মা দুইটাই সিদ্ধান্তিক হইলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। একটা আত্মিক, অপরটা দৈহিক। একটা আইডিয়াল, অপরটা সেকিউলার। একটা ইন্-অর্গানিক, অপরটা অর্গানিক। একটা সত্য-নিষ্ঠ, অপরটা বস্তু-নিষ্ঠ। একটা হৃদয়ের, অপরটা মস্তিষ্কের।

### জাতীয় আত্মা বনাম ব্যক্তি-আত্মা

ব্যক্তির আত্মার সিদ্ধান্তিক ব্যক্তি নিজেই। ব্যক্তিত্বেই ব্যক্তির আত্মার বহির্প্রকাশ। কিন্তু ধর্মীয় আত্মাই হোক আর জাতীয় আত্মাই হোক উভয়টাই সমবেত আত্মা। তেমন আত্মার সিদ্ধান্তিক কি? ধর্ম-দর্শন ও সুফী-আউলিয়া, মুণি-খাম্বি, সাধু-সন্ত (সেইন্ট) প্রভৃতি তপস্বীদের মতে মানবাত্মা পরমাত্মারই (ওভারসোল) ক্ষুদ্রতম অংশ। পরমাত্মা

(ওস্তানসোল) হইতেই ব্যক্তি-আত্মার (সোল) আগমণ, আবার সেই পরমাত্মাতেই তার বিলয়। 'ইন্না লিল্লাহে ওন্না-ইন্না ইলাল্লাহে রাজেউন'-এ তাঁরা সত্যই বিশ্বাস করেন। এই পরমাত্মাই সকল ঠুথ, সত্য, হক, এনাজি, শক্তি ও কুদরতের আধার। ঐ পরমাত্মাই গড, ইলাহি ও ঈশ্বর। সেই পরমাত্মার সন্ধানের সাধনায় যাঁরা সফল হইয়াছেন, তাঁরাই প্রফেট, পয়গাম্বর ও ধর্ম-প্রবর্তক। কাজেই অতি সহজেই বোঝা ও বলা যায় যে, ধর্ম-প্রবর্তকরাই ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি-প্রতীক। কোনও এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সকলের সমবেত আত্মা সেই ধর্মের প্রফেটের ব্যক্তিত্বে বিধৃত ও বিকশিত। তিনিই গোটা ধর্ম-সম্প্রদায়ের কলেক্টিভ আত্মার ইমেজ।

কিন্তু জাতীয় আত্মার বেলা কি? কোনও নেশনের জাতীয় আত্মা কি ব্যক্তি-বিশেষের ইমেজের মধ্যে বিধৃত ও বিকশিত হইতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। তা হইতেই হয়। ব্যক্তি-আত্মা ও ধর্মীয় আত্মার মতই জাতীয় আত্মাকেও ইমেজে মূর্ত হইতেই হইবে। ইন্ড্রিয়ে না হইলেও উপলব্ধিতে হইবেই। এবং জাতি মাত্রেরই আত্মা আছে। র‍্যাশিয়াল জাতিতেও আছে, পলিটিক্যাল নেশনেও আছে। সে আত্মার ব্যক্তি-সিঙ্ঘলও আছে সেই জাতির ইতিহাসেই। তবে ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি-সিঙ্ঘল বা ইমেজ ও জাতীয় আত্মার ব্যক্তি-সিঙ্ঘল বা ইমেজের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমবেত আত্মার ব্যক্তি-প্রতীকের সাথে ধর্মানুসারীদের দৈহিক নৈকট্য থাকার দরকার নাই। কারণ সে সম্পর্কের সবটুকুই স্পিরিচুয়াল, ইন্অর্গানিক ও অশরীরী। ধর্মীয় আত্মা ভৌগোলিক সীমা-সরহদের উর্দে ও বাইরে। কিন্তু জাতীয় আত্মার ব্যক্তি-প্রতীকের সাথে দেশ-বাসীর দৈহিক সান্নিধ্য থাকিতেই হইবে। কারণ জাতীয় আত্মা অর্গানিক। সে আত্মা বাস করে ভৌগোলিক সীমার মধ্যে। সে আত্মার ব্যক্তি-প্রতীককেও, কাজেই, বাস করিতে হয় দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই। দুই-একটা নখির লওয়া স্বাক। বুদ্ধদেব ভারতের লোক হইয়াও চীন-জাপান-বার্মা-ইন্দোচীনের ধর্মীয় আত্মার

ব্যক্তি-প্রতীক। হযরত মুসা মিসরের এবং হযরত ইসা ও হযরত মোহাম্মদ আরবের লোক হইয়াও দুনিয়ার ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসল-মানদের ধর্মীয় আত্মার ব্যক্তি-প্রতীক। কিন্তু তাঁদের কেউই কোনও জাতি-রাষ্ট্রের জাতীয় আত্মার প্রতীক নন। ঐ ঐ ধর্ম-বিশ্বাসী-প্রধান রাষ্ট্রসমূহের জাতীয় আত্মার প্রতীক সন্ধান করিতে হইবে ঐ-সব দেশের অতীত-বর্তমান সন্তানদের মধ্যে হইতেই।

✽ এখন বিচার করা যাক, আমাদের নয়া রাষ্ট্র বাংলাদেশের কোনও জাতীয় আত্মা আছে কি না? থাকিলে সে জাতীয় আত্মার ব্যক্তি-প্রতীকও আছেন কি না? থাকিলে সে ব্যক্তি-প্রতীক কে?

দৃশ্যতঃ এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। একটা কারণ আগেই বলিয়াছি। সে কারণ এই যে, ইতিহাসের বাংলা জাতি দুইভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। ঐ কথাটারই অপর পিঠটা এখন বলিতেছি। সেটা এই যে, বাংলাদেশের মাটিও ভাগ হইয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় যে দেশের মাটি ও মানুষ দুইটাই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, সে দেশের জাতীয় আত্মাই বা থাকে কি করিয়া? আর সে আত্মার তামাশই বা করিব কোথায়? এ-সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাইতে হইলে ব্যাপারটা একটু তলাইয়া বিচার করিতে হইবে।

### বাংলা ভাগ হয় নাই

\* তেমনভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলার মাটি বা মানুষ কোনোটাই ভাগ হয় নাই। কোনও বস্তু দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ হইবার পর বিভক্ত অংশগুলির উভয়ে পূর্ব নাম ও পরিচয় বজায় রাখিলেই বলা যায় বস্তুটি বিভক্ত হইয়াছে। দেশ ভাগ হওয়া সম্বন্ধেও একথা সত্য। এই অর্থে জার্মানি, কোরিয়া ও ভিয়েতনাম ইত্যাদি দেশ ভাগ হইয়াছে বলা যায়। কারণ বিভক্ত অংশ সমূহ তাদের পূর্ব নাম ও পরিচিতি বহন করিতেছে। ঐ-সব দেশের মানুষসম্পর্কেও এই কথা সত্য। তারাও তাদের জাতীয় পূর্ব নাম ও পরিচিতি দাবি করিতেছে।

## বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা

বিশ্ববাসী তা স্বীকারও করিতেছে। কিন্তু বাংলাদেশ সম্পর্কে এ কথা বলা যায় না। ভারতবর্ষ সম্পর্কেও না। ১৯৪৭ সালে ইংরাজ শাসিত ইণ্ডিয়া বাটোয়ারা হইয়া যে দুইটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছিল, তাকে ভারত বা ইণ্ডিয়ার দ্বিধা বিভক্তি বলা যায় না। কারণ সে বাটোয়ারায় জার্মানি কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মত ইণ্ডিয়া বা ভারত নামের দুইটি রাষ্ট্র গঠিত হয় নাই। ইণ্ডিয়া বা ভারত নামের একটি রাষ্ট্রই ছিল আগের মতই। শুধু পূর্বেকার ইণ্ডিয়ার কতকাংশ কাটিয়া পাকিস্তান নামে একটি নয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছিল। ওটাকে ইণ্ডিয়া বা ভারত বিভক্তি বলা চলে না। পূর্বতন ভারতের সীমা পরিবর্তন ও আকার ক্ষুদ্রকরণ বলা যায় মাত্র।

বাংলাদেশের ব্যাপারটাও তাই। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে যা ঘটিয়াছিল, সেটা আজকার আলোচনার জন্য অবাস্তব। দুই কারণে। প্রথম কারণ ঐ সময়ে বাংলাদেশের বরাতে যা ঘটিয়াছিল, তা হইয়াছিল এ দেশের মেজরিটির দাবির লাহোর-প্রস্তাবের খেলাফে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, লাহোর-প্রস্তাবের সে ব্যতিক্রম এখন দূরীভূত হইয়াছে। বাংলাদেশ আজ লাহোর-প্রস্তাবের দাবি মতই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হইয়াছে। কাজেই বাংলাদেশের তথাকথিত বিভক্তির বিচার করিতে হইবে ১৯৪৭ সালে রূপ ও চরিত্র দিয়া নয়। আজিকার রূপ ও চরিত্র দিয়া।

এই দিক হইতে বিচার করিলে ১৯৪৭ সালের ঘটনা বাংলা বিভক্তি নয়। সীমা পরিবর্তন মাত্র। সীমা পরিবর্তনে আকার পরিবর্তনও ঘটিয়াছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাকে বাংলা বিভক্তি বলা যায় না। সমরগাভীত কাল হইতে বাংলার দেহ ও আকারের বহু রূপান্তর ঘটিয়াছে। কখনও বিহার উড়িষ্যা বাংলার সাথে যুক্ত হইয়াছে। কখনো বা রাজমহল, পুনিয়া, সিলেট, গোয়ালপাড়া বাংলাদেশ হইতে কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে। কোনো-কোনোটা আবার ফেরত আসিয়াছে। এর কোনোটাকেই বাংলা বিভাগ বলা হয় নাই। ১৯০৫ সালের পূর্ব-বাংলা ও আসাম প্রদেশ সৃষ্টিকে বাংলা বিভাগ বলা গেলেও ১৯৪৭

## বাংলাদেশের কালচার

সালের ওটাকে বাংলা বিভাগ বলা চলে না। বাংলাদেশের মাইনরিটি হিন্দুদের স্বাধীন ইচ্ছায় তাদের এক অংশ বাংলাদেশের মাটির খানিকটা অংশ লইয়া বৃহত্তর ভূখণ্ড ভারতে এবং অধিকতর মহান ভারতীয় জাতিতে মিশিমা গিন্মাছে।

এই ঘটনায় বাঙ্গালী জাতিত্বের বরাতে যা ঘটিন্মাছে বাংলাদেশের আমিত্ব ও ব্যক্তিত্বের ভাগ্যেও তাই ঘটিন্মাছে। কাজেই ব্যাপারটা বোঝা মত কতিন মনে হয়, আসলে তত কতিন নয়। ১৯৪৭ সালের বাটো-য়ারায় ভারতের 'আমিত্ব' 'ব্যক্তিত্ব' সূতরাং 'জাতিত্ব'ও ভারতেই বিদ্যমান ছিল। তার বিচ্ছিন্ন অংশ 'পাকিস্তান' বা বাংলাদেশে ভারতের সে 'আমিত্ব', 'ব্যক্তিত্ব' বা 'জাতিত্ব'র কোনও অংশই আসে নাই। বাংলাদেশের বেলাও তাই ঘটিন্মাছে। ব্যক্তির 'আমিত্বের' মতই জাতির 'আমিত্ব'ও অবিভাজ্য। মানুষের দেহ খণ্ডিত হইলে যে-কোনও খণ্ডের সাথে 'আমিত্ব' যায় না। 'আমার মাথা' 'আমার হাত' 'আমার পা' ও 'আমার অন্তরে'র মতই দেশের 'আমিত্ব'ও তার দেহ-খণ্ড হইতে স্বতন্ত্র থাকে। ব্যক্তির মতই দেশেরও 'আমিত্বের' সাথে থাকে তার আত্মা। এই কারণেই ১৯৪৭ সালের বাটোয়ারায় বাংলায় 'আমিত্ব' পড়িন্মাছে তৎকালীন পূর্ব-বাংলায়, আজিকার বাংলাদেশে। ঐ সংগে বাংলার জাতীয় আত্মাও আসিন্মাছে এখানেই। আজিকার বাংলাদেশই তাই সমগ্র বাংলা। ইতিহাসের বাংলার অতীতের সকল সীমা পরিবর্তনেও যেমন বাংলার 'আমিত্ব' সূতরাং তার আত্মা, আজিকার বাংলাদেশের ভূখণ্ডেই ছিল, আজও তেমনি তার আত্মা এখানেই বিরাজ করিতেছে।

## পাঠান আমলের বাংলা

ইতিহাসের পাতা উল্টাইলেই দেখা যাইবে, যে-ভূখণ্ড লইয়া আজ বাংলাদেশ গঠিত, মোটামুটি ও মূলতঃ সেই জনপদই ইতিহাসের বংগ। খৃষ্টীয় চার শতকের গোড়া হইতে এগার শতকের শেষ পর্যন্ত পুণ্ড্র, পাল ও সেন রাজাদের আমলেও এই ভূখণ্ডের নাম ছিল বংগ। গংগা

( ভাগিরথী ) নদীর পশ্চিম পারের যে ভূখণ্ডকে আজ পশ্চিম-বংগ বলা হয়, তৎকালে তার নাম ছিল অংগ। ঐ রাজ্য ছিল বরাবর পাটলিপুত্রের এলাকাধীন বর্তমানের উড়িষ্যা সহ ঐ অংশকে তখন উৎকলও বলা হইত। সেই সময় হইতে ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত বৌদ্ধ-হিন্দু-ও মুসলিম-শাসনের মোট দেড় হাজার বছর বাংলার রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও কৃষিক কেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড়, সোমপুর ( পাহাড়পুর ), ময়নামতী, রামপাল, বিক্রমপুর, গৌড়, লাখনৌতী, সোনার গাঁ, মুশিদাবাদ ও ঢাকা। এ সবই ছিল বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশের রাজধানী।

পুরাকালে বাংলাদেশের আকৃতি যাই থাকুক, মুসলিম আমলে ও ইংরাজ আমলে বংগ, কলিঙ্গ, অংগ পুত্র, গৌড়, রাত্ত ও উৎকল মিলিয়া একটা যুক্ত দেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তার মধ্যে মুসলিম-শাসনের ছয় শ' বছরে, বিশেষতঃ মুসলিম আমলের স্বাধীন বাংলাদেশের আড়াই শ বছরে, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধের একটা সম্মিলিত জাতি, বর্তমান অর্থের নেশন, প্রায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্বাধীনতার আমলের তুর্কী আরব ও পার্থান শাসকদের, বিশেষতঃ সুলতান আল্লাউদ্দিন হোসেন শা ও তাঁর উত্তরাধিকারী সুলতানদের, প্রায় এক শ বছরের আমলটা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-সাহিত্যে বাংলাদেশের ছিল একটা স্বর্ণযুগ। এই যুগে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য পূর্বে মালয়, যাবা, সুমাত্রা, শ্যাম ও চীন পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ইস্তাম্বুল, গ্রীস, রোম ও আভিসিনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঐকি তেমনি শিল্প-সাহিত্যেও অভূতপূর্ব উন্নতি হয় এই যুগেই। রামায়ণ, মহা-ভারত ও 'ভাগবত' সংস্কৃত হইতে বাংলায় অনুবাদিত হয় এই সময়ে নবাবদেরই পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ-সাহায্যে। হলধর মিশ্র, কুন্তিবাস, কাশীরাম, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, গুণরাজ খাঁ, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, কবি কংকন প্রভৃতি কবির জন্ম ও মনসা মংগল, অন্নদা মংগল, বিদ্যা সুন্দর ইত্যাদি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ রচিত হয় এই মুহুর্তেই। সবার উপর বড় কথা এই যে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় এই যুগেই। এখানে শুধু হিন্দু কবি ও ধর্ম-পুরুষদের নাম করিলাম। এই যুগে বহু মুসলিম কবিও যে আরবী-

ফারসী বই রচনা করা ছাড়াও বাংলা-ভাষাতেও অনেক কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁদের কথা উল্লেখ করিলাম না। কারণ আমার উদ্দেশ্য ঐ যুগের বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি-প্রগতি দেখান নয়। আমার উদ্দেশ্য, নবাবী আমলে হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার প্রসার-বিস্তার দেখান। শিল্প-সাহিত্যের এই সহযোগিতায় সাম্প্রদায়িক মিলন এমন ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে, একটি মাত্র দৃষ্টান্তে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। সে দৃষ্টান্তটি এই যে, চৈতন্যদেবের যে দুইজন শিষ্য ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া আছেন, সেই জগাই-মাধাই সুলতান হোসেন শাহের উমির ছিলেন, তাঁরা ফারসীতে পণ্ডিত ছিলেন এবং পোশাকে-আশাকে সুলতানের উপযুক্ত দরবারী ছিলেন। এটা শুধু শিল্প-সাহিত্যে ও রাজ-দরবারে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমাজের ও সরকারের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হিন্দু-মুসলিম বীরেরা সমবেতভাবে দিল্লী-আক্রমণের সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। নবাবী স্তরে রাজনীতিতেও যেমন হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা স্থাপিত হইয়াছিল, ধর্মের স্তরে আলেম-পণ্ডিত ও সুফী-সাধুদের মধ্যেও তেমনি আধ্যাত্মিক আদান-প্রদান ঘটিয়াছিল। মুসলমানদের সুফীবাদ যেমন হিন্দুদের যোগসন্যাসের অনেক অনুশীলন গ্রহণ করিয়াছে, হিন্দুদের বৈষ্ণববাদও তেমনি ইসলামের সাম্যবাদ, ভ্রাতৃত্ববাদ ও একেশ্বরবাদ গ্রহণ করিয়াছে। হিন্দুরা যেমন মুসলিম পীর-দরবেশের সম্মান করিত, মুসলমানরাও তেমনি হিন্দু সাধ-সন্যাসীদের সম্মান করিত। হিন্দুদের সত্যনারায়ণ মুসলমানদের সত্যপীর হইয়াছিলেন, না মুসলমানদের সত্যপীর হিন্দুদের সত্যনারায়ণ হইয়াছিলেন, এটা বোঝা কঠিন হইয়াছিল এই উদারতার দরুনই। হিন্দু পণ্ডিতেরা যেমন আরবী-ফারসী ভাষা ও ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন মুসলিম আলেমরাও তেমনি সংস্কৃত ভাষায় ও হিন্দু ধর্ম-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্যুৎপত্তির জোরে সিলেটের গৌরাংগ ষোল শতকে নব-দ্বীপে চৈতন্যদেব রূপে আবির্ভূত হইলেন ইসলাম ধর্মের ভ্রাতৃত্ব ও একেশ্বরবাদ লইয়া। চৈতন্যবাদ হিন্দুদের উপকার করিয়াছিল দুই



দিক হইতে। একদিকে ইসলামের আকর্ষণীয় ও জনপ্রিয় মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্মকে জনপ্রিয় আধুনিক ধর্ম করা হইয়াছিল, অপরদিকে বর্ণাশ্রমের পীড়নমূলক অসাম্যের প্রতিবাদে যে সব হিন্দু ধর্মত্যাগে বাধ্য হইতেছিল, তাদের স্বধর্মে ফিরাইয়া রাখিতে পারিয়াছিল। হিন্দুদের মানসিক সাত্ত্বনার জন্য বৈষ্ণববাদের এই একেশ্বরবাদকে এবং পরবর্তী কালের রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মের একেশ্বরবাদকে বৈদিক একেশ্বরবাদের পুনঃপ্রবর্তন আখ্যা দিয়াছিলেন অনেকই সংগত কারণেই। সত্য কথা যদিও এই যে বেদের একেশ্বরবাদের সাথে বর্ণাশ্রম-ধর্ম ও ছিল, অথচ চৈতন্যবাদেও ব্রহ্মবাদে বর্ণাশ্রম পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি একেশ্বরবাদের প্রচলনে হিন্দু-মুসলিম ধর্মীয় চিন্তার মধ্যে যে নৈকট্য ঘটিয়াছিল, তাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণববাদের 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই মহাবাক্য ইসলামের আশরাফুল মখ্লুকাতিরই প্রতিধ্বনি।

### মোগল আমলের বাংলা

পাঠান আমলের নিমিত্ত এই ভিত্তির উপর মোগল আমলের ধর্মীয় উদারতা ও রাজনৈতিক সেকিউলারিযম বাংলার হিন্দু-মুসলিমকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলে। নবাবদের দরবারে হিন্দু অমাত্য ও হিন্দু রাজা-মহারাজাদের শেরেস্তায় মুসলমান দেওয়ান-আমলা নিয়োগ সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম হইয়া গিয়াছিল। আলাকানের রোসাং রাজ-দরবারের রাজ-কবি আলাউল হিন্দী পদ্মাবতীর বাংলা রূপান্তর করিয়াছিলেন। নিজস্ব বৈষ্ণব কবিতাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন অনেক। রোসাং রাজ-দরবারের বিখ্যাত সৈয়দ শ্রাতুদ্বয় সৈয়দ মোহাম্মদ খাঁ ও সৈয়দ মুসা খাঁ শুধু আলাকানের রাজাদেরই মুসলমানী আচার-অনুষ্ঠানে, পোশাক-আশাক ও আরবী-ফারসী নাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন নাই, নিজেরাও হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাঁরা নিজেরাও 'বসন্ত' ও 'হোলি' উৎসবে যোগ দিতেন। বাংলার নবাব-দরবারেও তাই ঘটিত। নবাব সিরাজুদ্দৌলা ও মীর জাফর আলী খাঁ

নিজেদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব লইয়া হিন্দুদের হোলি উৎসব উপভোগ করিতেন। হিন্দু রাজা ও অমাত্যদের অনেকেই মুসলমানদের মত সবুজ পোশাক পরিয়া মোহাররম উৎসবে যোগ দিতেন।

শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতা বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উন্নত দেশে পরিণত করিয়াছিল। বিশ্ব-বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে-বতুতা, দিল্লী দরবারের রাজ-কবি আমির খসরু, পতু'গীস পরিব্রাজক এডওয়ার্ডো বার্বোসা ও এলডি বার্থেমো, আগ্রার ওলন্দাজ ফ্যাক্টরির চিফ ম্যানেজার ফ্রান্সিস্কো পেলসাবার্ট, ফরাসী চিকিৎসক বানিয়ার ও ব্যবসায়ী ট্যান্ডানিয়ার, ইংরাজ পরিব্রাজক রালফ ফ্রিশ, ফিনিশীয় পরিব্রাজক সিয়ান ফ্রেডরিক প্রভৃতি বহু-সংখ্যক বিদেশী প্রত্যক্ষদর্শী দীর্ঘকাল বাংলায় ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়াছেন। তাঁরা সকলেই বাংলার অতুলনীয় শিল্প-সম্পদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁরা বলিয়াছেন, বাংলার বস্ত্র-শিল্প দুনিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ঢাকার মসলিন বিশ্বের সুস্বতম সূতী বয়ন-শিল্প। বাংলার রেশম-শিল্প সারা বিশ্বে অতুলনীয়। বাংলার জাহাজ নির্মাণ-শিল্প এত উন্নত যে গ্রীস-রোম হইতে জাহাজ নির্মাণের অভাব আসে বাংলাদেশে। এঁরা সকলে প্রায় এক বাক্যে বলিয়াছেন যে সারা দুনিয়ার সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যের প্রস্তুত ও সরবরাহের সর্ববৃহৎ কেন্দ্র এই বাংলাদেশ।

এই ভাবে চৌদ্দ-পনর শতক হইতে আঠার শতক পর্যন্ত পাঁচ শ বছরের মুন্দতে রাজনীতিতে, শিল্প-বাণিজ্যে ও ভাষা-সাহিত্যে যে একটা ক্রমবর্দ্ধমান ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এই অঞ্চলের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানদের মধ্যে, তা শুধু সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। জনগণের স্তরেও প্রসারিত হইয়াছিল। ফলে তাদের মধ্যে একটা একত্ববোধও নিশ্চয় স্ফুরিত হইয়াছিল। তাতে তদানীন্তন বিশ্বের অন্যান্য দেশে যে ধরনের রাষ্ট্রজাতি বিদ্যমান ছিল, বাংলাদেশেও তেমন একটা জাতি গড়িয়া উঠিতে পারিত। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই ততদিনে ভাল-মন্দ দুই কাজেই সহযোগিতা করিতে শিখিয়াছে। দিল্লীর মুসলিম সম্রাট ও মারহাট্টার হিন্দু-বর্গীর বিরুদ্ধে বাংলার হিন্দু-মুসলমান

## বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা

কাঁধে-কাঁধ মিলাইয়া লড়াই করিয়াছে। আবার ক্লাইভের চক্রান্তে হিন্দু-মুসলিম নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবেই সিরাজের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিয়া দেশের স্বাধীনতা হারাইয়াছেন।

### বাংলার বৈশিষ্ট্য

এটাকে বলা যায় বাংলার বৈশিষ্ট্য। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ভারতবর্ষে আট শ বছরের মুসলিম-শাসনে শাসক ও শাসিতের মধ্যে বাংলাদেশে যেমন মিশ্রণ, ঐক্য ও সহযোগিতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, ভারতের আর কোনও সুবা বা প্রদেশে তেমন ঘটে নাই। আরেকটা বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে মুসলিম-শাসনের কেন্দ্র-ভূমি রাজধানী দিল্লী-আগ্রা হইতে বহু-বহু দূরে অবস্থিত হইয়াও বাংলাদেশ একটা মুসলিম-মেজরিটির জনপদ ছিল। মুসলিম শাসকরা রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা অস্ত্রের জোর খাটাইয়া ইসলাম প্রচার করিয়াছেন, অথবা অমুসলমান জনগণ রাষ্ট্রীয় সুখ-সুবিধা ভোগের আশায় পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, এই মত ইদানীং মিথ্যা প্রমাণিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে। এই কারণেই বাংলার শাসক-শাসিতের এই অতুলনীয় মিশ্রণ ও বাংলার এই অভূতপূর্ব মুসলিম মেজরিটি, এই দুইটা ব্যাপারেরই ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হওয়া দরকার। এই সম্পর্কে আমি 'বাংলাদেশের কৃষ্টিতক পটভূমি' শীর্ষক প্রবন্ধে যথাসম্ভব বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি। এই প্রবন্ধে তার পুনরুক্তি করিব না। ঐ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য মাত্র দুইটি তথ্যের দিকে এখানে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এক, ঋতুপূর্ব অন্ততঃ দুই হাজার বছর আগে বাবিলোনীয় সেমিটিক গোষ্ঠীর দ্রাবিড়ী সম্প্রদায় সিঙ্কু-পাজাব হইতে দক্ষিণ ভারত হইয়া বাংলাদেশে আসেন ও বসতি স্থাপন করেন। উত্তর দিক হইতে আগত মংগোলীয়দের সহিত এদের সংমিশ্রণ হয়। এরাই বর্তমান বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমানদের পূর্ব-পুরুষ। দুই, ঋতুপূর্ব দুই শতকে ভারত মহাসাগরে আরব বণিকদের প্রাধান্যের সময় উপকূলীয়

অন্যান্য বন্দরের মধ্যে চাটগাঁ বন্দর আরব বণিকদের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ ছিল। ডাঃ এনামুল হকের মতে এই মুন্দতে চাটগাঁ বন্দর-নগরী উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী বিশাল জনপদ ছিল। সে নগরে একটি পৌরসভাও ছিল। একজন আরব আমির কর্তৃক এই পৌরসভা শাসিত হইত। এই বন্দর হইতে আরব-ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন নদী-পথে উজান দিকে বাংলাদেশ, আরাকান, আসাম ও বিহারের বিভিন্ন নদী-বন্দরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অঞ্চলের বাশেন্দা ও আরব-ব্যবসায়ীরা একই সেমিটিক গোত্রের লোক হওয়ায় তাদের সামাজিক মিলনও সহজ ও স্বরান্নিত হইয়াছিল। এই অবস্থায় আরব ভূমিতে ইসলামের আবির্ভাব হওয়ায় বাংলাদেশ-প্রবাসী আরবরা এবং সেই সংগে স্থানীয় বাশেন্দারাও দলে-দলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। এটা ঘটিয়াছিল পশ্চিম-ভারতের সিন্ধুদেশে মোহাম্মদ-বিন-কাসিমের আগমনের অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর আগে। বাংলায় মুসলিম মেজরিটির প্রধান কারণ এটাই। ইহা ছাড়া আরও একটি কারণ আছে।

মোগলদের হাতে পাঠানদের ক্রমবর্ধমান পরাজয় সুনিশ্চিত হইবার পর হইতেই বাংলার পল্লী ও সমাজ-জীবনে দুইটা বড় রকমের পরিবর্তন ঘটিতে শুরু কর। এক, পরাজিত ও ছত্র-ভংগ পাঠান সৈন্যেরা আত্ম-রক্ষার উদ্দেশ্যে শহরাঞ্চল ছাড়িয়া পল্লী-গ্রামে আশ্রয় লইতে থাকে। দুই, বিশ্ব-ভ্রাস তৈমুর লংগের বংশধর মোগলেরা দিল্লীর সিংহাসন দখল করায় উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু সুফী-দরবেশ, আলেম-ফাযেল ও ফকির-কলন্দর প্রাণ-ভয়ে সুদূর পূর্ব প্রান্তের মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে আশ্রয় লইতেছিলেন। তাঁরাও শহর ছাড়িয়া পাড়া-গাঁয়ে আত্ম-গোপন করিলেন। এই আরব-তুর্কী-পাঠান মুসলমানেরা স্বভাবতঃই জীবিকারূপে কৃষি ও তাঁতের কাজ গ্রহণ করিলেন। এই দুইটা কাজই দুনিয়ার সর্বত্র প্রচলিত বলিয়া দুইটাই তাঁরা জানিতেন। তাই আজও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কৃষক ও তাঁতীর সংখ্যা বেশী। যে সব কাজ তাঁরা জানিতেন না, তা তাঁরা গ্রহণ করেন নাই। এই কারণে মুসলমানদের মধ্যে গোয়ালী, কামার, কুমার হাড়ি-ডোম,

মেথর-মুচি মোটেই নাই। এতে এটাও প্রমাণিত হয়, নিম্ন শ্রেণীর এই সব হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই। এই ভাবে শহরের চেয়ে পল্লী গ্রামেই মুসলমান সংখ্যা বাড়িয়া যায়। ঐ সময়ে বাংলা-দেশের বিশাল এলাকা বনে-জংগলে পূর্ণ ছিল। দুঃসাহসী শেখ-পাঠানরা এই সব জংলা জমি আবাদ করিয়াছিল। বাংলার মুসলমানরা জংগল কাটিয়া কেমন উর্বরা জমি বাহির করিতে পারে, পরবর্তী কালে আসামে তার প্রমাণ দিয়াছিল। এই কারণে পল্লী-বাংলার মুসলমানদের মধ্যে 'শেখ' ও 'খাঁ' পদবী ও তাদের ভাষায় আরবী ফারসী-তুর্কী শব্দ এত বেশী।

### বৈশিষ্ট্যের কারণ

বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম জনসাধারণের পূর্ব-পুরুষ মূলতঃ দ্রাবিড় হওয়ার কথাটা ইংরাজ আমলের প্রথম হইতেই তলাইয়া যায়। এই সময়ে বাংলার হিন্দু পণ্ডিতদের অনেকে নিজেদেরে আর্য্য বলিয়া চলাইবার চেষ্টা শুরু করেন। এ সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করিতেছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বাংলা-দেশের কিছু-সংখ্যক ঐতিহাসিক ও সমাজ-বিজ্ঞানী আজ স্বীকার করিতেছেন, বাংলার বাইরের হিন্দুদের সাথে বাঙ্গালী হিন্দুদের মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। ধর্ম-বিশ্বাস, দেবতার নাম, উপাসনা-প্রণালী আচার-অনুষ্ঠান, ওয়ারিসী আইন, খোরাক-পোশাক এবং মেযাজ-মর্ষিতেও বাংলার হিন্দু ও আর্য্য ভারতের হিন্দুদের মধ্যে কোনও মিল নাই। ঐতিহাসিক রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে শুরু করিয়া সার যদুনাথ সরকার, ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত সকলেই এটা স্বীকার করিয়া-ছেন। ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর 'হিস্ট্রি-অব-এনশিমান্ট বেংগল' নামক সর্বাধুনিক গ্রন্থের 'অরিজিন-অব-বেংগলিয' শীর্ষক অধ্যায়ে বাঙ্গালী জাতির আদি কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্পর্কে তিনি সার রবার্ট রিফ্লী, রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিস ও ডাঃ বি. এস. গুহ প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস-বিজ্ঞানী-

দের পরম্পর-বিরোধী অভিমতের দক্ষ পর্যালোচনা করিয়াছেন। সার রবার্ট রিশ্লীর অভিমত এই যে সকল ধর্ম-বর্ণের বাঙালীদের আদি পুরুষ দ্রাবিড় ও মংগোলীয়দের মিশ্রণ-জাত মানব-গোষ্ঠী, যাদের সাথে আর্যদের কোনও সংশ্রব নাই। এই মতের প্রতিবাদে রান্নাবাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, বাংলার বর্ণা-হিন্দুরা বৈদিক আর্যদের বংশধর নহ্ন বটে তবে তারা পামির মাল-ভূমির অধিবাসী হোমো-আলপিনাস নামে আর্যদের এক শাখারই বংশ। নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ বি, এস, গুহ রমাপ্রসাদ বাবুর মতের প্রতিবাদে বলিয়াছেন, মহোজাদারো ও হারাপ্পান্ন যে ওমানী-আর্মেনিয়ানরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, বাঙালীরা তাদেরই বংশোদ্ভূত। অধ্যাপক মহলানবিসের গবেষণার ফল এই যে, নৃতত্ত্বের দিক হইতে বাংলার বাহিরের ব্রাহ্মণদের চেয়ে বাংলার অন্যান্য বর্ণের লোকের সাথেই বাংলার ব্রাহ্মণদের মিল বেশি। তবে বাংলার ব্রাহ্মণদের এক শ্রেণীর সাথে পাজাবী ও অন্যান্য প্রদেশের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের কিছু-কিছু মিল রহিয়াছে।

ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার এই সব মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বাংলার বর্ণহিন্দুরা আর্যদের বংশধর নহেন। তিনি বলিয়াছেন : ‘আমরা বহুদিন ধরিয়া বিনাতর্কে এই আশ্ব-প্রসাদী বিশ্বাস পোষিয়া আসিতেছিলাম যে আর্যরা বাংলা জয় করিয়া এদেশের অসভ্য অধিবাসীদের সভ্যতা ও রাষ্ট্রনীতি শিখাইয়াছিল এবং আমরা ব্রাহ্মণরা ও অপরপর বর্ণহিন্দুরা সেই আর্যদেরই বংশধর। কিন্তু আজ এই বিশ্বাসের ভিত্তিহীনতা আমাদের সে আশ্ব-প্রসাদে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়াছে।’ ডাঃ নীহার রঞ্জন রায় ‘বাংলায় ইতিহাস’ নামে যে বিশালাকারের গবেষণা-ভিত্তিক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাতে তিনি তথ্য-প্রমাণাদি দিয়া এই পার্থক্যের উপর খুবই জোর দিয়াছেন। †

পাঠান আমলে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী সর্বপ্রথম ওলামা-প্রভাব-মুক্ত রাষ্ট্র পরিচালন শুরু করিয়া যে সেকিউলার রাজনীতির প্রবর্তন করিয়াছিলেন, মোগল আমলে সম্রাট আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলে যা

## বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা

সজীবতায় দানা বাধিয়াছিল, পশ্চিম ও উত্তর ভারতের কোথাও তা জনগণের স্তরে সফল না হইলেও বাংলায় তা সফল হইয়াছিল ঐ কারণেই।

### ইংরাজ আমলের বাংলা

এই প্রসঙ্গে বাধা ও ভাংগন আসে ইংরাজ আমলের শুরু হইতেই। নয়া শাসকরা খুব স্বাভাবিক কারণেই মুসলমানদের দাবাইয়া হিন্দুদেরে টানিয়া তুলিবার সকল প্রকার ব্যবস্থা করেন। তাঁরা চাকরি-বাকরিতে, সহায়-সম্পত্তিতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মুসলমানদেরে তাড়াইয়া হিন্দুদেরে বসাইবেন, এটাও ছিল স্বাভাবিক ও সংগত। কিন্তু এই সংগে তাঁরা ঘোরতর অন্যায় অসংগত একটা পন্থা গ্রহণ করিলেন। সেটা ইতিহাসকে বিকৃত করা। সে বিকৃতি ঘটান হইল মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের মন বিষাইয়া তোলায় উদ্দেশ্যে। ছয় শ বছরের মুসলিম শাসনের ভাল দিকের সাথে কিছু-কিছু খারাপ দিকও ছিল নিশ্চয়ই। ইংরাজরা বাহিয়া-বাহিয়া ঐ সব খারাপ দিকে রং চড়াইয়া ও কল্পনার আশ্রয় লইয়া এমন সব ইতিহাস লিখিলেন যাতে প্রমাণ করার চেষ্টা হইল যে মুসলমানরা হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দু নারীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। হিন্দুদের ভাষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ চুকাইয়া তারা ভাষার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে। খৃষ্টান পাদ্রীরা বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ দেখাইবার জন্য ইংরাজীতে বাংলা ভাষার অভিধান রচনা করিলেন। বিপুল বাংলায়, মানে সংস্কৃত-বহুল ভাষায়, তাঁরা নিজেরাই সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র বাহির করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকারকে দিয়া 'বিপুল বাংলা' প্রচলন করিলেন। মোট কথা, হিন্দু-মুসলিম বিরোধ ঘটানোকে ইংরাজরা প্রকাশ্যভাবে সরকারী নীতি হিসাবেই গ্রহণ করিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড এলেনবরো ব্রিটিশ সরকারের নীতি হিসাবে ঘোষণা করিলেন : 'মুসলিম রেস্ মূলতঃ আমাদের শত্রু। এ অবস্থায় হিন্দুদেরে সম্ভ্রুত করাই হইবে আমাদের

নীতি।' কাজে-কর্মে এই সরকারী নীতির প্রমাণ পাইয়া ১৮৮২ সালে গোপাল চন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর বিখ্যাত 'হিন্দু আইন' নামক পুস্তকের ভূমিকায় লেখেন : 'মহারাজা ডিক্টোরিয়া ডিফেন্ডার অব হিন্দু ফেইথ। হিন্দু-ধর্ম বৈরাগ্যের ধর্ম। এই ধর্মের উন্নয়নে ইংরাজদের কোন রাজনৈতিক বিপদের কারণ নাই।' প্রসেসটা শুরু হইয়াছিল অনেক আগেই। ১৮১৭ সালে রাজা রাম মোহন রায় ও ডেভিড হেন্সলের সশ্ৰীকৃত চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম যে কলেজটি স্থাপিত হইয়াছিল, তার নাম রাখা হইয়াছিল 'হিন্দু কলেজ'। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনী লইয়া বংকিম চন্দ্র ও রমেশ দত্ত 'ঐতিহাসিক' উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। তাতে তাঁরা হিন্দুদের বীর পুরুষ ও মুসলমানদেরে অত্যাচারী কাপুরুষরূপে অঙ্কিত করিলেন। মুসলমানদেরে 'নেড়ে' 'যবন' বলিয়া গাল দিয়া চলিলেন। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত কবিতা রচনা করিয়া এই কাজটিই জনপ্রিয় করিতে লাগিলেন। এটা ত গেল ভাষা-সাহিত্যের কথা। রাজনীতিতেও তাই শুরু হইল। হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে নব গোপাল মিত্র মহাশয় 'বাংগালী জাতীয়তাবাদের পিতা' বলিয়া আখ্যাত, তিনি তাঁর রাজনৈতিক সশ্ৰীকৃত-নীর নাম রাখিলেন 'হিন্দু মেলা'। বেংগল ল্যাণ্ড-হোলডাস' এসোসিয়েশনের মত নিতান্ত সেকিউলার শ্রেণী-প্রতিষ্ঠানের ইংরাজি মুখপত্রের নাম রাখা হইল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। বাংগালী জাতীয়তাবাদের ঠাকুরদাদা (গ্র্যাণ্ডফাদার) বলিয়া পরিচিত রাজনারায়ণ বসু ১৮৭০ সালে 'বেংগল ন্যাশনাল সোসাইটি' নামে যে সমিতি স্থাপন করেন, তার মুদ্রিত 'আদর্শ-উদ্দেশ্যে' লেখা হইল : 'বাংলার হিন্দুদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিই এই সমিতির উদ্দেশ্য।' জনৈক পত্রলেখক সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে এই অসংগতির সমালোচনা করায় 'হিন্দু-প্যাট্রিয়টের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ পত্র-লেখকের জবাব দেওয়া হইয়াছিল। সে সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছিল : 'বাংলার হিন্দুরা নিজেরাই একটি নেশন। সুতরাং সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে কোনও অসংগতি নাই।' এই মনোভাব মাত্র কয়েক বছরে হিন্দু জনগণের স্তরে এমন



প্রসার লাভ করিয়াছিল যে 'বাংগালী' ও 'ভদ্রলোক' শব্দ দুইটা একান্ত-ভাবে হিন্দু অর্থেই ব্যবহৃত হইতে থাকে। বহু হিন্দু লেখক ও শিক্ষাবিদ নিতান্ত সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই বজ্রতাল বলিতেন ও প্রবন্ধে লিখিতেন : 'আজকাল ভদ্রলোকদের দেখাদেখি মুসলমানদের মধ্যেও শিক্ষা প্রসার লাভ করিতেছে, এটা বড়ই আনন্দের কথা।' পশ্চিম-বাংলায় 'বাংগালীপাড়া' ও 'মুসলমানপাড়া' বহুল-প্রচলিত শব্দ।

### হিন্দু-চিন্তায় নতুন দিগন্ত

এটা ঘটিবার সংপত্ত কারণও ছিল। সে কারণটাও ছিল দুধারী। এক, বাঙ্গালী হিন্দুর মনে সাবিক রেনেসাঁ-রিভাইভেলের তীর বাসনা। দুই, মুসলিম শাসনকে বিদেশী শাসন মনে করায় তার বিরুদ্ধে বহুদিনের চাপা রোষ-ক্রোধের বিস্ফোরণ। প্রথমটা ছিল স্বাভাবিক উচ্চাকাঙ্খা। দ্বিতীয়টায় সাহায্য করিয়াছিল মুসলমানরা নিজেদের আচরণের দ্বারা। প্রথমটার ব্যাপারে বংকিম চন্দ্র সহ শক্তিশালী হিন্দু লেখকরা একটা আধ্যাত্মিক-মানসিক আর্ষ্য বুনিয়ে দরচনা করিয়া ছিলেন। পরিণামে হিন্দু রাজত্বের পুনঃ-প্রতিষ্ঠাই 'আনন্দমঠ' রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া স্বয়ং রমেশ চন্দ্র দত্ত 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'তে লিখিয়াছেন।

পঞ্চাশতের মুসলিম সমাজের উপরের তলার কতিপয় নাইট-নবাব-খান বাহাদুর 'বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা নয়, উর্দু, এই শ্লোগান তুলিয়া হিন্দুদের ঐ কাজে সহযোগিতা করিয়াছেন।

এর ফল হইল এই যে আঠার-উনিশ শতকের দেড় শ বছরে ও বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে বাংলাদেশের রাষ্ট্র-সমাজে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কৃষ্টি-সাহিত্যে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হইল, তার সব-টুকুই ছিল হিন্দুর, মুসলমানের তাতে কোনও শরিকি ছিল না। কাজেই বাংলার হিন্দু ও বাংলার মুসলমান সত্য-সত্যই দুইটি 'জাতিতে' পরিণত হইল। দেশ ও জাতির জন্য যে এটা ঋতিকর, হিন্দুদের কেউই যে তা বুঝেন নাই, এবং হিন্দুদের এই মনোভাবের প্রতিবাদ করেন নাই, তা সত্য নয়। নাট্যকার গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার

মৈত্রেয়, রাজনীতিক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজ্ঞানী আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ঝাঁর-ভাঁর সময়ে ও এলাকায় এই ব্রাহ্ম নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বড় বেশী বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। ততদিনে বাংলার ব্যক্তিত্ব, তার স্বকীয়তা ও তার আত্মা হিন্দু হইয়া গিয়াছিল। তবু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র আশা ছাড়েন নাই। তাঁদের প্রতিবাদ তখনও বাংলার আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হইতেছিল।

### ফয়লুল হকের আবির্ভাব

এই সময় বাংলার আসল জনতা মুসলমানদের মুখ খুলে। তাদের তরফে মাঠে নামেন ফয়লুল হক। দেশবন্ধু ও আচার্য্য রায়ের গলার সুরে সুর মিলাইয়া ফয়লুল হক গোটা দেশবাসী জনতার পক্ষ হইতে, বাংলা জাতির তরফে, কথা বলেন। ১৯১২ সালে সরকারী চাকুরি ছাড়িয়া রাজনীতিতে প্রবেশ করিয়াই তিনি যেন একরূপ উৎপ্রেৰণা বশেই বৃষ্টিতে পারেন যে বাংলার জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইবে প্রজা-সমিতি। বাংলার জনগণ মানেই প্রজা। বাংলায় একটা গণভিত্তিক সংস্থায় সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালেই তিনি প্রজা-সমিতি স্থাপন করেন। আগের বছর ১৯১৩ সালে তিনি মওলানা মোহাম্মদ আলীর অনুপ্রেরণায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে যোগ দেন। দুইটাই ছিল নিখিল-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। তিনি যেন সহজাত বুদ্ধিতেই বৃষ্টিতে পারেন, বাংলার স্বকীয়তা রক্ষা করিতে হইলে বাংলা-কেন্দ্রিক একটা অসাম্প্র-দায়িক প্রতিষ্ঠান অবশ্যই গড়িতে হইবে। তাই পর বৎসরই তিনি প্রজা-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাংলার স্বকীয়তা রক্ষার এই প্রয়াসে তিনি চিত্তরঞ্জনের সহযোগিতা পাইলেন।

১৯১৭ সালে বংগীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে চিত্তরঞ্জন দুইটি মূল কথা বলেন : ‘এক, বাংগালীরা সত্যিকার অর্থেই একটি নেশন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ইউরোপ হইতে ধার-করা একটা অভিনব মতবাদ। দুই, বাংগালী নেশনের অবস্থান শহরে নয়, পল্লীতে। গুটিকতক শিক্ষিত লোক নয়, কৃষকরাই আসল বাংগালী জাতি।’

এটা ছিল ফয়সল হকেরও মত। কাজেই উভয়ে মিলিয়া নিখিল-ভারত কংগ্রেসের ঐ সালের কলিকাতা অধিবেশনেই বাংলার জন্য স্বায়ত্ত-শাসন দাবি করিলেন। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ভারতীয়-অখণ্ডতার বিরোধী, এই যুক্তিতে বালগংগাধর তিলক সে প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। কংগ্রেস-সভানেত্রী মিসেস এ্যানি বেসান্ত তিলকের যুক্তি মানিয়া লইয়া স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাবটা বাতিল করিয়া দিলেন। ফয়সল হক ও চিত্তরঞ্জন এর পরের চার বছরও মুক্তভাবে কংগ্রেসের প্রত্যেক অধিবেশনে এই দাবি উত্থাপন করিতে থাকেন। ১৯২১ সালে ফয়সল হক কংগ্রেস ত্যাগ করার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একাই এই দাবি করিয়া চলেন। ১৯২৩ সালে 'বেংগল প্যাক্ট' করিয়া তিনি বাংগালী জাতির ঐক্য রক্ষার সক্রিয় চেষ্টা করেন। নিখিল-ভারত কংগ্রেসকে দিয়া এই প্যাক্ট অনুমোদন করাইবার জন্য পর-পর দুই বছর চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হওয়ায় ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু মনমুগ্ধ ও ভগ্ন-হৃদয় হইয়া পরলোক গমন করেন।

দেশবন্ধুর মনমুগ্ধ হইবার কারণ ছিল। বাংলার হিন্দু-নেতৃত্বে তখন তিনি ছাড়া বাংলার স্বকীয়তায়, স্বাতন্ত্র্যে ও বাংগালী জাতীয়তায় বিশ্বাসী আর কেউ ছিলেন না। এটা ছিল সত্যই বিস্ময়কর। যে হিন্দু-বাংলার সার্বিক নেতৃত্ব বিগত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া বাংলার স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য ও বাংগালী জাতীয়তার কথা তারস্বরে বলিয়া এবং জোরালো ভাষায় লিখিয়া আসিতেছিলেন, ১৯২৫ সালের দিকে তাঁরাই হঠাৎ সে স্বাতন্ত্র্য ও জাতীয়তার কথা ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া ?

কারণটা অসংগত না

উত্তর অতি সোজা। একদিকে স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের, মানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, সম্ভাবনা যতই বাস্তবরূপ ধারণ করিতে লাগিল, হিন্দু-শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে এটা ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল যে বাংলাদেশে স্বরাজ-স্বায়ত্ত-শাসন মানেই মুসলিম-প্রাধান্য। অপর দিকে প্রজা আন্দোলন যতই জোরদার হইতে লাগিল, বাংলার সামন্ততন্ত্র ও তার পোষ্যদের কাছে এটা ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে জমিদারি উচ্ছেদে বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক

ব্যবস্থায় হিন্দু-প্রাধান্যের অবসান ঘটিবে। পৌনে দুই শ বছরের ইংরাজ শাসনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিল্প-সাহিত্যিক ক্ষেত্রে বাংলা যে রূপ ধারণ করিয়াছে, গণতন্ত্রের প্রবর্তনে তা আর থাকিবে না। হিন্দু মধ্যবিত্তের বিচারে এটা হইবে কৃষ্টি-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলার অপমৃত্যু। নব গোপাল মিত্র ও রাজ নারায়ণ বসু-পরিকল্পিত ও বংকিম চন্দ্র-রূপায়িত বাংলার জাতীয়তার চেহারা নিশ্চয়ই এটা ছিল না।

এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার একমাত্র শোভন উপায় ছিল একটা রুহত্তর জাতীয়তায় মিশিয়া যাওয়া। এই রুহত্তর জাতীয়তাই ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদে হিন্দু-প্রাধান্য সুনিশ্চিত থাকায় বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতিও ছিল সেখানে নিরাপদ। ক্ষুদ্রতর 'জাতি' হইতে রুহত্তর 'জাতিতে' মার্জ করা নিজেই একটা উন্নতি ও প্রগতি। সুতরাং 'বাংগালী জাতীয়তাবাদ' ছাড়িয়া 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদ' ধরায় বাংলার হিন্দুদের মনের দিক হইতেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর বাংগালী হিন্দুর এই জাতীয় স্বকীয়তা বোধের পরিবর্তন রোধ করিবার মত ব্যক্তিত্ব রাজনীতিকদের মধ্যে আর কেউ ছিলেন না। রাজনীতিতে মধ্যপন্থী হইয়াও যে আন্তোষ মুখার্জী হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করিতে পারিতেন, তিনিও ঐ সময়ে পরলোক গমন করেন। রাজনীতিকদের বাইরে ও উর্ধ্বে সে দুইটি ব্যক্তিত্ব বাংগালীর চিন্তা প্রভাবিত করিতেন, তার একজন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, অপর জন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র। একজন কবি, অপরজন বিজ্ঞানী। স্বভাবতঃই জনপ্রিয়তা ও প্রভাবের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রফুল্ল-চন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। এমন রবীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক, সেখানে প্রফুল্লচন্দ্রের বাংগালী জাতীয়তাবাদ টিকিতে পারে না। পারে নাই। তবু বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান করিতে গেলে এই দুই মনীষীর চিন্তার সংগে সম্যক পরিচয় থাকা দরকার।

### রবীন্দ্র-চিন্তায় বিশালতা

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একাধারে কবি, গান্ধিক, ঔপন্যাসিক, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। স্থাপনিক কবি হিসাবে তিনি রাজনীতিক ব্যাপারেও ক্ষুদ্র-

তার চেয়ে বিশালতা, সংকীর্ণতার চেয়ে প্রসারভার পক্ষপাতী ছিলেন। 'সোনার বাংলা'কে তিনি ভালবাসিতেন জন্মস্থান কুটির হিগাবে। তাই বলিষ্ঠা তাঁর উচ্চমন ও উদার দৃষ্টি সে কুটিরের বন্দী থাকিতে রাখী ছিল না। স্নেহময়ী মায়ের কোল ছাড়িয়া রহতর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িবার বৃত্তি এটা। তাই তিনি বাংগালী জাতীয়তাবাদকে কুপমণ্ডুকতা বলিতেন। 'বাংগালী' থাকাটা তিনি 'মানুষ হওয়া'র পরিপন্থী মনে করিতেন। এই স্নেহের মোহের জন্য বংগ-জননীকে তিনি অভিশুক্ত করিয়াছিলেন। যে বাংলা ভাষাকে তিনি বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে উন্নীত করিয়াছেন, তাকেই তিনি আঞ্চলিক ভাষা আখ্যা দিয়া হিন্দীকেই মহাভারতের রাষ্ট্র-ভাষারূপে সুপারিশ করিয়াছেন। উদার ও নিরপেক্ষ কবি-মনের যোগ্য কথা। নিজের মাকে যতই ভালবাসি, যতই প্রহ্লা কবি, যতই বড় মনে করি, তাঁকে ত আর রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিষ্টার করার দাবি করিতে পারি না। রাষ্ট্রীয় দেশ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের, বিশ্ব-সত্যতা হিসাবে তিনি আর্ষ্য সভ্যতার এবং জীবন-দর্শন হিসাবে তিনি বেদান্ত দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন। দার্শনিকের মতই তিনি লিখিয়াছেন : 'আমরা স্বাধীনতা চাই না, আমরা চাই মুক্তি।' ১৯১৭ সালে আমেরিকা ভ্রমণ কালে তিনি র্যাশিয়াল ও লিংগুয়িস্টিক ন্যাশনালিযমের কঠোর নিন্দা করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। সেজন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঐ বছর প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথের ঐ উক্তি তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাতে রবীন্দ্রনাথের মত পরিবর্তন হয় নাই। স্বাঙ্গিক কবি-দার্শনিক হওয়ার দরুন তাঁর কল্পনার ভারত রাষ্ট্রীয় ভারতের চেয়েও বড় ছিল। সেটা ছিল রহতর ভারত। বিশ্ব-ভারতীই ছিল তাঁর আদর্শ। এই কারণে তাঁর লেখার মহাসাগরে বাংগালী জাতীয়তা কিম্বা তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বে বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান করা পণ্ড্রম মাত্র। বরঞ্চ উদার সত্য-প্রস্তার মতই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন : 'বাংলা একটা নম্র, দুইটা'। জীবন-সায়্নাহে, মৃত্যুর মাত্র দুই বছর আগে, ১৯৩৯ সালে লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস।

পূর্ব-বংগ ও পশ্চিম-বংগ, রাড়-বারেন্ডের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয় অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নাই। এককাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।' উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে হক মন্ত্রি-সভার কৃষি-খাতক আইন, মহা-জনি আইন এবং প্রাইমারি-সেকেণ্ডারি শিক্ষা আইনের বিরুদ্ধে গোটা বর্ণহিন্দু-বাংলা আন্দোলন করিতেছিল। অথচ এই প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ জাতিক সভার উপর খুব জোর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন : 'সেই জন্যে মানুষের সব চেয়ে বড়ো আত্ম-রক্ষা এই জাতিক সভাকে রক্ষা করা।' জাতিক সভা কথাটার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ জাতীয় স্বকীয়তা বা জাতীয় বাজিত্বের চেয়ে 'জাতীয় আত্মাই' বুঝাইয়াছেন। কারণ তিনি পরে-পরেই লিখিয়াছেন : 'এটা তার বৃহৎ আত্মা। এই আত্মিক ঐক্যবোধ যাদের দুর্বল, সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠবার শক্তি তাদের ক্ষীণ।' কবির কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু তাঁর কল্পিত জাতিক সভার অবস্থান ছিল ভারত-তীর্থে। সে কথা তিনি বহু আগেই 'ভারত-বর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে সুস্পষ্টে বলিয়া দিয়াছিলেন। তাতে তিনি বলিয়াছেন : 'পাঠান-মোগলের শাসন ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, নিশীথ রাতের দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। মাহমুদের আক্রমণ হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য গর্বোদগার পর্যন্ত ইতি কথাটা ভারতবর্ষের বিচিত্র কুহেলিকা।' পাঠান-মোগলদের আগমনকে তিনি বিদেশী আক্রমণ বলিলেও আর্ষ্য আগমনকে তা বলেন নাই। রবীন্দ্রনাথের ভারত-তীর্থ ঐখানে।

### বিজ্ঞানার্চার্যের হুশিয়ারি

কিন্তু আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মতই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রমিত বাংলা জাতীয়তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বাংলা আইন পরিষদে হক-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে এক আসন্ন আনাস্থা-প্রস্তাব লইয়া দেশময় হৈছে পড়িয়া গিয়াছিল। এমনি এক দিনে আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র সায়েন্স কলেজস্থ নিজের রুমে সমবেত ভক্ত-বৃন্দকে ঐ আনাস্থা-প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাহারের চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি ভক্তদেরে বলিয়াছিলেন : 'এটা সাধারণ রাজনৈতিক পালোমণ্টারি

প্রশ্ন নয়, এটা বাঙালী জাতির ভবিষ্যতের প্রশ্ন। ফয়লুল হক বাংলার হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতীক। আমি কংগ্রেসের ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিসম বুদ্ধি না। আমি বুদ্ধি, বাঙালীরা নিজেরাই একটা নেশন। ফয়লুল হকই এই ভবিষ্যৎ বাঙালী জাতীয়তার প্রতীক। ফয়লুল হক কেন বাঙালী জাতীয়তার প্রতীক, সে কথা বুঝাইতে গিয়া আচার্যদেব বলিয়াছিলেন : 'ফয়লুল হক মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালী। আর সেই সংগে ফয়লুল হক মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান। খাঁটি বাঙালীত্ব ও খাঁটি মুসলমানত্বের এমন অপূর্ব সমন্বয়ই ভবিষ্যৎ বাঙালী জাতীয়তার প্রতীক। একমাত্র ফয়লুল হকের মধ্যেই আমি তা দেখিতেছি। ফয়লুল হক আমার ছাত্র বলিয়াই আমি এ কথা বলিতেছি না। সত্য কথাই বলিতেছি।' এই প্রতীকের মর্যাদার গুরুত্ব বর্ণনায় তিনি বাঙালীকে হসিয়ান করিয়া বলিয়াছিলেন : একটা মন্ত্রী 'সভার প্রতি আস্থা-অনাস্থার মত রাজ-নৈতিক মতভেদের জন্য তোমরা এই প্রতীক ভাংগিও না। যদি বাঙালী তেমন ভুল করে, তবে তাদের বরাতে দুঃখ আছে।'

আচার্যদেবের এই হসিয়ানিতে কর্ণপাত করা হয় নাই। পরিণাম সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যাসত্য বিচারের সময় হয় ত আজো আসে নাই। কিন্তু বাঙালী জাতীয়তার প্রতীক বলিয়াই তিনি ফয়লুল হক সম্পর্কে যে উক্তি করিয়াছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল আচার্যদেবের ভবিষ্যৎবাণীর দুই বছরের মধ্যেই। ১৯৪০ সালে ফয়লুল হক মুসলিম লীগ লাহোর-প্রস্তাব পাশ করাইয়াছিলেন। লাহোর-প্রস্তাব যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্কিম ছিল, অঞ্চল ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী মহাপরিকল্পনার খাবা হইতে বাঙালী জাতিকে রক্ষা করার যে উহাই একমাত্র পথ ছিল, ফয়লুল হক জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে দাবী করিয়া গিয়াছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর শরৎচন্দ্র সহ বেশ কয়েকজন বাঙালী হিন্দু কংগ্রেস-নেতা তা স্বীকার করিয়াছেন। ফয়লুল হকের স্কিম বাস্তবায়িত করার চেষ্টাও তাঁরা করিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতের মহা-জাতীয়তার উন্মাদনার উত্তাল তরঙ্গে তাঁদের কণ্ঠস্বর তলাইয়া গেল।

ভারত-তীর্থের সাগর-তীরে বাংলার নৌকাডুবি হইল। গোটা ভারতের চিন্তানায়ক উনিশ-বিশ-শতকের বাংগালী মনীষার প্রতীক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত রায়ে কলিকাতা-কেন্দ্রিক পশ্চিম-বংগ বংগ-জননীর সন্তানত্ব বর্জন করিয়া ভারত-মাতার সন্তান হইল। 'মুগ্ধ বংগ-জননীর' যে সব 'সন্তান' অর্থাৎ 'বাংগালী' স্বাক্ষিতে চাহিলেন না, তাঁরা 'মানুষ' হইয়া গেলেন।

এই ভাবে সুরেন্দ্র নাথ, বিপিন পাল, আশুতোষ, চিত্ত রঞ্জন, শরৎ-চন্দ্র, সুভাষচন্দ্র ও বিশেষ করিয়া প্রফুল্ল চন্দ্রের-দেখা বাংলার 'জাতিত্ব', 'ব্যক্তিত্ব', 'আমিত্ব', 'স্বকীয়তা', 'মন ও 'আত্মার' যে জীবন্ত প্রতীক মহাভারতীয় 'জাতিত্ব', 'ব্যক্তিত্ব' ও 'আত্মার' নিঃসীম দিগন্তে হারাইয়া গিয়াছিল, একমাত্র ফয়লুল হকের বেলা তা ঘটে নাই। তাঁর বেলা আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ভবিষ্যদ্বাণী অন্ততঃ অংশতঃ সত্য হইয়াছে। ইংরাজ-নির্মিত কলিকাতা-কেন্দ্রিক শত বর্ষের বেংগলে বাংলার জাতীয় আত্মার সন্ধান না পাইয়া ফয়লুল হক যে জীবন সাম্রাজ্যে হাজার বছরের বাংলায় সে জাতীয় আত্মার সন্ধান চাকায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এটা ঘটিয়াছিল স্বাভাবিক কারণেই। ফয়লুল হকের রিডিস্ কন্ডার-করা এই বাংলাই ইতিহাসের আসল বাংলা। এটাই আদি বাংলা। বৌদ্ধ আমলের বাংলা। হিন্দু আমলের বাংলা। পার্থান-মোগল আমলের বাংলা। তারও আগের দুই হাজার বছরের ছািবিড় বাংলা। এটা রাজ্য-বাদশার বাংলা নয়, জনতার বাংলা। এটা দুর্গ-কেন্দ্রার বাংলা নয়, মাটির বাংলা। এটা জমিদারের বাংলা নয়, কৃষক-প্রজার বাংলা। এটা মদ-মাৎসর্ষের বাংলা নয়, ডাল-ভাতের বাংলা। ফয়লুল হক দেহে-মনে এই বাংলার প্রাকৃতিক, দৈহিক ও মানসিক চরিত্রের পরিপূর্ণ প্রতীক। বাংলার মেঘনা-পদ্মা-স্বমূনার অবিরাম ভাংগা-গড়া, উত্তাল প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা ও বাংলার পলি-মাটির নমনীয়তা সাবিক ও সামগ্রিক রূপে ফয়লুল হকের ব্যক্তিত্বে রূপায়িত। তাই ফয়লুল হকই বাংলার জাতীয় আত্মার প্রতীক।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৭৩।

শেষ









